আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

ক্লিনটন রসিটার

অনুবাদক—ডঃ জ্যোতিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সূচী

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা

কথনো-কথনো বিদেশীদের চোখে আমেরিকার সভ্যতার ছবি (আমরা যারা এর মধ্যে আমাদের জীবন কাটিয়ে দিলুম তাদের চেয়ে) স্পষ্টতররূপে প্রতিভাত হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধবিধ্বস্ত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোত্তম সুহৃদ্ জন ব্রাইট ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতিপদের প্রতি এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন :

"আমার মনে হয় সারা বিশ্বে এর চেয়ে সুন্দর কোন প্রতিচ্ছবি নেই, বিশ্ব এর চেয়ে বড় সম্মান কাউকে দিতেও পারে না এবং রাজনীতিক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় কোন উচ্চাভিলাষ মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সেখানে একই পরিবার থেকে বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারীরা সিংহাসন পান অথবা সেখানে প্রত্যাদেশে বা যুদ্ধজয়ের ফলে *রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, যে রাজশক্তি দুর্ধর্ষ সৈন্যদল ও পর্যুদস্ত রাজ্যের* উপর স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম, তার গরিমার কাহিনী বলে আপনি আনন্দ পেতে পারেন—কিন্তু আমার কাছে একটা মহৎ ও স্বাধীন জাতির স্বনির্বাচিত শাসকের রাষ্ট্রক্ষমতার চেয়ে বড় কোন শ্রদ্ধার, আনুগত্যের ও মহিমার বিষয় নেই এবং মর্তভূমিতে মরজীবের উপর শাসন করবার যদি কোন ঐশ্বরিক অধিকার কারো থেকে থাকে তবে নিঃসন্দেহে এ রকমভাবে নির্বাচিত ও নিযুক্ত একজন শাসকেরই তা আছে।"

আমার উদ্দেশ্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে স্বীয় আন্তরিক চিন্তাকে ভাষায় রূপ দিয়ে জন ব্রাইটের সুঅভিব্যক্ত অভিমতকে সমর্থন করা; স্বাধীনতার স্নেহাশীষ লাভের জন্য মানুষের যে অন্তহীন অন্বেষণ, যথার্থই তার অন্যতম সার্থক মনুষ্যসৃষ্ট রূপায়ণ এই পদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। এই মহান্ বৃত্তি এবং যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের দোষত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল এবং আমি যথাসম্ভব বড় করেই সেগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরব।

তবুও যদি প্রারম্ভেই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও গরিমা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা (একে ঠিক ভক্তি বলা যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে) স্পষ্ট করে প্রকাশ না করি তবে ঠিক সত্যভাষণ করছি একথা বলতে পারব না।

অবশ্য এই বইয়ে এই অভিনব প্রতিষ্ঠাটির বিস্তৃত ও চূড়ান্ত কোন আলোচনা করা হয় নি। বড় জোর এর প্রধান প্রধান দিকগুলির একটা সংবেদনশীল ভাষ্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সব কথাই বলতে পারছি না ব'লে গৌরচন্দ্রিকাতেই, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কেবল এই আশাই পোষণ করব যে যাঁরা এই অধ্যায়গুলি পড়বেন অতীতের গৌরব ও ভবিষ্যতের আশার মূর্ত প্রতীক এই রাষ্ট্রপতি পদের সম্বন্ধে তাঁরা স্পষ্টতর একটা চিত্র পাবেন।

এই বই সুরু হবে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত দায়িত্বভারের সম্যক্ পর্যালোচনায়, কারণ আমাদের হয়ে যে বিপুল ভার তিনি বহন করেন তাই প্রথমতঃ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যারা গিলবার্ট ও সুলিভান পড়েছেন তাঁদের পুর্তবাহকে মনে আছে নিশ্চয়ই, "মিকাডোর" সেই বিশেষ উদ্ধত ও উন্নাসিক মানুষটি, যিনি ছিলেন একাধারে 'ফার্ষ্ট লর্ড অফ দি ট্রেজারি' 'লর্ড চীফ জাষ্টিস,' 'কম্যাণ্ডার ইন চীফ,' 'লর্ড হাই এ্যাডমিরাল,' 'মাষ্টার অফ দি ব্রাকহাউণ্ডস,' গ্রুম অফ দি ব্যাকস্টেয়াস,' 'আর্চ বিশপ অফ টিটিপু' ও ক্ষমতাসীন এবং নির্বাচিত লর্ড মেয়র। কাল্পনিক পুহবাহ আমাদের পরিহাসের খোরাক জোগায়, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্ট বাস্তব পুহবাহ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। অন্ততঃপক্ষে পুহবাহ এর প্রত্যেকটি কাজের জন্যে রাষ্ট্রপতিকে তিনটি কাজ করতে হয় এবং সেগুলো মোটেই হাল্কাভাবে করা হয় না। বিশ্লেষণ প্রবণতা দোষে অভিযুক্ত হবার

সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমি রাষ্ট্রপতির কার্যাবলীর পর্যালোচনায় ব্যাপৃত হতে চাই। আমেরিকার সরকারী রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রপতিকে নিম্নলিখিত মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ হতে হয়।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি আজকের তথা সর্বকালের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রধান। এবং একে ছদ্ম অথবা অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে এমন সব ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে হয় যা তাঁকে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করিয়ে ছাড়ে—রক্ষা এই যে একদল স্থিতধী কর্মচারী এঁকে সাহায্য করার জন্যে সর্বদাই থাকেন। এই কাজের কিছু অংশ গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, প্রায় পাদ্রীজনোচিত, আর কিছু অংশ এ ব্যাপারে তিনি একেবারে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় শ্লীল আচরণের গণ্ডী বহির্ভূত। ইংল্যাণ্ডের রাণীকে ফরাসী দেশের রাষ্ট্রপতিকে এবং কানাডার গভর্ণর জেনারেলকে জনসাধারণের জন্যে যে দীর্ঘ কর্তব্যসূচী অনুসরণ করতে হয় আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে তার সবটাই করতে হয় এমন কি তাঁর পক্ষে এই সূচী বিস্তৃততর কারণ তিনি রাজা নন, রাজার কোন প্রতিভূও নন, ফলে জনতা তাঁকে স্কাউট মাষ্টার চলচ্চিত্রাভিনেতা ও জনতার নেতা বলে ভাবতে অভ্যস্ত তাই এমন সব জায়গায় এঁকে প্রত্যাশা করেন যা অনেক সময়েই মর্যাদাব্যঞ্জক নয়।

রাষ্ট্রপ্রধান বলে নয়, রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে তিনি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে আগত বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অভিবাদন জানান, অজ্ঞাত সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভে ও লিঙ্কনের সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পস্তবক স্থাপন করেন, ধন্যবাদজ্ঞাপক ও স্মরণসূচক প্রস্তাব তিনিই আনেন, সকল নাবিকদের পদক উপহার দেন, কূটনৈতিক দূতবর্গ ও সুপ্রীম কোর্টের উদ্দেশ্যে ভোজসভার আয়োজন করেন, জাতির পক্ষ থেকে ক্রীসমাস উৎসবের আলোকবৃক্ষ প্রজ্জ্বলিত করেন, বৈদেশিক যুদ্ধের অবসৃত সৈনিকদের কাছ থেকে প্রথাগতরূপে প্রথম পপিটি কিনে নেন, প্রথম কড়কড়ে ব্যাঙ্ক নোটটি রেডক্রসের হাতে তুলে দেন, সিনেটারদের উদ্দেশ্যে প্রথম বলটি ছুড়ে দেন, "ইষ্টার-বাণি" উৎসবের আরম্ভ-সূচক ডিমটি গড়িয়ে দেন। তাছাড়া তো মাসে মাসে হরেক রকম দেখা-শোনার মিছিল লেগেই রয়েছেঃ ক্যামার ম্যান, খেলোয়াড়, বয়স্কাউট, শিবির-সভ্যা, বিদেশী ছাত্র, ইস্কুলের তাজা তাজা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

বাৎসরিক তহবিল বৃদ্ধি অভিযান হোয়াইট হাউস থেকে পাঁচ মিনিট ব্যাপী টেলিকাস্ট প্রদত্ত নির্দেশ ছাড়া কি ভাবেই বা অগ্রসর হত। আর সেই রবিবার তো রবিবারই নয় যদি না রাষ্ট্রপতি তাঁর ভার্যার সঙ্গে গির্জেয় না যান। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং যতক্ষণ না ওয়াশিংটনে রূপালী চাবি টিপছেন, নয়তো বা কোর্ট পেক কি হানফোর্ড কি টেনেসি উপত্যকায় একবার ডিনামাইট বিস্ফোরণ করছেন, ততক্ষণ কোন জনকল্যাণ কর্মই বা সার্থকতার স্পর্শ পাচ্ছে।

শুধুমাত্র হোয়াইট হাউস কি নগরের চতুষ্পার্শ্বে এই সব কাজ সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই। জনসাধারণ চায় তিনি বারবার তাদের মধ্যে আসুন, তাঁর মহান্ সফরে বেরিয়ে পড়ুন—জর্জ ওয়াশিংটন যাকে উৎসবের আনুষ্ঠানিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে চলে গিয়েছেন। বস্তুতঃ এই প্রথাও রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে প্রচার ধর্মের স্পর্শ থেকে মুক্ত নয়। যদি এ সপ্তাহে তিনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিম্বা প্রত্যভিবাদন না করেন তো আর সপ্তাহে তাঁকে তা করতেই হবে। তাছাড়া বিশেষ করে নির্বাচনী বছরে কোন রাষ্ট্রপতি কাকেই বা হোয়াইট হাউসের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দেবেন—সেই বছরের কোন শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে, রেলপথের পরিব্রাজককে, কিম্বা বছরের শ্রেষ্ঠ কোন ট্রাকচালককে ?

সংক্ষেপে, রাষ্ট্রপতি মার্কিনী মানুষের একক প্রতিরূপ, যেমন রাণী বৃটিশ জনতার। রাষ্ট্রপতি ট্যাক্‌টের ভাষায় রাষ্ট্রপতি জনমানসের "ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, তাদের মান-মর্যাদার প্রতিনিধি"। (প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য শ্রীট্যাফট্ নিজেই এ রকম প্রতিনিধি হবার মতো সমস্ত গুণ প্রকৃতির কাছ থেকে অজস্র পরিমাণে পেয়েছিলেন)। আবার এ্যাটর্ণি জেনারেল স্ট্যানর্বোর সুপ্রীম কোর্টে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে "মিসিসিপি বনাম জনসন" বিচার উপলক্ষ্যে যে কথা বলেছেন তাও স্মরণযোগ্য :

"নিঃসন্দেহে নিছক ব্যক্তির দিক্ থেকে রাষ্ট্রপতি ও রাজার মধ্যে দুস্তর তফাৎ। কিন্তু সরকারের কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠানের দিক্ থেকে দেখতে হলে গ্রেট বৃটেনের রাজা কিম্বা পৃথিবীর শক্তিমান্ যে কোনো ব্যক্তির থেকে রাষ্ট্রপতি পদের মূল্য একতিলও কম নয়। রাষ্ট্রপতি তাঁর দেশের জন-সাধারণের এবং ন্যায়নীতির যে গৌরবদৃপ্ত প্রতিভূ তা পৃথিবীর যে কোন

একচ্ছত্র অধিপতি বা স্বাধীন সরকারের সর্বাধিনায়কের প্রতিনিধিত্ব থেকে কোন অংশে মর্যাদার নয়।"

রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা আপাত তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রপতিই এটা অবহেলা করতে পারেন না—যিনি জনসাধারণের আনুকূল্য অথবা জনতার সাহচর্য্য চান। আর জনতাই তো তাঁর শক্তির উৎস। রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় বলে রাষ্ট্রপতির বেশ বড় রকমের সময় অপচিত হয় তথাপি হ্যারি. এস. ট্রুম্যান রুটিন নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম ও অপরাপর কর্মসূচীর মধ্য থেকে সময় করেই সেই ভূমিকায় দক্ষভাবে অভিনয় করেছিল। এই ভূমিকা তিনি সম্যক্‌ভাবে পরিগ্রহ করুন কি নাই করুন, কোন রাষ্ট্রপতিই অস্বীকার করতে পারবেন না যে তাঁর সর্বকর্মই অনুপ্রাণিত, ক্ষমতার নতুন ব্যাপ্তিতে ভাস্বর, কেননা তিনি আমাদের স্বাধিকার, চিরন্তনতা এবং মহিমার প্রতীক। যখন তিনি কোন সেনেটারকে কোনো ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় তার সমর্থন পাবার অভিপ্রায়ে ভোজে আমন্ত্রণ করেন, যখন তিনি ডেস্ক চাপড়ে আমেরিকার মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে শ্রম-সমস্যা বিষয়ে কিছু কথা প্রতিপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন, যখন তিনি সেনাপতিকে কর্মবিরতির আদেশ জানান, সিনেটার ও প্রতিবাদীরা তখন ঠিকই বুঝতে পারেন—বিশেষতঃ সেই ঘটনা যদি হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়—যে তাঁরা কোন সাধারণ সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন না। সংবিধানের রচয়িতৃবৃন্দ একই নির্বাচনমূলক 'অফিসে' রাজমহিমা ও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা সমাহৃত ক'রে যুগান্তকারী ঘটনা সাধন করেছিলেন। তাঁরা যদি আর কিছু নাও করে থাকেন, আমাদের তাঁরা এমন একটি "পিতৃপ্রতিমান" (Father image) উপহার দিয়ে গেছেন যা উগ্র রাজনৈতিক ফ্রয়েডবাদীকেও তৃপ্ত করবে।

রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় ভূমিকা প্রধান কার্যনির্বাহক বা Chief Executive-এর। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক আবার অনুশাসনও তাঁর কাজ। তিনি জনতার প্রতিভূ, আবার সরকার চালনাও তাঁরই কাজ। হ্যামিল্টন The Federalist-এ লিখেছিলেন, "সুপরিচালিত সরকারের যথার্থ পরিচয় হলো সুশাসনের ক্ষমতা ও প্রবণতা।" এই উক্তির সঙ্গে একথাও তিনি স্পষ্ট করে লিখেছিলেন যে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রপতির প্রথম দায়িত্বই হলো সুষ্ঠু শাসন।" এ সম্পর্কে পরে

বিশদ আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ বক্তব্য রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত যতো অসংখ্য ব্যাপারে যত প্রসন্নভাবেই লিপ্ত থাকুক না কেন, সুষ্ঠুভাবে শাসন চালাতে তাঁকে অন্যান্য কাজের তুলনায় বেশ হিমসিম খেতে হয়। এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা তাঁর দায়িত্বের তুলনায় অনেকটা কম। তবু এই ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না রাষ্ট্রপতির কর্তব্যের সামগ্রিক দ্যোতনার তাৎপর্য্য আমরা তখনই বুঝতে পারি যখন মনে করি যে প্রায় পঁচিশ লক্ষ সরকারী কর্মচারীর ন্যায়নীতিবোধ, আনুগত্য, দক্ষতা, পরিমিতিবোধ ও জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীলতার জন্য তাঁকেই প্রাথমিকভাবে এবং প্রায়শঃই সামগ্রিকভাবে দায়ী করা হয়।

সংবিধান ও কংগ্রেস দুই-ই শাসন বিভাগের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর উপর তাঁর খবরদারি মেনে নিয়েছেন, যদিও এই খবরদারি প্রায়শঃই বেশ স্তিমিত এবং সংযত হয়ে পড়ে। শাসনতন্ত্র থেকে তিনি প্রকাশ্যতঃ বা প্রচ্ছন্নতঃ নিয়োগ ও অপসারণের দ্বৈত ক্ষমতা পেয়েছেন আর পেয়েছেন সেই দায়িত্ব যা কোন আইন, অনুশাসন বা ঘটনাই কোন সময়ে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না—শাসনতন্ত্র সংরক্ষণের সেই ন্যস্ত দায়িত্বভার। তিনিই পারেন সেনেটের পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে সরকারের কয়েক সহস্র উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতে, যাঁরা আইন বলবৎ করতে গাফিলতি করেন তাঁদের কর্মচ্যুতির নির্দেশ দিতে; তাঁর অধীনস্থ সচিববৃন্দ, সেনানায়ক বা এ্যাটর্নী যদি তাঁর অনুশাসন ঠিকভাবে কার্য্যকরী না করেন তবে তাঁদের অপসৃত করার আদেশ দিতে তিনিই পারেন।

এই অদৃশ্য প্রভাব, এই অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার কাছে তাঁর পারিষদ্‌বর্গকে বিনত করেছে। আরো স্পষ্টভাষায় বলা যায়, প্রধান কার্য্যনির্বাহক হিসেবে এই তাঁর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এবং শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত যে কোন কর্মচারী, এমন কি স্বাধীন কোনো স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্দলীয় সভাপতিত্ব রাষ্ট্রপতির অসন্তোষভাজন হতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা অথবা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার কোনো সভ্য হয়তো আইনের দ্বারা সুরক্ষিত; রাষ্ট্রপতি যেমন সৈন্য বিভাগের সচিব বা বাজেট পরিচালকের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন তা হয়তো উক্ত সভ্যের কাছে দাবি করতে পারেন না, কিন্তু সেই সভ্য যদি পথভ্রষ্ট হন, যেমন, ধরা যাক্, যদি সপ্তাহের পর

সপ্তাহ পানোন্মত্ত হয়ে কার্য্যস্থলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের আইন রক্ষার ভারপ্রাপ্ত প্রধানপুরুষের কাছে তিনি অব্যাহতি পাবেন না। তাঁর কর্মজীবনের সেখানেই ইতি, অথবা হোয়াইট হাউস থেকে আরোপিত অপসারণের কোন ছদ্মচাপ খুব মোটা চামড়ার সেই দুষ্কৃতকারীকেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংযোগ সংস্থা থেকে রিচার্ড এ ম্যাকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পদত্যাগ এই ঘটনার অনতি-অতীত একটি দৃষ্টান্ত। কংগ্রেস কমিটি থেকে উদ্‌ঘাটিত তথ্যে যখন ধরা পড়লো যে কমিশনার ম্যাক এবং জাতীয় এয়ারলাইনের ম্যাকের মধ্যে আপাত স্বার্থদ্বন্দ্ব রয়েছে তখনই হোয়াইট হাউস অনুসন্ধানে সক্রিয় হয়ে উঠলো এবং শ্রীযুত ম্যাক কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে কাজে ইস্তফা দিলেন। কখনো বা রাষ্ট্রপতি নিজেই তৎপর হয়ে কোনো কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে পারেন, যদি সেই কর্মী মারাত্মক কোন অপরাধে লিপ্ত হন অথবা যা আরো সম্ভব যদি সেই কর্মটি তাঁর কর্মজীবনের দলিল ও নিজের ন্যায়শীলতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আস্থাশীল হয়ে পদত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বিচারক হোমস্ একসময়ে বলেছিলেন শক্ত মামলার ফলে মন্দ আইন প্রণীত হয়। তবু আমার মনে হয় ১৯৩৮এ ডক্টর এ. ই. মর্গ্যানকে টেনেশি উপত্যকা কর্মপরিষদের সভাপতি পদ থেকে রুজভেল্টকৃত অপসারণের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদের সুশাসন ক্ষমতার অপূর্ব একটি ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশ্রীরকম মতান্তরের ফলে ঐ কর্মপরিষদে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় তার দূরীকরণের জন্য যখন ডক্টর মর্গ্যানের সহায়তা চেয়েও তিনি পেলেন না তখন রাষ্ট্রপতি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে বরখাস্ত ক'রে নতুন একজনকে নিয়োগ করলেন এবং এ কর্মপরিষদকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। অনেক তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে নানা লোকে স্বৈরতন্ত্রের সূচনার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কিন্তু রাষ্ট্রপতির এ কথার কেউ সার্থক উত্তর জবাব দিতে পারলেন না যে যদিও মর্গ্যানের দায়িত্বভার তিনি নিজে বহন করতে পারেন না, যদিও আইন এবং অনুশাসন দ্বারা সংরক্ষিত একটি কর্মপরিষদেব সিদ্ধান্ত তিনি স্বীয় মতামতদ্বারা উল্টে দিতে পারেন না তথাপি টেনেসি উপত্যকা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলীর বিধান দিতে তিনি শুধু সক্ষমই নন বাধ্যও।

কংগ্রেসের কাছ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট ও এ্যাকাউন্টিং এ্যাক্ট ও

পুনর্গঠনসূচক নানা আইনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রশাসনিক নেতৃত্বের আরো অনুমোদন পেয়েছিল। যদিও আন্তরাষ্ট্রীয় স্বয়ং স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক সংস্থা এবং জাতীয় শ্রম সম্পর্ক সংস্থা তাঁর ক্ষমতার পরিধি বহির্ভূত, তবু অধিকাংশ শাসনসংক্রান্ত কাজকেই একটি বিরাট পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, রাষ্ট্রপতি যার একক চূড়া বিশেষ। যে সব আইন প্রতিদিন তাঁর নামে চলছে এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারা সংখ্যায় শত শত। একটি বিশেষ কাজ রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত দায়িত্বের সবিশেষ দৃষ্টান্ত—যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেটের প্রস্তুতি ও তার প্রযোগ। একটি বিশেষ কার্য্যক্রম রাষ্ট্রপতির তার অধস্তন কর্মচারীদের উপর প্রতিপত্তির পরিচায়ক যেমন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ২১শে মার্চ ১৯৪৭ এ প্রদত্ত ৯৮৩৫ সংখ্যক আদেশাজ্ঞা যা ১৯৫৩ এর ২৯এ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ার প্রদত্ত ১০৪৫০ সংখ্যক আদেশপত্রের দ্বারা আরো দৃঢ়ীকৃত হ'ল। "ইউনাইটেড্ স্টেটস কোর্ড্" নামক গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদে স্পষ্টতই বলা হয়েছে কংগ্রেস তাঁর কাছে কতটা আশা করেন:

রাষ্ট্রপতিকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের অসামরিক বিভাগে প্রবেশার্থীর জন্য তিনি নীতি প্রণয়ন করতে পারেন; বয়ঃক্রম, স্বাস্থ্য, চরিত্র, জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে কেহ কর্মক্ষেত্রের বিশেষ শাখায় প্রবেশ করতে পারে এবং উন্নতিবিধান করতে পারে এই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করতে পারেন, তাঁদের কর্মপন্থা ঠিক করে দিতে পারেন এবং যাঁরা অসামরিক পদ পাবেন তাঁদের কার্য্যসীমা তিনি নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত শোনা যেতে পারে। পাব্লিক সার্ভিসের প্রকৃতি, মর্যাদা ও সমস্যা আলোচনাকল্পে ষষ্ঠ আমেরিকান এ্যাসেম্বলির যে অনুষ্ঠান ১৯৫৪ অক্টোবর মাসে আর্ডেন ভবনে হয়েছিল তার থেকে একটি অংশ তুলে ধরছি:

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি সার্ভিসের শাসনসংক্রান্ত বিভাগের নেতৃত্বভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। নিয়মতান্ত্রিক নীতি, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনবোধ সব কিছু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যৌথ পরিচালনার অনিবার্য প্রশাসনিক দায়িত্বের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব শাসনসংক্রান্ত বিভাগের সমস্ত কর্মচারী, দলনেতা ও কংগ্রেসের সভ্যদের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত হবে।

জাতীয় সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতিকে এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে।

তাঁর ডাকবিলির সুব্যবস্থার জন্যই হোক বা কর সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্যই হোক একজন সাধারণ নাগরিক শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতিরই স্মরণাপন্ন হবেন। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্রপতি এ সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতেন, এখনও প্রায় দশ কোটি লোক জানেন না যে সেই সময় বহুদিন আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রপতির তৃতীয় দায়িত্বটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইচ্ছা করলেই সেটিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না যদিও একাধিক রাষ্ট্রপতি এটিকে এড়াবার চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। শাসনতন্ত্রে তাঁকে বিশেষ ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য ও নৌবিভাগের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে তিনি সামরিক সর্বাধিনায়ক, তিনিই সামরিক অধিকারের উপর অসামরিক কর্তৃত্বের জীবন্ত প্রতিশ্রুতি।

শান্তিকালে তিনিই কংগ্রেস পোষিত সৈন্যশক্তি পালন করেন, শিক্ষিত করেন, তত্ত্বাবধান করেন এবং সৈন্যশক্তির আকার ও সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর প্রভূত বক্তব্য থাকে।' তাঁর স্বমনোনীত প্রতিরক্ষাসচিব, সৈন্য বিভাগের তিন প্রধান সচিব, যুগ্ম সমরাধিনায়ক এঁদের সবার উপর তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা বাবদ নির্ভর করেন। একদিনের জন্যও তিনি ভুলতে পারেন না যে দেশ শত্রু আক্রমণের সম্মুখীন হলে তাঁকে সাধারণ নাগরিক, কংগ্রেস ও ইতিহাসের কাছে দায়ী হতে হবে। ১৯৪৬ এ প্রণীত আণবিক শক্তিসংক্রান্ত আইনে রাষ্ট্রপতির এই সামরিক দায়িত্বের ব্যাপ্তি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

ষষ্ঠ পর্য্যায় (ক) নির্দেশ। কমিশনকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তা—

(১) আণবিক শক্তির প্রয়োগ ও উন্নয়নকল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়।

(২) আণবিক বোমা, তার অংশ অথবা যে কোনো বিস্ফোরণমূলক সামরিক অস্ত্রের উৎপাদনে ব্রতী হয়।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির প্রকাশ্য অনুমোদন বা নির্দেশনা এই সূত্রে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় এবং সেই অনুমোদন বৎসরে অন্ততঃ একবার

দরকার। রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারেন যে এই বিস্ফোরণমূলক মাল মশলা বা অস্ত্রশস্ত্রাদি সামরিক বিভাগের কাছে জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য সঁপে দিতে; আবার তিনি সেনাবাহিনীকে ঐ সব মালমশলা বা বিস্ফোরক উপাদান উৎপাদন বা সংগ্রহ করে সামরিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশও দিতে পারেন।

এ কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, সেনেটর ব্রিকারের মর্মাহত প্রতিবাদ সত্ত্বেও অধিকাংশ নাগরিক ১৯৫০ এ ট্রুম্যানের এই ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হওয়া উচিত। কংগ্রেস হয়তো এই ধরণের কর্মভার গ্রহণের জন্য তহবিল থেকে কিছু মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হয় নি, তবু রাষ্ট্রপতি তাঁর অধীনস্থ অপরাপর সম্ভাব্য সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তাঁর সংকল্পে এগিয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন। আর দৃঢ়চেতা সেই একই মানুষ তো ১৯৪৫ এ দেখালেনই যে যুদ্ধকালে এটা রাষ্ট্রপতিই ঠিক করবেন কি করে এবং কোথায় হাইড্রোজেন কি আণবিক কি যে-কোনও বোমা নিক্ষেপ করা হবে।

যখন যুদ্ধের নির্ঘোষ আমাদের কর্ণরন্ধ্র বিস্ফারিত করে, রাষ্ট্রপতির সেনাশক্তি চালনার গুরুভার অপরাপর দায়িত্বকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সমস্ত রকম মুখ্য যুদ্ধপ্রণালী এবং নিপুণ কলাকৌশল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত তিনিই সে সময় গ্রহণ করেন। লিঙ্কন এবং ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট দুজনেই দেখিয়ে গিয়েছেন কি করে সামরিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপরে ন্যস্ত হয় এবং কি করে সেনাপতি এবং সর্বপ্রধান নৌ-সেনাধ্যক্ষদের যুদ্ধ চালনায় উদ্দীপ্ত রাখতে হয়। সঠিক সেনাপতিও নৌ-সেনানায়কের খোঁজে যে তাঁর সময়ের বৃহদংশ কেটে গিয়েছিল এ কথা আমরা লিংকনের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পারি।

কিন্তু এই পরিচালনক্ষমতা আধুনিক রাষ্ট্রপতির বিরাট দায়িত্বের অংশমাত্র। সংবিধানের রচয়িতারা এই ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ মত পোষণ করেছেন। হ্যামিল্টন ফেডারেলিস্ট এ অত্যন্ত হাল্কাভাবে লিখেছিলেন, "এর ফলে বোঝাবে যে সামরিক ও নৌ বিভাগীয় চূড়ান্ত ক্ষমতা বা সংযুক্ত রাষ্ট্রের (confederacy) ও সামরিক বাহিনী চালনার ও নৌ-সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত।"

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সামরিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধে এই হাল্কা ধারণা প্রথম মহাযুদ্ধের রূঢ় অভিজ্ঞতায় ভেঙে গিয়েছে। জরুরি, নিরঙ্কুশ কর্মপন্থা গ্রহণ

করার প্রয়োজন বোধ করায় লিঙ্কন প্রথমে সন্তর্পণে কিন্তু পরে দৃঢ়ভাবে "Commander-in-chief" ধারার ব্যবহার করেছিলেন। কেননা, তিনি ইতঃপূর্বে এমন কতকগুলি আকস্মিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন যা জন-সাধারণের স্বাধীনতা ও সরকারের প্রচলিত কর্মধারাকে বিব্রত করেছিল। উইলসন যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতিত্বে আরো মহিমা যোগ করেছিলেন যখন তিনি কংগ্রেসের কাছ থেকে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যাপারে নিরঙ্কুশ আধিপত্য চেয়েছিলেন যার নিয়মতান্ত্রিক বৈধতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ ছিল। লিঙ্কন সম্বন্ধে যিনি বেশ পড়াশুনা করেছিলেন এবং উইলসনের সঙ্গে বাস করেছিলেন সেই ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতি পদাধিকারকে মার্কিনী অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করে গিয়েছেন। আপৎকালীন বাহিনীর সৃষ্টি ও বিন্যাস, ষাট বা ততোধিক ধর্মঘটী কারখানার ভারগ্রহণ ও চালনা, জাপানি বংশোদ্ভূত ৭০,০০০ মার্কিণ নাগরিকদের পশ্চিম তটসীমা থেকে বাধ্যতামূলক অপসারণ—এই তিনটি চমকপ্রদ ও অসাধারণ দৃষ্টান্তই প্রমাণ করে—যুদ্ধরত সৈন্যদের স্বপক্ষে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কি পরিমাণ দৃঢ় হতে পারেন। একথাও স্মরণীয়, রুজভেল্ট কৃত উল্লিখিত প্রতিটি কাজই কংগ্রেস সমর্থন করে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছিল এবং তাঁর সহযোগীদের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করার অপরাধে অভিযুক্ত কর্মচারীদের শাস্তির বিধানও কংগ্রেস করেছিল। কংগ্রেসও বলা বাহুল্য, যুদ্ধজয়ে উৎসুক। রাষ্ট্রপতিকে তার নিষ্ক্রিয়তার জন্য কংগ্রেস বরং তাঁকে দোষীই করেন, তাঁর অবলম্বিত দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা তিরস্কার করতে যাবেন কেন!

এখন যখন সর্বাত্মক যুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র ও স্বরাজ্যসীমার মধ্যে অতীতের ভেদরেখা লোপ ক'রেছে এবং অমোঘ অস্ত্রের দ্বারা সেই যুদ্ধ জটিলতর হয়েছে, যাবতীয় সুমহৎ মূল্যবোধ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছে, রাষ্ট্রপতিত্বকে এমন দিনে যুদ্ধকালে আমরা নিয়মসম্মত স্বৈরতন্ত্র বলে মনে করতে পারি। আমাদের পরবর্ত্তী যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতির লিংকন কথিত সেই অধিকার থাকবে যার ফলে তিনি শত্রুকে দমন করবার জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারবেন এবং সাধারণতন্ত্রের তন্ত্রকে রক্ষার জন্য কী করা কর্তব্য তিনিই তার একক বিচারক হবেন। বলা বাহুল্য এই রাষ্ট্রপতিই আমাদের শেষ রাষ্ট্রপতি হতে পারেন! আমরা বিপুল

পরিমাণ একটি সামরিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধে ন্যস্ত করেছি, কিন্তু আর কোন্ যোগ্যতর পাত্রে তা ন্যস্ত হতে পারতো ?

তাছাড়াও, রাষ্ট্রপতি প্রধান কূটনীতিবিদ্। যদিও পররাষ্ট্র সম্পর্কসূত্রে সংবিধান সম্মতরূপে রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস এবং সেনেটের (শেষোক্তটি দুটি বিশেষ ব্যাপারে) মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত তবু তাঁর ক্ষমতা একমাত্র না হলেও চূড়ান্ত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শাসনসংক্রান্ত বিভাগের সমালোচক জন মার্শালও বলেছিলেন "রাষ্ট্রপতিই হলেন বহিঃসম্পর্ক ব্যাপারে জাতির একমাত্র প্রতিভূ এবং পররাষ্ট্রগুলির নিকট জাতির একমাত্র প্রতিনিধি"। ১৯৩৬-এ শাসনসংক্রান্ত বিভাগের অনুরূপ সমালোচক যিনি বিশেষ করে রুজভেল্টের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন সেই বিচারপতি সাদারল্যাণ্ড তাঁর বিচারালয়ের অনুমোদনের ছাপ দিয়ে বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক্ সম্পর্করক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একান্তভাবেই সূক্ষ্ম, চরম ও নিরঙ্কুশ।

শাসনসংক্রান্ত বিভাগ সম্পর্কীয় ক্ষমতার এই প্রাধান্যের ফলে কখনো কখনো অবলম্বিত পন্থাটি বিরুদ্ধপক্ষের আক্রমণের বিষয় হয় এবং সত্যিই রাষ্ট্রপতি প্রায়শই স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছাচারীর মত কাজ করেন যা সংবিধান কর্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। তবু এই সূত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রায় অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে এবং বিংশ শতকের তিনজন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির যোগসাজ সেই বুঝি বা এটি সম্ভবপর হয়েছে। সংবিধান, আইন, প্রথা, অপরাপর জাতির জীবন বিন্যাস এবং ইতিহাসের যুক্তি—এই সব মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতিকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছে। গোপনতা, সংবাদ প্রেরণ, ঐক্য, নিরন্তর পারম্পর্য্য এবং তথ্য চেতনা এই সবই তাঁর কর্মের অন্তর্গত যার একটি লক্ষণও বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিভাত নয়। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কংগ্রেস অবশ্যই অমিত শক্তিসম্পন্ন, যা প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গের ১৯৫৯ এর মার্চ মাসের অভূতপূর্ব সম্মেলনে প্রমাণিত—তবু সেই ক্ষমতা প্রয়োগে ও প্রকৃতিতে নেতিবাচক এবং যদি এ সবের দ্বারাও রাষ্ট্রপতির শ্রেষ্ঠত্ব না বোঝায়, মনে রাখতে হবে, যা আমরা ইতঃপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, তিনিই সশস্ত্র সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়ক যার বাস্তবিক বা আপাত প্রদর্শিত শক্তি এই—বিশ্বের কূটনীতির মূল উপজীব্য বিষয়।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রটি মোটামুটিভাবে দুটি অংশে ভাগ করা যায়; পলিসি বা পদ্ধতি প্রণয়ন এবং কর্মধারা প্রয়োগ। প্রথমোক্তটি হলো মিলিত প্রবর্তনার

ফল যা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব, কংগ্রেসের সম্মতি এবং পরিণামী লোক ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব সাধারণতঃ সমর্থিত হয়। আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন ও সম্মানিত পদ্ধতিটি মনরো নীতি বলে সুবিদিত। আমাদের সাম্প্রতিক বছরগুলির শ্রেষ্ঠ নীতি টুম্যান নীতি ও আইজেন হাওয়ার নীতি। ১৭৯৩এ ওয়াশিংটনের নিরপেক্ষতার ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৯৫৯এ বার্লিনে দৃঢ় অবস্থানের নির্দেশ পর্য্যন্ত হিসাব করলে দেখা যাবে যে রাষ্ট্রপতি প্রায়শই জাতিকে দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরব্যাপী কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই নির্দ্দেশে একাধিকবার যুদ্ধপ্রসঙ্গও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কখনো কখনো কংগ্রেস তাঁকে অবলম্বিত পদ্ধতি বর্জন করতে বাধ্য করেছে—যেমন সাতো জেমিঙ্গো সম্পর্কে গ্রাণ্টের নীতি, আবার কখনো বিরক্তিকর পদ্ধতি তাঁর উপর আরোপ করেছে যেমন ১৮১২তে ম্যাডিসনের উপর এবং ১৮১৮তে ম্যাক্‌কিনলির উপর। তৎসত্ত্বেও একজন শক্ত রাষ্ট্রপতিকে টলানো কঠিন একজন দৃঢ়ব্রতী রাষ্ট্রপতি অপ্রতিহত। দুই রুজভেল্টের কূটনৈতিক জীবন এই উক্তির প্রমাণ। টুম্যান ১৯৪৮ সালে যেদিন যুদ্ধ প্রত্যাগত ইহুদি প্রাক্তন সৈনিকদের ঘরোয়া আসরে বলেছিলেন. "আমিই আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির স্রষ্টা" তখন এতটুকু অতিশয়োক্তি করেন নি।

জেফারসন লিখেছিলেন পররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। এবং কংগ্রেস যদিও চেষ্টার ক্রটি করে নি তবু পররাষ্ট্র ব্যাপারে সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাহির করতে বা সংগঠনমূলক সমালোচনা করতে সফল হয় নি। রাষ্ট্রপর্ষৎ (State Department) তার অনেক কাজই রাষ্ট্রপতির নামে চালায় এবং তিনিই তো দিনানুদৈনিকভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। সন্ধি আলোচনা, কার্যনির্বাহ মূলক চুক্তি কূটনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগ ও দেখাশুনা, বিধিসম্মতরূপে পণ্যশুল্কের সীমানা নির্ণয় রাষ্ট্রপুঞ্জে—প্রেরিত দূতগণের প্রতি নির্দেশ জ্ঞাপন এবং বৈদেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে যোগরক্ষা এ সবি তাঁর দ্রষ্টব্য। সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি আমাদের সৈন্যশক্তিকে দূরবিস্তৃত করেন এবং কখনো বা তাঁর "রাষ্ট্রপতি সুলভ যুদ্ধপ্রস্তুতি" নামক পদ্ধতি দিয়ে আমাদের নীতির সংরক্ষণ করেন। রাষ্ট্রপতিই পারেন পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে স্বল্পকালীন মেয়াদের মধ্যেই দ্রুত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে—যদিও কিউবার বৈপ্লবিক রাজতন্ত্রকে

স্বীকৃতি জ্ঞাপন, ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা, সুইস ঘড়ির উপর করবৃদ্ধি এ সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত খুব অল্পকালের মধ্যে নিষ্পন্ন হ'লেও তাদের জের খুবই দূরব্যাপী।

গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রধান কূটনীতিজ্ঞের ভূমিকাটিই রাষ্ট্রপতির অন্যতম ও আকর্ষণীয় ভূমিকায় পরিণত হয়েছে। বস্তুতঃ ডালেস ভ্রাতৃগণ, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ্, সেনেটর ফুলব্রাইট ও উইলি, দেশে অভ্যাগত নেহেরু, ম্যাকমিলান বা ডিফেনবেকারের সঙ্গে কথোপকথন, জাতির উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যামূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা, প্রার্থী নির্বাচন ও কংগ্রেসকে বার্তাপ্রেরণ, ক্রুশ্চেভ, জুকভ ও বুলগানিনের সঙ্গে সংযোগরক্ষার কথা না হয় নাই উল্লেখ করলাম—এই সব ব্যাপারে আইজেনহাওয়ার একনিষ্ঠ মনোযোগ দিয়েও কি করে অপরাপর কাজ করার সময় পেতেন, ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

রাষ্ট্রপতি যে শুধুমাত্র শাসনসংক্রান্ত কর্তব্যেই যুক্ত তা নন, শাসনতন্ত্র বা প্রথা অনুসারে তিনি আইনপ্রণয়ণমূলক বা Legislative প্রক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত। সেদিক থেকে তাঁকে আমরা প্রধান আইনপ্রণেতা বলতে পারি। কংগ্রেসে অবশ্য সুদক্ষ ও মেধাবী সভ্যের অভাব নেই, তবু সাধারণ মানুষ চায় সকল জটিল সমস্যার আশু সমাধান এবং সে জন্যেই একজন সপ্রতিভ নেতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই রাজনৈতিক, শাসনতন্ত্রানুগ এবং বাস্তব দিক থেকে সেই নেতৃত্বের উপযোগী এবং সেজন্য শাসনতন্ত্রানুগ ও রাষ্ট্রনৈতিক যাথার্থ্য রক্ষা ক'রে কংগ্রেসকে আইনপ্রণয়নের কার্য্যে সাহায্য করা তাঁরই কর্তব্য। কংগ্রেস এখন আর স্বয়ংচালিত প্রতিষ্ঠান নয়, এমন কি সেনেটর জনসন এবং স্পীকার বেবার্ণের মতো দৃঢ়চেতা পুরুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও নয়। তাই রাষ্ট্রপতির অসামর্থ্য ও অপটুতা শাসনব্যাপারে সপ্তাহকালের মধ্যে অচলাবস্থা আনতে পারে।

শাসনসংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ণগত বিষয়ের সম্পর্ক কয়েকটি পরিবর্তনীয় ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক চারিত্র্য, রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর পরিস্থিতি, রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের প্রাণশক্তি ও বিচক্ষণতা কংগ্রেসের মর্জি যা রাষ্ট্রপতির কার্য্যকালের সূচনায় মৈত্রীমূলক কিন্তু পরে প্রায় বিদ্রোহমূলক। তবু রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হচ্ছে—'ক্ষমতা পৃথকীকরণ' ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা—অর্থাৎ কংগ্রেসের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতিকে

শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতানুযায়ী—একটি সেসনে প্রায় সহস্রবার ভেটো (নেতিবাচক ভোট) প্রয়োগ করতে হয়, বছরে একবার "দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা" (State of the Union) সম্পর্কে বলতে হয়, প্রায়শঃই এমন সব নির্দেশ উপজীব্য আইন সম্বন্ধে দিতে হয় যা তাঁর মতে আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, বাৎসরিক বাজেট উপস্থাপিত করতে হয় এবং তাঁর সংস্থার (Party) অপেক্ষাকৃত অ-বিতর্কমূলক প্রতিশ্রুতি কার্যে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হতে হয়। আইজেন-হাওয়ার ১৯৫৯ এ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, "সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে আইনপ্রণয়ন কর্মের ঠিক মাঝখানে রেখেছে। উইলসন, রুজভেল্ট এবং কথনো কথনো আইজেনহাওয়ারের মত ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রপতিত্ব প্রধানমন্ত্রীত্ব কি 'কংগ্রেসের তৃতীয় সংসদে' পরিণত হয়েছে—এবং রাষ্ট্রপতির প্রধান করণীয় হয়েছে তাঁর বা তাঁর দলের আইন সংক্রান্ত অভিপ্রায় কার্যে রূপায়িত করা। আমাদের অধিকাংশ নন্দিত বিধিবিধানের উপর রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। এই সব আইনের খসড়া—রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রণীত, তাঁর বন্ধুবর্গ দ্বারা প্রস্তাবিত ও সমর্থিত তাঁর পার্শ্বচরদের দ্বারা নানা সমিতিতে তাঁর স্বপক্ষে প্রকীর্তিত, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠা সহকারে দলের ভোটদ্বারা সমর্থিত এবং তাঁর স্বাক্ষরিত হবার ফলে আইনে পরিণত। স্বাক্ষর অবশ্য কয়েক ডজন কলমের দ্বারা প্রদত্ত যা পরে উৎফুল্ল বন্ধুবান্ধব ও সহচরদের মধ্যে বিতরিত। এর মধ্যে অবশ্য তাঁর প্রস্তুতিপর্ব—তাঁর প্রধান অধস্তন কর্মচারী বা বিরুদ্ধ দলের কয়েকজনের সঙ্গে প্রাতরাশ, তাঁর নির্বাচনী সমর্থকদের সঙ্গে গল্পগুজব, কংগ্রেস কি করে তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পা সরিয়ে নিচ্ছে সে বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা, পৃষ্ঠপোষকতার লোভনীয় প্রতিশ্রুতি যা দ্বিধাগ্রস্ত এমন কি প্রতিকূল সেনেটরকে পর্যন্ত বশীভূত করতে পর্যাপ্ত; এবং ভেটোপ্রদানের সেই হুমকি যা গর্দানের মাথার মতো তিনি বিপক্ষীয়দের উপর ঝুলিয়ে রেখে তাঁদের প্রতিকূল সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করার ইচ্ছা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

এমন কি যে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেসীয় সংখ্যাধিক্যের সমর্থন নেই, তাঁকেও নেতৃত্বসূচক নানা স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অষ্টম কংগ্রেসের প্রজাতন্ত্রী বা রিপাবলিকান সদস্যরাও শ্রম, কর, মুদ্রাস্ফীতি, শিক্ষা সম্বন্ধে ট্রুম্যানের প্রস্তাব-গুলি ধৈর্য্য সহকারে শুনেছেন, সেগুলো সম্বন্ধে যতই কম মনোযোগ তাঁরা দিন না কেন, যদি আমরা স্পীকার রেবার্ণ এবং সেনেটর জনসনের প্রতিবাদের

সাক্ষ্য মানি তবে বলতেই হয় যে গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাব শ্রবণ এবং তাঁর নেতৃত্বের কশাঘাত অনুভবের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক, আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের মধ্যকার শাসনতন্ত্রসম্মত প্রধান সেতু আজ রাষ্ট্রপতিই। কংগ্রেসের নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্যগুলি দুরূহ ও সূক্ষ্ম তবু তিনি সেগুলো সুষ্টুভাবে পালন না করলে অকৃতকার্য্য বলে প্রতিপন্ন হবেন। যে রাষ্ট্রপতি একনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসকে চালনা করতে পারেন না, মানসিক কি রাজনৈতিক প্রবণতার দিক্ থেকে যিনি কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না, তিনি যথার্থই জাতীয় দুর্ভাবনার পাত্র বলে এখন বিবেচিত হন।

রাষ্ট্রের প্রধান, প্রধান কার্য্যনির্বাহক, সর্বাধিনায়ক, প্রধান কূটনীতিজ্ঞ, প্রধান আইন প্রণেতা—এই কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রপতির সংবিধানসম্মত গুরুভার দায়িত্বের অন্তর্গত। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ট্রুম্যানের লোকগ্রাহী বক্তৃতাবলীতেই একথা সহজগ্রাহ্য, এই ক্ষমতাগুলির এমন একটি যোগফল রয়েছে যা সিজার, চেঙ্গিজ খান্ কিম্বা নেপোলিয়নকেও ঈর্ষায় জর্জরিত করতে সক্ষম। তা সত্ত্বেও মাত্র এগুলিই রাষ্ট্রপতির যাবতীয় দায়িত্ব নয়। অন্ততঃ আরো পাঁচটি অতিরিক্ত দায়িত্ব তাঁর আছে।

সদ্যোল্লিখিত অতিরিক্ত দায়িত্বগুলির মধ্যে প্রথমটি হলো দলের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা। জনদাবিতে এই ভূমিকায় তিনি টমাস জেফারসনের আমল থেকেই অংশ গ্রহণ করেছেন। দলীয় বিভেদ সম্পর্কে ওয়াশিংটনের বিরাগ যতই প্রবল হোক, তাঁর নিজের শাসন পদ্ধতি আমাদের প্রথম দুটি দলকে সক্রিয় করেছিল এবং দৃশ্যমঞ্চে তাদের আবির্ভাব রাষ্ট্রপতির কার্যক্ষেত্রকে বিপুলভাবে পরিবর্তিত করেছিল। রাজনৈতিক সংঘর্ষের উত্তাপ থেকে উর্ধ্বে রাষ্ট্রপতিকে আমরা যত বেশি বা যতদিন খুশিই চাই না কেন, তাঁর দলের নেতা হিসেবে তার অটুট অধিকার বা কর্ত্তব্যের কথা অবশ্যই স্বীকার করি। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে তিনিই একাধারে সবচেয়ে কম ও সবচেয়ে বেশী রাজনীতি সচেতন।

এই ভূমিকার মূল্য আমাদের প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রপতিগণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। জ্যাকসন, লিংকন, উইলসন এবং দুই রুজভেল্ট বিশেষ দক্ষরূপে দলনেতা ছিলেন। রাজনৈতিকদের সঙ্গে আদান প্রদানে অদম্য উৎসাহে

অপূর্ব সংহতি চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রথমজন। দ্বিতীয়জন সন্দিগ্ধ রিপাব্লিকান নেতৃবৃন্দকে সংগৃহীত ক'রে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মিলিত করেছিলেন এবং অন্য তিনজন কংগ্রেসীয় কর্মপন্থার ক্ষেত্রে অভিনবভাবে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। পরিচ্ছন্ন অ্যামেচার ডুইট ডি আইজেনহাওয়ার যদিও ঠিক ততোটা উদ্দীপ্ত বোধ করেন নি, তবু একনিষ্ঠভাবেই ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেছিলেন। এ সংবাদ হয়তো জর্জ ওয়াশিংটনকে বিস্মিত করতে পারতো, কিন্তু আমাদের ততোটা চমকিত করে না যে ১৯৫৫এর ২০শে জুনে যুক্তরাষ্ট্রের দাম জন্মদিনের পবিত্র অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সারাটা সকাল প্রাতরাশে ও অধিকাংশ সময় ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাব্লিকান নেতৃবর্গের সঙ্গে কয়েকটি বিপত্তি অপসারণে ব্যস্ত ছিলেন। অন্তরঙ্গ-দর্শীরাই বুঝতে পারবেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি ভূমিকার উদাহরণ প্রদর্শন করিছিলেন মাত্র। সেটি হলো এই যে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রতিদিনই—দুয়েক ঘণ্টা প্রধান গণতন্ত্রী বা প্রধান প্রজাতন্ত্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সভাপতি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নির্ব্বাচন নির্দেশ করেন, কংগ্রেসে তাঁর দলভুক্ত সভ্যদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে সংবিধানগত নথিপত্র খুব ভালো হওয়া প্রয়োজন, না হলে তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে না, যত অগণ্য ব্যবসায়ী বা বৃত্তিভোগী তাঁর কাছে আসবেন তাঁদের সকলের কাছে সারবান্ বক্তৃতা দেন, সম্মিলিত পৃষ্ঠপোষকতার উদারতায় নিপুণকর্ম-বিতরণের যৌতুকে তার দলকে একটি সচল প্রতিষ্ঠানে পরিণত রাখেন। অবশ্য জ্যাক্‌সন ও লিঙ্কনের ক্ষেত্রে সেই উদারতা যত প্রচুর ছিল তা এখন আর নেই, তবু রাষ্ট্রপতিই আজো কনিষ্ঠদের জীবিকার বিতরণ ব্যাপারে সর্বেসর্বা। অনেক সজ্জনকে অবশ্য যুক্তিযুক্তভাবেই—এই কথাটা ভাবায় যে রাষ্ট্রপ্রধান কেন রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন। দলীয় অযোগ্যদের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে তাকাবেন, কেনই বা তেমন অযোগ্য কর্মপ্রার্থীকে অনুমোদন করবেন, যে অবিলম্বেই জেল কারাগারে আটক হবে? কিন্তু এটাও ত ঠিক যে যদি তাঁকে কংগ্রেসের মনে আস্থা জন্মাতে হয়, যদি তাঁকে একনিষ্ঠ ও সুসংহতভাবে শাসনযন্ত্র চালাতে হয়? যদি তাঁকে প্রথমে নির্বাচিত এবং পুনর্নির্বাচিত হতে হয় তবে তাঁকে রাজনীতির হাল ধরতেই হবে। নিয়মনিষ্ঠ গণতন্ত্রের কর্ণধারকে প্রথমশ্রেণীর পরিচালক হতে হবে। অধিকাংশ রাষ্ট্রপতিকে এই কথাটি অনুধাবন ও গলাধঃকরণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

আবার তিনিই, একই কালে জনকণ্ঠের প্রতিনিধি, যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের মূল্য প্রণয়ণ কর্তা এবং ব্যাখ্যাতা। একদিকে যেমন তিনি কোন অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, অন্যদিকে আবার তিনিই সবার নৈতিক মুখপাত্র। রাষ্ট্রপতির পদ পরিগ্রহ করার আগে যখন উড্রো উইলসন কল্পনার জাল বুনতেন এমন কি তখনই—এই ভূমিকার সারকথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ঃ

সমস্ত ব্যাপারে তিনিই জাতির বাণীমূর্তি। একবার তিনি দেশের প্রশংসা ও আস্থা অর্জন করুন, তারপর কোন বিরুদ্ধ শক্তির সাধ্য নেই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখবে, কোন সম্মিলিত শক্তি তাঁকে সহজে দমন করতে পারবে না। তাঁর স্থান সমগ্র জাতির কল্পনাকে অধিকার করে রাখে। তিনি শুধু বিশেষ কোন নির্বাচনক্ষেত্রেরই প্রতিনিধি নন, সমগ্র জনমানসের প্রতিনিধি। যখন তিনি তাঁর প্রকৃত ভূমিকায় কিছু বলেন, কোন বিশেষ স্বার্থ নিয়ে তা বলেন না। যদি তিনি সঠিকভাবে জাতীয় চিন্তা উপস্থাপিত করেন এবং তার উপর জোর দেন, তবে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে বিরাজ করেন। যদি এই রকম অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তি রাষ্ট্রপতির থাকে তবে জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের ইতিহাস ব্যেপে অনেক সময় জয়ের মুহূর্ত এসেছে, এসেছে উৎকেন্দ্রিকতা এমন কি, লজ্জার মুহূর্ত, যখন সমবেত বা যৌথ ইচ্ছা (general will) নিজেকে অভ্রান্তভাবে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছে। এই কর্মবিধির তাৎপর্য বুঝতে রাষ্ট্রপতিদের কিছু সময় লেগেছে, কিন্তু যেদিন অ্যাণ্ডোজ্যাকসন দক্ষিণ ক্যারলিনায় লণ্ডভণ্ডকারীদের বিরুদ্ধে বজ্রগর্ভ ভাষণ দিলেন, সেদিন থেকে কোন সফলকাম রাষ্ট্রপতিই তাঁর সময়ের বিরাট কোন ব্যাপারে মুখ বুজে থাকেন নি, জনসাধারণের হয়ে কথা বলেছেন। তাঁরা উইলসনের ভাষায়, "জাতির যথার্থ হৃদয়াবেগ ও লক্ষ্যের মুখপাত্র।"

রেডিও ও তারপর টেলিভিসনের আবির্ভাব রাষ্ট্রপতির কণ্ঠস্বরে অমিত শক্তি অর্পণ করেছে। থিয়োডোর রুজভেল্ট যাকে বলেন "প্রথমশ্রেণীর প্রচারক" ইনি তাই হয়ে উঠেছেন এবং বাড়িতে বাড়িতে এবং দেশে দেশে আমেরিকার নব্যধর্ম প্রচার কর্মে ব্রতী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ষ্টীফ অ্যালেন, এডমুলিভান, বিশপ সীন, এডওয়ার্ড আর মারো এঁরা কেউ অথবা

পুরাবৃত্তময় প্রতীচীর মানুষ যাঁরা তাঁদের তূর্য্য নিনাদে সমস্ত দিক্ মন্দ্রিত করেন, তাঁদের কেউ কখনোই আমেরিকার অগণ্য গৃহে এমন প্রবেশাধিকার পান না। বাস্তবিকই রাষ্ট্রপতি যেন তাঁর এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকে সুচারু-রূপে ব্যবহার করেন। সস্তা পসারি মুখধোবার নানা সামগ্রী ফিরি করার জন্যে লোকের কাছে আবেদন জানায় আবার রাষ্ট্রপতিও সেনেটকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য সময়ে সময়ে জনমতের দ্বারস্থ হন। এই দুই দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রভেদ আছে। তথাপি আমার ভাবতে ভাল লাগে যে রাষ্ট্রপতির এ রকম আবেদন জনসাধারণ অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করেন যদিচ একথাও অনস্বীকার্য্য যে পরাভূত হলেও রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম। কখনো কখনো অবশ্য সবচেয়ে সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন ও উচ্চমনা রাষ্ট্রপতির পক্ষেও যথার্থ লোকমানস জানা সম্ভব নয়, অথবা জানলেও মুখর বিরোধী কণ্ঠকে অস্বীকার করে দৃপ্তকণ্ঠে জানানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতির মুক্তভাষণেরও যে সীমা আছে তার প্রমাণ নাই যখন ১৯৫৯ এ রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার আমেরিকার মোটর গাড়ির আকৃতি ও পরিমাণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নানা বিলাপোক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবু যে রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের আর্জি বুঝতে পারেন। নতুন কল্লোল আসার আগেই তা আঁচ করে নিতে পারেন, যিনি জাতির মুখপাত্র হিসাব উপস্থিত হওয়ার মধ্যে—একটি মাত্রাবোধ আয়ত্ত করে নিতে পারেন, যিনি আলোচনাকে নিজের বক্তব্যের দিকে গুছিয়ে আনতে পারেন এবং যিনি খৃস্টীয় নীতিবোধ ও আমেরিকান ঐতিহ্যকে ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম, তিনি দেশের যে কোন স্বর বা সমবেত কণ্ঠ গর্জন করে থামিয়ে দিতে পারেন। এমন এক সময় ছিল যখন আমরা রাষ্ট্রপতির প্রতিপক্ষের স্বরও শুনতে উৎসুক হতাম যেমন ১৯৫০এ সেনেটর ট্যাফ্ট্-এর, ১৯৫১এ জেনারেল ম্যাক আর্থারের, ১৯৫২এর জুনমাসে 'ইনল্যাণ্ড স্টীলের ক্যারেন্স ব্যাণ্ডালের বক্তব্য। কিন্তু অবশেষে আমরা বুঝতে পারি, সেই প্রতিপক্ষও বুঝতে পারেন যে, এ যুদ্ধ আর্মাগেডনে অনুষ্ঠিত সেই যুদ্ধ নয়, বরং এ হলো প্রবলভাবে অসমান দুই পক্ষের মধ্যে নিরর্থক খণ্ডযুদ্ধ এবং যদি আমরা ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারীতে তাঁর গণতান্ত্রিক সদস্যদের উদ্দেশ্য করে সেনেটর জনসনের ভাষণের মর্মার্থ বুঝে থাকি, তবে বলবো যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্দেশীয়

অবস্থা নিয়ে দুটো বক্তৃতা (State of the Union message) চলবে না।

রাষ্ট্রপতি হলেন আমেরিকার মানুষের ঘোষকবাদ্য সঠিক ও স্পষ্ট সুরে তাদের মনের কথাটি ঘোষণা করবেন তিনি, এই তাঁর মহত্তম কাজ। ১৯৪৫এ উইনষ্টন চার্চিলকে এট্‌লি বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিক মুহূর্তে কথাই ঘটনা হয়ে ওঠে।' ১৯৪০ ও ১৯৪১ চার্চিল কথা দিয়ে যে ইতিহাস স্থাপন করেছিলেন সমর্থ ও কল্পনা শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রপতির পক্ষে তা করা সম্ভব। ১৯৩৩এর সব ঘটনাই হয়তো ভুলে যাবো তখনও রুজভেল্টের এই কথাটি ভুলতে পারবো না যে আমাদের একমাত্র ভয়াবহ হলো ভয়।'

১৮৯০ এর 'টুন রে লেগ্‌ল' নামক স্মরণীয় মামলাটি আজও তাঁদের চিত্তাকর্ষণ করবে যাঁরা তাঁদের প্রথানিবদ্ধ আইনের মধ্যে অতিনাটকীয়তার আমেজ খোঁজে না। এই বিখ্যাত বিচারে জাষ্টিস স্যামুয়েল মিলার যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও শৃঙ্খলার বোধ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে জাতীয় উন্নতি ও গৃহশান্তি মানুষের হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা বিপন্ন হয়ে আবার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সুখাবহ পরিস্থিতি রচনা করে। শাসনতন্ত্র থেকে তিনি যে অনুশাসন গ্রহণ করেন তা কজনেরই বা জানা; কিন্তু শান্তির সংরক্ষক হিসাবে যে অধিকার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছ থেকে অর্জন করেন তা অদ্ব্যর্থ। প্রতি বছরই এখন আপৎকালীন সংকট ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে উঠেছে। এমন সপ্তাহ এখন আর কাটে না যখন রাষ্ট্রপতিকে জনসংখ্যার এক অংশের জন্য, বা কোন সহরের অথবা কোন গোষ্ঠী বা হঠাৎ প্রতিকূলতায় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে এ রকম বাণিজ্য সংস্থার অনুকূলে কোন না কোন দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না হয়। সাধারণত অঙ্গরাষ্ট্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষই সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাগুলির প্রতিবিধান করে। কিন্তু ডেট্রয়টে যদি কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে যদি নিউ ইংল্যাণ্ডে বন্যা আসে, যদি সিনেটরিতে ওঠে ঘূর্ণিবাত্যা, কিম্বা শিকাগোয় ঘটে রেলদুর্ঘটনা তবে জনগণ হোয়াইট হাউসের অধিবাসীদের কাছেই সাহায্য ও আরাম প্রার্থনা করে এবং সত্যই তো রাষ্ট্রপতি পারেন সেই সাহায্য করতে। কোন আকস্মিক বিপর্যয়কালে তিনি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কোন মানুষই সেনাবাহিনী, বিশেষজ্ঞ, খাদ্য, অর্থ, ঋণ উপকরণ, ওষুধপত্র ও নৈতিক সহানুভূতি দিয়ে আর্তত্রাণে অবতীর্ণ হতে পারেন না।

যদি সহস্র বন্যার্ত মিশৌরি বা ওহায়ো উপত্যকায় কষ্ট পায় তিনি সীমান্তরক্ষীদের বলবেন সাহায্য তরী নিয়ে গিয়ে দ্রুত প্রহরা দিতে, এমন কি নিজেই তিনি গিয়ে গৃহহীনদের বলভরসা দেবেন। যদি তুষারকীর্ণ পশ্চিমীভূমিতে গৃহপালিত পশুদের খাবার না জুটে থাকে রাষ্ট্রপতি এয়ারফোর্সকে আদেশ করবেন খড় বহন করে নিয়ে যেতে। রোড আইল্যাণ্ডস্ আর ম্যাসাচুসেট্সের চাষীরা সেপ্টেম্বরের ঝটিকায় কষ্ট পেলে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সব এলাকাকে বিপর্যস্ত এলাকা বলে চিহ্নিত করবেন এবং কৃষিসংস্কার পরিচালককে নির্দেশ দেবেন উদ্বৃত্ত খাদ্য সরবরাহ করতে এবং সহজ সর্তে আপৎকালীন কর্জ দিতে। মেইন যদি দাবাগ্নিতে উপদ্রুত হয়, যদি টেক্সাস অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক হয়ে যায়, লিট্‌লরক মানুষের রক্ত ও শিশুর কান্নায় ভরে যায়—সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি সুস্থ জীবনাবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য নেতৃত্ব স্বীকার করতে অগ্রণী।

কিংবা যদি ১৯৩৩ এর মার্চ মাসের অবস্থা আবার ফিরে আসে, যদি আর্থিক দুর্গতিতে আবার আমরা জড়িয়ে পড়ি তবে রাষ্ট্রপতি সেই দুইটি নববিধান প্রয়োগ করবেন যা শুধু বইএর পাতায় সুপ্ত হয়ে রয়েছে। যথাক্রমে সেই দুইটি আইন এখানে প্রদত্ত হলো—

১৯৩৩ এর জরুরি ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিধানের চতুর্থ পর্য্যায় :

জাতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কার্য্যবিধি আরও সার্থক ও নিরাপদ করে তুলবার জন্য……এই রকম জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ঘোষণা-ক্রমে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন সদস্য ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সেটুকুই আদান প্রদান চালাতে পারবেন যা কোষাধ্যক্ষের বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত।

১৯৩৪এর বিনিময় নিরাপত্তা বিধির উনবিংশ সংখ্যক শাখা (২)

কার্য্যসমিতিকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে…তা জনস্বার্থে বিনিময় নিরাপত্তা বিধি অনুযায়ী যে কোন বাণিজ্যিক আদান প্রদান দশদিনের জন্য স্থগিত রাখতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তার সূত্রে কার্য্যসমিতি নব্বই দিনের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু তা রাষ্ট্রপতির অনুমতি-সাপেক্ষ।

যদি উপরি উক্ত দুটি আইনের সরল মর্মার্থ করি তবে স্বীকার করতে হয় যে ঐ দুইটি আইন ক্রমে রাষ্ট্রপতি ১৯৩৩এর মার্চের মত কোন ভবিষ্যৎ আর্থিক সংকটে চূড়ান্ত অর্থসংক্রান্ত আইন ঘোষণা করবার অধিকারী। একই

সময়ে শাসনতন্ত্র সম্মত উপায়ে কিম্বা শাসনতন্ত্রকে ছাপিয়ে আণবিক আক্রমণের মুহূর্তে তিনি সারাদেশে চূড়ান্ত বিধান জারি করতে পারেন। বস্তুতঃ ভবিষ্যতের জন্য এটা উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৫এ হাইড্রোজেন বোমার আপাত-বর্ষণে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার ঠিক এই করতে চেয়েছিলেন। আণবিক যুদ্ধের জন্য আমাদের তিনদিন ব্যাপী প্রস্তুতির মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর সহকর্মীরা এটা উদ্ঘাটন করে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন যে—"রাষ্ট্রপতি-পদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা" (যে বিষয়ে প্রজাতন্ত্রীরা সাধারণতঃ অস্বস্তিকর রূপে নীরব হয়ে থাকেন) যুদ্ধান্ত বিপর্য্যয়ে জাতির অন্যতম পবিত্র মানসিক আশ্রয়স্থলে পরিণত হবে। এই ঘটনা অর্থাৎ শান্তির রক্ষাকর্তা হিসাবে তাঁর মহিমান্বিত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সিনেটরগণ স্বরাষ্ট্র রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নিজদায়িত্ব পরিগ্রহ করতে বলেছিলেন এবং সেই কাজ তিনি বাজেট ও আমাদের অপরাপর প্রত্যাশার সীমার মধ্য থেকেই সাধন করেছিলেন।

মার্কিন জীবনের অন্ততঃ একটি দিক্ এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র যেখানে এ দেশের মানুষেরা কোন আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটতে দিতে প্রস্তুত নয়। তারা এখন এই চায় যে রাষ্ট্রপতির প্রত্যেক নেতৃত্বে শাসনসংক্রান্ত বিভাগ যেন এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিপর্য্যয় বা সন্ত্রাস পরিহার করে চলে, না হলে তুমুল বিশৃঙ্খলা বাধবে। ফলতঃ রাষ্ট্রপতির একটি নতুন ক্ষমতা এখানে আকার গ্রহণ করছে। সে হলো সচ্ছলতার তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা।

এই ক্ষমতার উৎপত্তি সম্বন্ধে নির্ভুল সংবাদ দেওয়া সম্ভব। ১৯৪৬এর বৃত্তিনিয়োগ সংক্রান্ত আইনে সচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্বের উল্লেখ আছে :

দ্বিতীয় শাখা :—কংগ্রেস এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর এই দায়িত্ব রইল যে জাতীয় কার্য্যক্রম রূপায়িত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী যাবতীয় সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করবে; যন্ত্রশিল্প, কৃষি, শ্রম, অঙ্গরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার যেন তার সমস্ত শক্তি ও পরিকল্পনা নিয়ে ধনতান্ত্রিক কাঠামো অব্যাহত রাখে, জনকল্যাণমূলক কার্য্যে ব্রতী হয়, বৈতনিক বৃত্তি গ্রহণের ও স্বোপার্জনের পরিবেশ যথাযথরূপে সৃষ্টি করা, অধিক সংখ্যায় উপজীবির সংস্থান করা, উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত।

এই বিধানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি শাখায় রাষ্ট্রপতিকে বিশেষভাবে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেন তিনি "ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক বুনিয়াদ এর উন্নতিবিধান করেন, অর্থনীতিক অব্যবস্থা ও তার কুফল এড়াবার জন্যে সচেষ্ট হন, কর্মনিয়োগ, উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখেন।" এ সব কাজে তাঁকে উপদেশ দেন একটি অর্থনীতিক উপদেষ্টা সমিতি। অর্থনীতিক বিবরণীও আনুষঙ্গিক ব্যাপার সম্বন্ধে খসড়া করতে রাষ্ট্রপতিই অনুরুদ্ধ হন, দ্বিতীয় শাখার বিধানাবলী অনুযায়ী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তাঁর নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি এগিয়ে যাবেন এটাই প্রত্যাশা করা হয়। কংগ্রেসের যৌথ মানসে এ সম্পর্কে আদৌ কোনো সন্দেহ নেই যে মা-মুরগীর মতো আমাদের সমস্ত ঝাঁপির ডিমগুলিকে আগলে রাখা রাষ্ট্রপতিরই কর্তব্য। আমরা আমেরিকার অধিবাসীরা রাষ্ট্রপতিকে দেশের উন্নতি হলে সাধুবাদ জানাই এবং দুঃসময়ের জন্য তাকেই দায়ী করি—এক এক বিচিত্র ব্যাপার নয়?

যদি এই বৃত্তিমূলক আইন বা Employment Act গৃহীত নাও হতো, এ কর্তব্য তিনি ঠিকই করে যেতেন। আমরা ১৯২৯ থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে কতোগুলি স্থায়িত্বমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ পরিষৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য দায়ী পরিশাখা এবং অসংখ্য সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত কর্মচারী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বিভিন্ন নির্দেশ সব সময়েই গ্রহণ করেন। হোয়াইট হাউসের সম্ভাব্য নির্দেশনার কিছু কূটনৈতিক ও বাস্তব সীমা আছে কিন্তু একজন প্রাণবন্ত রাষ্ট্রপতি কোনো নির্জীব বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের অথবা শোচনীয়ভাবে অভাবগ্রস্ত নাগরিকদের ডেকে নিশ্চয়ই তার উপদেশ গ্রহণ করতে বলতে পারেন। যদিচ তাঁরা আসেন রাষ্ট্রপতির উপদেশপ্রার্থীরূপে নয়—সুবিন্যস্ত কোনো সরকারী চুক্তি, ব্যাঙ্কসংক্রান্ত কোন জটিলতার নিরসন অথবা কংগ্রেসের কাছ থেকে কোন নাটকীয় অনুমোদনের জন্যই তাঁরা এসে থাকেন। সৌভাগ্যবশতঃ সমগ্র অর্থনীতির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে তিনি বিশেষ কটুভাষী বক্তাদের কাছ থেকেও এই বলে রেহাই পেতে পারেন যে তাঁদের স্বপক্ষে কিছু করার আগে তাঁকে সব দিক্ বিবেচনা করে দেখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি আর্থিক সচ্ছলতার বিধায়ক, এই ব্যাপারটি বিশেষ ক'রে যারা স্বনির্ভর অর্থনীতির আত্মসংস্কারের জীর্ণ সাবেক মতে বিশ্বাসী তাদের কাছে একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতা হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এখন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভূমিকাটিকে সমর্থন জানায়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মন্দার বাজারে আইজেন হাওয়ারের স্মরণীয় সেই কৃতিত্ব অথবা ১৯৫৮-৫৯ এর সংকটকালে তাঁর অনন্য কৃতিত্বের কথা মনে করলেই আমরা বুঝতে পারি এই নতুন ধরণের শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কতো কেন্দ্রীয়। সরকারের এই নবলব্ধ দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি নিজে কতো সচেতন ছিলেন তাঁর ১৯৫৩ এ কংগ্রেসে প্রদত্ত অর্থনীতিক বিবরণী সংক্রান্ত ভাষণ পড়লেই আমরা বুঝতে পারি।

আধুনিক জীবনের চাহিদা ও বিশ্বের অস্থিতাবস্থার ফলে শাসনযন্ত্র আগেকার শান্ত সমাহত সময়ের তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে·········এখন সরকার কর্মনিয়োগ ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার জন্য এবং সশ্রুতরূপে স্থায়ী মূল্যমান্ প্রবর্তন করার জন্যে অবশ্যই সবশক্তি প্রয়োগ করবে। তার অসংখ্য কর্তব্যকর্মের মধ্যেও অর্থনৈতিক বিবর্তনের দিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, প্রতিরোধক এবং সংশোধক দু'রকম কাজের জন্যেই সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে, নতুন উদ্ভূত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। এ দায়িত্বের বিরাম নেই, এ নিরবচ্ছিন্ন। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অটুট্ রাখবার জন্যে সরকারের আয়ত্তাধীনে নানা প্রতিষেধক অবশ্য থাকা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যবস্থার সঞ্চয় সংরক্ষণ, ট্রেজারির ঋণদান সংক্রান্ত কার্য্যধারা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ইনস্যুরেন্স বহ মটগেজের ওঠানামার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, বাজেট চালনে স্বাধীনতা, কৃষি সাহায্য, করব্যবস্থার, অদলবদল ও লোককল্যাণমূলক কর্ম— প্রয়োজনবোধে এই সব কিছুই ব্যবহার ক'রবো আমরা। রাষ্ট্রপতির শেষ ভূমিকাটির সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হলে আমাদের প্রথমে রাষ্ট্রপতিকে মুখ্য কূটনৈতিক সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দেখতে হবে এবং তারপর বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে তাঁর স্থান নির্দেশ করতে হবে. সেখানে রাষ্ট্রপতি বৃহত্তর জনমণ্ডলীর সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হন। তার কারণ আধুনিক রাষ্ট্রপতি বিশ্বনেতার দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমাদের ঘরের ও দূরের বন্ধুরা এটা পছন্দ করুন বা নাই করুন। মার্কিন

নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়েও বৃহত্তর নির্বাচন ক্ষেত্রের উপর রাষ্ট্রপতির আধিপত্য বিস্তৃত ; আমাদের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে উচ্চারিত তাঁর বাক্য, ও তাঁর আচরিত কর্ম শত শত বৈদেশিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণে প্রভূত সহায়তা করে।

কেন তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ফরাসি রাষ্ট্রপতি অথবা ক্ষুদ্রতর দেশগুলির শীর্ষস্থানীয় পুরুষদের চেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব বিস্তার করেছেন, তা বোধ হয় বিশদ্ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। যাদের সঙ্গে আমরা ঐক্যচুক্তিতে আবদ্ধ তাদের সবার চেয়ে আমরা শক্তিমান্, তাদের বিরুদ্ধে সজ্জিত শত্রু-শক্তির মারাত্মক প্রতিপক্ষ হিসাবেও আমরা অমোঘ, কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত তথ্যপঞ্জী থেকেই আমরা বুঝতে পারি রাষ্ট্রপতিত্বের শক্তি ও সম্মান পৃথিবীর অন্য সমস্ত পদাধিকারের চেয়ে কতো বেশী প্রবল। যে ব্যক্তি এই পদ অলঙ্কৃত করেন, তিনিই পদাধিকার বলে যে কোন আলোচনা চক্রে মুখ্য স্থান গ্রহণ করেন। আমাদের সংবিধানে একজন অতি মেধাবী ছাত্র বয়স্থ, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ উইনস্টন চার্চিল একসময়ে নির্ভুল-ভাবে এই সত্য উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে যদিও তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ—তবু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ব'লে আইজেন হাওয়ারই ১৯৫৩ সালের বারিমুডায় তিন প্রধানের সম্মেলনে প্রধান আসন অলঙ্কৃত করবেন। কোনো বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভুলতে পারেন না যে যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বোচ্চস্থানীয় পুরুষ যাঁর মধ্যে রাজা ও প্রধান-মন্ত্রীর ক্ষমতার সমাহার ঘটেছে। এই ভূমিকা গত এক দশকের আগে সঞ্জাত হয় নি। যদিও ১৯১৮-র শেষ দিকে এবং ১৯১৯-এর গোড়ার দিকের কয়েক মাসে এর একটি সংক্ষিপ্ত মহড়া দেখা গিয়েছিল। আগামী উদ্বেগাপন্ন বছর-গুলিতে এই ক্ষমতা ক্রমবর্দ্ধমান হবে কিনা তা নির্ভর করছে এই সময়ে সংকট কত তীব্র হয় তার উপর। এটা মনে হয় যাদের স্বাধীনতার অনুকূলে আমরা দাঁড়িয়েছি রাষ্ট্রপতি অতি সচেতনভাবে তাদের পক্ষে ও তাদের হয়ে কথা বলবেন ও কাজ করবেন যেমন ১৯৫০ সালে জুনমাসে উত্তর কোরিয়ার আক্রমণের প্রতিবাদে ট্রুমান রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যেমন ১৯৫৩ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে আণবিক শক্তিসংস্থা স্থাপনের প্রস্তাবের অনুকূলে ভাষণ দিয়েছিলেন আইজেন হাওয়ার, যেমন কথা ও কাজের দৃঢ়তার

মধ্য দিয়ে আইজেন হাওয়ার ১৯৫৯ সালের বার্লিন সংকটের নিরসন করেছিলেন। যদি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে সেই স্বায়ুক্ষয়ী বছরের প্রথমভাগে অতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় বলে মনে হয়ে থাকে তবে তার কারণ আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কর্মোদ্যোগহীনতা—রাষ্ট্রপতিত্বের হীনম্মন্যতা নয়। যিনিই আমাদের উক্ত পদ অলঙ্কৃত করুন না কেন বছর বছর বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রভাব বাড়তেই থাকবে। অনাগত বেশ কিছুদিনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিই হবেন বিশ্বরাষ্ট্রপতি :

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষিত অংশগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে সুসংবদ্ধ করে দেখা যেতে পারে। আসলে এই সুসংবদ্ধ চিত্র দ্বারাই রাষ্ট্রপতি পদের যাথার্থ্য অনুধাবনযোগ্য। আমি আশা ক'রব এই রাজনীতিক চরিত্রচিত্রণে রাষ্ট্রপতিত্বের মূল কথাটি অনুদ্ঘাটিত থাকবে না—সেটা হ'ল এই যে রাষ্ট্রপতিত্ব একটি অন্য নিরপেক্ষ বৃত্তি যার অনুসরণ করেন এক একাকী পুরুষ। আমার নিজেকে যেন পুষ্টিপাক খাদ্য বিজ্ঞানের এমন কোনো অধ্যাপক বলে মনে হয় যিনি চমৎকার স্ট্যু'র উপাদানগুলির সবেমাত্র নির্ধারণ ক'রেছেন। যে সব রসবোদ্ধা উপস্থিত তাঁদের মনে কিন্তু সামান্যতম ধারণাও নেই—কি রকম এর আস্বাদ হবে। রাষ্ট্রপতিত্ব ও সেই চমৎকার স্ট্যু যার গন্ধের আমেজটুকু শুধুমাত্র উপকরণের তালিকা দ্বারা বোঝা যাবে না।

এ এমন একটি সম্পূর্ণতা যা অংশগুলির যোগফলের চেয়েও স্বতন্ত্র ও অধিক, এমন একটি বৃত্তি যা তার সমস্ত ক্ষমতার আঙ্গিক যোগফলের চেয়েও কিছু বেশী। রাষ্ট্রপতি দিনের এক অংশে একরকম আর অপর অংশে আরেক রকম নন—তিনি নিশ্চয়ই সকালে শাসক, মধ্যাহ্নভোজনকালে সংবিধান রচয়িতা, সায়াহ্নে রাজা, নৈশ আহারের পূর্বে অধিনায়ক এবং ক্লান্ত মুহূর্তে রাজনীতিবিদ্ নন। তিনি সকল সময়েই এই সব কিছু—তাঁর এক ক্ষমতা অপর ক্ষমতার উপকরণ যোগায়। তিনি মহৎ রাষ্ট্রপ্রধান কারণ জনতার ভাষা তাঁর মধ্যেই সার্থকতার বাঙ্ময়, তিনি শক্তিশালী প্রধান কূটনীতিজ্ঞ কেন না সশস্ত্র সৈন্যশক্তি তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি সার্থক আইন প্রণেতা কারণ রাজনীতি ও প্রথা তাঁকে রাজনৈতিক দলের প্রধানরূপে স্বীকার করে নিয়েছে, আবার প্রধান কার্য্যনির্বাহক বলে তিনিই সুখশান্তি সচ্ছলতার সুনিপুণ বিধায়ক।

তাঁকে একই সময়ে এই এতগুলি কাজ সম্পাদন করতে হয় এবং ফলতঃ কখনো কখনো তাঁর এক কাজের সঙ্গে আর এক কাজের সংঘাত বাধে। জনসাধারণের মুখপাত্র ও দলনেতা—এই দুটি ভূমিকায় যে সমপরিমাণ উৎসাহে অবতীর্ণ হওয়া যায় না ট্রুম্যানের একাধিক দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ, যদিও দৃষ্টান্তগুলো ভুলে যাওয়াই ভালো। আবার কূটনীতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলনেতার ভূমিকা পরিগ্রহ করলে (যেমন ১৯৪৮ এর প্যালেস্টাইন বিপর্যায় কালে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন) আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আবর্তের সৃষ্টি হতে পারে। আইজেন হাওয়ার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এক এক সময় যতোটা প্রভাব বিস্তার করেছেন ততোটা শাসন করেন নি, এমন বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রপতির নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা প্রধান কার্য্যনির্বাহক হিসাবে সাফল্যলাভ করার জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস পেয়েছেন। গত একশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে এর নজির ক্লিভল্যাণ্ড ট্যাক্ট এবং হুভার।

এই বৃত্তির এই আপাত বিরোধিতার কোন সরল সহজ সমাধান নেই। যদি রাষ্ট্রপতিত্ব দশটি সুরসঙ্গীতের একটি ঐক্যতান হয়ে থাকে ও রাষ্ট্রপতি যদি তার একক সাধক হন তবে তাঁকেই আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কি করে সার্থক সুর সৃষ্টি করতে হয় তা শিখতে হবে। যদিও তাঁকে সেই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ত্রুটিবিহীন ঐক্যতান সম্ভব নয়; হুইটম্যানের সেই বিদগ্ধ উক্তি "আমার স্বকীয়তা থেকে যা শ্রেষ্ঠতর, আমার তাতে দরকার নেই" স্মরণে রাখলে তিনি উপকৃত হবেন। রাষ্ট্রপতিত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি নিশ্চিতভাবেই জেনে যাবেন যে এই ভূমিকার কিছু অংশের উপর জোর দিলে চলবে না, তাহলে অন্য অংশগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দলনেতা ও প্রধান কার্য্যনির্বাহকের ভূমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই দশটি ভূমিকার ভার প্রচণ্ড। তবু শাসনযন্ত্রের অংশপ্রত্যংশগুলি এমন ভাবে সুবিন্যস্ত যে তাঁর দৈনন্দিন কার্য্যধারা সুঠাম করার জন্যে বিবিধ ব্যবস্থা রয়েছে এবং সহস্রজন তাঁর আদেশে জলে স্থলে অবিশ্রাম কর্মরত বলে তিনি এই সব কাজ ভালোভাবেই সম্পাদন করতে পারেন।

তবু শাসনসংক্রান্ত বিভাগ ও ক্যাবিনেটের সহায়কগণ প্রধানতঃ আনুষঙ্গিক এবং সহায়কমাত্র—তাঁদের সবার উর্ধ্বে যিনি সেই রাষ্ট্রপতিই

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করবো যে গত পঁচিশ বছরে রাষ্ট্রপতিত্ব একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এর সম্বন্ধে কোন আলোচনাই সার্থক নয় যদি এর চারপাশের লোকদের কার্য্যাবলীর সম্যক্ বিশ্লেষণ না হয়। যদি বাজেটে ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের কাছে এটি সহস্র মানুষের কর্মক্ষেত্র হিসাব বিধৃত। —এই সত্যটি আরো চমকপ্রদরূপে অনুভব করেছিলাম যখন ১৯৫৫ সেপ্টেম্বরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যেহেতু এই বৃত্তি একই মানুষের সাধ্য কর্ম, যাঁর উপরে এই ভার ন্যস্ত তিনি এর প্রতিটি খুটিনাটি ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত না নিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেন না, কেননা এগুলির জন্য তিনি সংবিধান ও মার্কিণ মানুষের কাছে দায়ী।

শোনা যায়, টু্ম্যান তাঁর ডেস্কে একটি সংকেত লিখে রেখেছিলেন, "এক অস্থির আমেরিকান এখানে এসে সংযত।" শেষ পর্য্যন্ত এই হলো রাষ্ট্রপতিত্বের মূল কথা। সারা দেশে এই হলো এমন একটি বৃত্তি যার অধিকারী মাত্রাচ্যুত হলে চলবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রপতিত্বের সীমা

আমেরিকার এই সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতিত্ব বিশ্বপ্রশংসিত প্রতিষ্ঠান নয়। অনেকেই ভাবেন যে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের এ একটি পছন্দসই বিবর্তন কিন্তু দেশে অনেক দক্ষিণপন্থী আছেন যাঁরা এর বিপক্ষে এবং বিদেশে পার্লামেন্টিয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এর প্রতি বীতরাগ। যদিও প্রথমোক্তদের মতামত সাধারণতঃ রাজনীতির সঙ্গে মিশ্রিত বলে গভীর মনোযোগের দাবী রাখে না, শেষোক্তদের মতামত অনুধাবন ও প্রত্যুত্তরযোগ্য। রাষ্ট্রপতিত্বের বিরুদ্ধে তাদের কয়দফা অভিযোগ নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

(১) রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসশাসনতন্ত্রের কাছ থেকে স্বতন্ত্র ক্ষমতা পেয়েছে। তার ফলে একে অপরের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরুদ্ধতা এখানে একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে এবং ইচ্ছাতেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক হয় রাষ্ট্রপতিকে পরাভব স্বীকার করতে হবে যার ফলে অনিবার্য্যভাবেই সরকার নেতৃত্ব বিহীন হয়ে পড়বে অথবা তাঁকে রুখে দাঁড়াতে হবে যার ফলে সরকারী অনুশাসনে তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে।

(২) শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সীমায়িত সময় ও আইনসভা নিরপেক্ষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর সাধারণ শাসনের জন্যে প্রতিনিয়ত জবাবদিহি করতে হয় না, এমন কি বিশেষ কোন কাজ বা

অনুসৃত বিশেষ কোনো পদ্ধতির জন্যও তাঁকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। আইনসভা কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় (পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা) যেমন সরকারি মুখ্য কর্তাকে সব সময়েই প্রতিটি ব্যাপারের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত থাকতে হয়, রাষ্ট্রপতিকে কখনোও তা করতে হয় না।

(৩) রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজেদের শাসনতন্ত্র লিপিবদ্ধ করার সময় সুইস্‌রা ঠিকই বলেছিল যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্ব স্বৈরতন্ত্রের প্রস্তুতিভূমি।

ফ্লোরিডার দক্ষিণে ও টেক্সাসে রাষ্ট্রপতিত্বের যে দুঃখাবহ রূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল তার ফলে আমেরিকানদের এই প্রতীতি জন্মেছিল যে রাষ্ট্রপতির নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সীমিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

আমেরিকার মানুষ এই তিন দফা অভিযোগ এভাবে খণ্ডন করবে: এক, এ সমস্ত সমালোচনা তার মূল কার্য্যাবলীর ক্যারিকেচার মাত্র। দুই, রাষ্ট্রপতিকে ব্যাপকভাবে যে শাসনতান্ত্রিক নীতিবোধ দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় তার কথা তাঁরা ভুলে গেছেন। তিন, এবম্বিধ সমালোচনায় যে ইতিহাস অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তা রাষ্ট্রপতিত্বের সাফল্য সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেক না করে—আমাদের বরং কৌতুকের খোরাক জোগায়। আরো বিশদ্ করে বললে, এই দাঁড়ায় যে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষরা এ ভাবেই রাষ্ট্রপতিত্বের পরিকল্পনা করে গিয়েছেন; তাঁরা মাত্রাতিরিক্ত দক্ষতার চেয়ে মোটামুটি নিরাপত্তার উপর জোর দিয়ে গেছেন এবং তাঁদের উত্তরপুরুষেরা আজ একথা বুঝতে পারছে যে আইন প্রণয়ন বিভাগকে, আইন প্রয়োগ বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতেই বিরাট একটি কাজ করে গিয়েছেন। এই মহাদেশে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার ফলে যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব পরিলক্ষিত, যে স্থূলতার ও অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত বিকাশ আমাদের পীড়া দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে এই অমিত শক্তিশালী গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিত্বের বিকল্প হিসাবে আইনসভা কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুসরণ যথার্থই বাঞ্ছনীয় কিনা সন্দেহের বিষয়। এ এমন একটি সমস্যা যা আমাদের দেশের সংবেদনশীল অধিবাসী এবং দূরাগত সমালোচকদের ভালো করে বিচার করা উচিত।

দ্বিতীয় অভিযোগটি অবশ্য এত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আমরা খারিজ করছি না। রুজভেল্টকে Court banking পরিকল্পনার জন্য ট্রুম্যানকে ১৯৪৬এর রেল ধর্মঘটীদের বিষয়ে সম্ভাব্য খসড়ার জন্য, আইজেন হাওয়ারকে Salk Polio vaccine উপলক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী করলে অন্যায় হবে না। আমরা এই দুই মহতী পদ্ধতির ভালোর সমন্বয় ঘটাতে পারি না। স্বাধীন রাষ্ট্রপতিত্বের কাছ থেকে যে অগণ্য সুযোগ সুবিধা আমরা পাই তার মূল্য হিসাবে রাষ্ট্রপতির এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে নেওয়া ভালো। তাছাড়া আমরা আগেভাগেই কি করে বুঝব কেমন কার্য্যনির্বাহক আমরা পাব যদি আমরা পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির দায়িত্বশীলতার স্বপক্ষেই রায় দেই: বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী অবশ্য একজন স্বাধীন কার্য্যনির্বাহকের পূর্ণক্ষমতা ভোগ করেন, কিন্তু ফরাসী প্রধান মন্ত্রী কি প্রতিপদক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হন না?

শেষ সমালোচনাটি এই যে রাষ্ট্রপতি অত্যধিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। এর উত্তরে শুধু আমেরিকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের দিকে উক্ত সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্ব যে জটিলতার সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, আমেরিকায় তা কখনোই স্বেচ্ছাচারিতার প্রস্তুতিভূমি হয় নি। এই ভবিষ্যৎবাণী করতে ভয়ানক সাহসের দরকার হয় না। খুব অন্ধ বিশ্বাসের কথাও এটা নয় যে আগামী দীর্ঘকালের মধ্যে সে সম্ভাবনা নেই। আমাদের আত্মবিকাশের অপরাপর ক্ষেত্রের মতো রাষ্ট্রপতিত্বও ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জনস্বার্থের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করে এবং রাষ্ট্রপতি যখন আমেরিকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লক্ষ্য ও উপলক্ষের সমন্বয় ঘটান তখন তিনি সার্থককাম হয়ে থাকেন। যদি আমি বলি যে আমেরিকায় স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তবে হয়তো উত্তর পাবো যে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু এক ব্যাটিস্টা (Batista) বা পেরণের (Peron) জন্ম আমেরিকায় সম্ভব নয় এর একমাত্র প্রমাণ হিসাবে আমেরিকার জনমত ও পরিবেশের উল্লেখ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে তার নিজের স্বপক্ষে এবং আমেরিকার মানুষের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদের এই জোরালো যুক্তি আছে যে গত ১৭০ বছরে আমরা ৩৩ জন রাষ্ট্রপতি পেয়েছি, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোন স্বেচ্ছাচারী বা কোন দুশ্চরিত্র বা মারাত্মক ধরণের মানুষ এই পদ অধিকার করে নি

'আমার মতে আরণ বার ছাড়া (Aaron Burr) কোন স্বেচ্ছাচারী বা দুশ্চরিত্র কখনো কোন ভাল জাত সৃষ্টি করে নি। এমন কি রাষ্ট্রপতিত্ব ঐ 'ক্ষয়িত আত্মাকে' ও যথেষ্ট নম্র করে তুলতে পারতো। তখন এবং এখনও এ হ'লো সব কিছুর মতোই বিশেষভাবে আমেরিকান। আমি আশা করি এই সহজ ঐতিহাসিক ও সমাজতান্ত্রিক সত্য আমাকে সবিস্তারে প্রমাণ করতে হবে না যে এই বৃত্তি কোন প্রতিবিপ্লবের জন্ম দিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতিত্বের অবৈধ রূপান্তর বা তজ্জনিত রাজনৈতিক অবস্থান্তরের কথা ভেবে বিনিদ্র রজনী যাপন করার প্রয়োজন নেই সত্য তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এই শক্তির অপব্যবহার হওয়া সম্ভব এবং তা আমাদের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণও ঘটে। ইচ্ছা করলেই রাষ্ট্রপতি আমেরিকার গণতন্ত্রের আদর্শ ও পদ্ধতি সমূহ, চিরতরে না হলেও গভীরভাবে বিধ্বস্ত করতে পারেন। যে ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করা যায় তার অপব্যবহারের সুযোগ আছে। যাঁর ভিতরে এত অপরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত, তিনি যতই সৎ ও দেশপ্রেমিক হোন না কেন, এই শক্তির মাত্রাতিরিক্ত অপপ্রয়োগ তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানগত—শালীনতার পথে রাখবার জন্যে যে বিবিধ রক্ষাকবচ আছে সেগুলো আমরা সচেতনভাবে বিবেচনা করে দেখব। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধেই আলোচনা বেশীর ভাগ লোক করেন, আমি ত এতক্ষণ করেছি, তাঁরা যা করেন না এবার আমি তাই করবো—রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমার উপর আলোক সম্পাত। ন্যায্যভাবে এবং সংবিধান সম্মত উপায়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও তাঁর উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ সমন্বিত হয়ে রয়েছে। তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম কিন্তু সংবিধান নির্দ্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তা যদি না আসে তবে তা ফলপ্রসূ হবে না।

এই সব বিধিনিষেধের সূত্র নিহিত আছে লিখিত এবং অলিখিত আইনের মধ্যে, অর্থাৎ সংবিধানে। একটি ভাল সংবিধানের মতো এ কয়েকটি কথায় ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে রাষ্ট্রপতিকে (যাঁর জন্যে আমরা সেই প্রায়-খঞ্জ মানুষটি যিনি এই বিধানগুলোকে মসৃণ রূপ দিয়েছেন তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ) এবং তারপর অনুরূপ স্বল্পভাষিতার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করেছে। সমস্ত সংবিধান জুড়ে এই সব বিধি-নিষেধ ছড়িয়ে আছে। নির্দিষ্টরূপে চার বছরের মেয়াদ, ভেটোপ্রদানের সীমা—এ সবের কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট।

তাছাড়া এও স্মরণযোগ্য যে সংবিধানস্রষ্টাদের আরোপিত বিধিনিষেধ নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি নি, যার প্রমাণ রয়েছে বাইশ সংখ্যক সংশোধনীতে (22nd amendment) তৃতীয় বার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হবার ইচ্ছার উপর ধার্য সরাসরি নিষেধাজ্ঞার। হয়তো এ সব বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের চেয়েও উল্লেখযোগ্য সেই সব বিভাগের উপর সংবিধান অর্পিত ক্ষমতা যার উপর রাষ্ট্রপতির কোন ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতির উপর নিষেধাজ্ঞার চূড়ান্ত উদাহরণ হ'লো সংবিধানের এক এবং তৃতীয় ধারা (Article)।

কংগ্রেসের নিয়মাবলীও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিধিনিষেধে ভরা। উদাহরণতঃ কংগ্রেস দাবি করে যে রাষ্ট্রপতি বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক বা আরো সংক্ষিপ্ত ব্যবধানের মধ্যে তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণী দাখিল করুন। নতুবা কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে কিছুতেই রাজী হয় না। দ্বিতীয়তঃ টাকাপয়সা কংগ্রেস এমনভাবে মঞ্জুর করে যে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর উপদেষ্টাদের কংগ্রেস নির্দিষ্ট বিশদ সীমার মধ্যেই কাজ করতে হয়, স্বাধীনভাবে খরচ করার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। তৃতীয়তঃ নিয়োগের ব্যাপারে নাগরিকতা, আনুগত্য, রাজনৈতিক সংস্রব, ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক যোগ্যতা, বাসস্থান এবং আরো নানা ব্যাপারে আমেরিকার নানা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মাবলী—রাষ্ট্রপতি শিথিল করতে পারেন না। সংবিধানের মতো সাধারণ আইনও রাষ্ট্রপতির উপর ধার্য পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণরূপে কাজ করে, বিশেষ করে সেই সব কর্মপ্রতিষ্ঠানের (Commission) কথা স্মরণযোগ্য যা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার আওতার বাইরে কাজ করে।

কংগ্রেস এবং বিচারকদের মতনই সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাবার মধ্যে রাষ্ট্রপতির বিচক্ষণতা প্রমাণিত হয়। তবুও স্বাধীন কার্যনির্বাহকের উপর আদালতের নির্ধারিত বিধিনিষেধ না মেনে রাষ্ট্রপতির উপায় নেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ Humphrey's Executor বনাম U. S (1935) মামলাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মামলায় স্বীকার করা হয়েছিল যে মুখ্য কার্য-নির্বাহকের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কর্মচ্যুত কর্মচারীদের রক্ষা করার শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব কংগ্রেসের রয়েছে। Young stown Steel and Tube Co. বনাম Sawyer (1952) মামলায় প্রমাণিত হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ইস্পাত শিল্প দখল ও রাষ্ট্রীয়করণের ক্ষমতা ছিল না। যদিও কোন কোন

সময়ে ছোট ব্যাপারে—প্রচলিত প্রথা (Custom) পরিহার করা সম্ভব, সাধারণতঃ সেই প্রথাই দৃঢ়তম রাষ্ট্রপতিকেও প্রভাবান্বিত করে। ওয়াশিংটনের শাসনের প্রথম বছরে জর্জিয়ার শীর্ষস্থানীয় সেনেটরদের কাছ থেকে যে প্রথার প্রচলন ঘটেছে সেই "Senatorial courtesy" বা সিনেটীয় সৌজন্য নামক প্রাচীন প্রথা শত শত কর্মনিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অধিকার বেশ কিছুটা সংকুচিত করেছে।

এই সব বিধিনিষেধের অধিকাংশই বাঞ্ছনীয় এবং আমেরিকার শাসন ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের সযত্ন অধ্যয়নের বিষয়। কিন্তু এ সমস্তই পুঁথিপত্রে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ—এ চালু রাখার জন্যে জনসাধারণ ও সচল প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির যথেচ্ছবিহারী মনের উপর কোন ব্যাপার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে তা ভাল করে বুঝবার জন্যে আমাদের আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্যক্ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। 'প্রতিরোধক' শব্দটি সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে খুব সুনির্বাচিত হয় নি, কেন না সেই সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও শক্তিকেন্দ্র আমার আলোচনার লক্ষ্যস্থল, যারা কখনো কখনো তাঁকে এমন সব কাজ করতে বাধ্য করেন যা তাঁর অনভিপ্রেত। এরা কা'রা, কি ভাবেই বা রাষ্ট্রপতিকে এঁরা প্রতিনিবৃত্ত করেন?

এদের মধ্যে প্রথম, প্রভূত শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস—এখানে সমবেত হয়েছেন আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় নানা মানুষ, এর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়— এ একটি নির্মমভাবে স্বাধীন শক্তিকেন্দ্র। যে সব পদ্ধতি দিয়ে এ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাস করতে চায়—তার কিছু কিছু বহু ব্যবহারের ফলে আমাদের সুপরিচিত অস্ত্রগুলি অব্যবহারে বিস্মৃত প্রায়। তবু যে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারিতার পথে চলতে চান, এমন কি বিধিসম্মত উপায়েও যদি কাজ চালাতে চান, তাঁকে সে সমস্ত নিষেধের বেড়াজাল মেনে চলতেই হবে। এখানে সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা জুড়ে দেব আর সেই সঙ্গে দু একটি মন্তব্য।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ্ আলোচনা করেছি, কয়েকটি দিক্ থেকে দেখিয়েছি রাষ্ট্রপতি কি ভাবে সংবিধান দ্বারা সীমিত। এর সঙ্গে এ কথাটি যোগ করা কর্তব্য কংগ্রেস আজকের রাষ্ট্রপতির উপর যতটা ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতিদের উপরে তার চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তবু ১৯৫৫ এর জুলাই মাসে হাম্‌ফ্রে-স্টেনিস

(Humphrey-Stennis) যুক্ত বিবৃতি স্মরণীয়। সেই বিবৃতি অনুসারে রাইট কমিশনকে (Wright Commission) আনুগত্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্য-সূচী পরীক্ষা করে সে বিষয়ে বিবরণী দিতে বলা হয়েছিল এবং তা থেকেই বোঝা যায় অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির উপর আইনের চাপ দেওয়া সম্ভব। কৌশলে রচিত এই বিবরণীর ফলে আইজেনহাওয়ারকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন একটি প্রস্তাব পুনর্বার পরীক্ষা করে দেখতে হ'ল যার রচনার জন্য তিনি নিজেই মূলতঃ দায়ী ছিলেন। সেনেট এবং হাউস, স্বতন্ত্রভাবে বা সমবেতভাবে রাষ্ট্রপতির উপর প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রভাব জ্ঞাপন করতে পারে, যদিও এবম্বিধ প্রস্তাব একটি অভিমতের প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যতক্ষণ কংগ্রেস দ্বিধাহীন ভাবে মনে করে যাচ্ছে যে কম্যুনিষ্ট চীনের অনুপ্রবেশ রাষ্ট্রসংঘের স্বাভাবিক পদ্ধতিকে বিপর্যস্ত করবে ততক্ষণ রাষ্ট্রপতি কম্যুনিষ্ট চীনের সদস্যপদ প্রাপ্তির অনুকূলে কোন কাজ করতে পারবেন না। এমন যুক্তি সম্ভব যে এ রকম প্রস্তাবের একটা নৈতিক মূল্য মাত্র আছে—কিন্তু আমাদের শাসন-ব্যবস্থায় নৈতিকশক্তিই সময়ে সময়ে একমাত্র শক্তি।

আর একটি নিষেধ সম্ভাবনার স্তরেই রয়েছে, সে হলো কংগ্রেসের যৌথ সমর্থনক্রমে রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত জরুরি ক্ষমতার প্রত্যাহারের অধিকার যা কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতিরেকেই প্রয়োগ করতে পারে। ১৯৫৮ সালের পারস্পরিক বাণিজ্য-বিধি (Reciprocal Trade Act of 1958) অনুসারে কংগ্রেসের দুই কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সাহায্যে করধার্য সংক্রান্ত সমিতির (Tariff Commission) সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আপত্তি অগ্রাহ্য হতে পারে, দৃষ্টান্ত হিসাবে এর উল্লেখ করা যেতে পারে। কংগ্রেস প্রদত্ত অনেক ক্ষমতাই স্বল্পকালীন মেয়াদের; যুদ্ধকালীন কিছু কিছু আইনে ক্ষমতা কতদিন জারি করা যাবে তার নির্দিষ্ট উল্লেখ ছিল। আবার প্রত্যেক আইনের খসড়ার মধ্যে এমন চাতুর্যের সঙ্গে অতিরিক্ত সর্ত আরোপ করে দেওয়া হয় যার উপর রাষ্ট্রপতি ভেটো দিতে পারেন না। ওহাইওর (Ohio) অন্তর্গত ফ্রেমণ্টের (Fremont) অধিবাসীরা নাটকীয়ভাবে আমাকে বলেছিলেন যে যতবারই কোন রাষ্ট্রপতি এবম্বিধ চাতুর্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, রাদার ফোর্ড বি. হেইসের (Rutherford. B. Hayes) প্রতিবাদী সত্তা যেন সমাধির মধ্য থেকে তখনই নড়েচড়ে উঠে। আর কোন রাষ্ট্রপতিই এমনভাবে সর্ত দ্বারা

বিড়ম্বিত হন নি—আর কেউই এমন বলিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের চতুর সদস্যদের প্রত্যাঘাত করেন নি।

এই তদন্তের ক্ষমতা, যার ফলে রাষ্ট্রপতির নিম্নবর্তী কর্মচারীদের প্রশ্ন করার অধিকার কংগ্রেসের রয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ নেই যদিচ সন্তোষজনক জবাব কংগ্রেস সব সময়ে পায় কিনা সন্দেহের বিষয়। এই ক্ষমতার সাধু প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় ও অযৌক্তিক অপপ্রয়োগের নানা দৃষ্টান্ত আমাদের মনে জাগরুক হয়ে রয়েছে। দেখেছি অনেক তদন্তরই লক্ষ্যস্থল রাষ্ট্রপতি স্বয়ং, যেমন ১৯৫৩ এ সেনেটার ম্যাকার্থি ও ১৯৫৫-এ সেনেটার কেফাভার (Kefauver) পরিচালিত তদন্তের। এঁরা যখন এই সব বড় বড় তদন্তে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যরা শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, দোষ ত্রুটি ও অপবাপর ব্যাপারে ধীরে সুস্থে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন—বলা বাহুল্য তদন্তের উপজীব্য এই সব বিষয়ই রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সহযোগীদের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে কংগ্রেসের পুরাণো সদস্য ও বয়স্ক অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে যে অটুট বন্ধুত্ব লক্ষণীয় তা রাষ্ট্রপতিকে সংযত রাখার ব্যাপারে যথেষ্টই সাহায্য করে। এই সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন ধারণা নেই এবং এ ধরণের শলাপরামর্শ প্রায়ই রাষ্ট্রপতির ঘোষিত নীতির পরিপন্থী কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি আর কি করতে পারেন ?

অর্থমঞ্জুরি সংক্রান্ত ক্ষমতা একদা কংগ্রেসের হাতে অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে প্রতীয়মান হ'তো এবং এখনও অনেক লোক ফেডারালিস্ট (Federalist) এ ম্যাডিসন যেমন বলেছিলেন তেমনি করে বলেন :

অর্থ-বরাদ্দ করার ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত সংবিধান প্রদত্ত একটি ব্যাপক ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা যাব ফলে অভিযোগের দ্রুত সমাধান সম্ভব, যার ফলে প্রত্যেক বাঞ্ছনীয় কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

এখন সময় এসেছে এই গতানুগতিক সমালোচনার বিরুদ্ধে কিছু বলার—কারণ এই ক্ষমতা যতটা প্রচারিত ততটা কিন্তু সক্রিয় নয়। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত কাজ গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে অর্থকোষ থেকে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা কংগ্রেসের কাছে ধিকৃত হয়েছে, এ রকম ঘটনা বেশী মনে আসে না। বোধ হয় ১৯৪৩ আটাত্তরতম কংগ্রেসের হাতে জাতীয় Research Planning

Board এর অযৌক্তিক অবলুপ্তি এই ক্ষমতা প্রয়োগের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। একই বছরে অবশ্য রুজভেল্ট ১০০,০০০,০০০,০০০ ডলারের একটি বাজেট অনুমোদনের জন্যে কংগ্রেসের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কংগ্রেসও যুদ্ধ জয়ের জন্য সর্বাধিনায়ককে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে কুণ্ঠিত ছিল না—শুধু ন্যাশনাল প্ল্যানিং বোর্ডের ব্যাপারেই কংগ্রেসের আপত্তি ছিল। ম্যাডিসন অবশ্য যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রসংঘটন বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এ ধরণের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আইনসভার অর্থমঞ্জুরী সংক্রান্ত ক্ষমতা যতটা বাগাড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয় ততটা কার্য্যকরী নয়। এমন কি যুদ্ধের সময় ব্যয়বরাদ্দে মিতব্যয়িতা আনার তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস নিজেই উপযাচক হয়ে ঢালাও খরচের আদেশ দিয়েছে এ রকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। আপৎকালীন পরিস্থিতি আমাদের সঙ্গের সাথী হয়ে গেছে আজকাল এবং এ সময়ে বাৎসরিক আয়ব্যয়ের যে তালিকা কংগ্রেসে পেশ করা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের মিতব্যয়িতার ক্ষমতা একটা প্রহসন মাত্র। Impeachment বা রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য অভিযুক্তকরণ শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত একটা চরম পদ্ধতি। একবার এক রাষ্ট্রপতির উপর এমন নির্লজ্জভাবে এর প্রয়োগ ঘটেছিল যে আজকাল অনেকেই জেফারসনের মতে সায় দিয়ে বলবেন, এ নিছক কাকতাড়ুয়া বা হেনরি জোনস্ ফোর্ডের (Henry Jones Ford) মতে মত মিলিয়ে বলবেন—"এ হলো মরচেপড়া বন্দুক, আর হাতে দেওয়া চলবে না।" এ কথা বলছি এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন (Andrew Jackson) কে অপসারিত করার জন্য কংগ্রেসের চরমপন্থীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি অনহুগত এডুইন. এম. স্টান্টন্ (Edwin. M. Stanton) কে সমর সচিবের পদ থেকে অপসারিত করায় ১৮৬৭র "Tenure of office Act" লঙ্ঘন করেছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ১১ দফা অভিযোগে হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভ (নিম্ন-পরিষদ) জনসনকে অভিযুক্ত করে। আসলে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার পেছনেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবৃত্তি নির্লজ্জভাবে কাজ করছিল। সেনেটে যখন এ বিচার চলছিল তখন রাষ্ট্রপতি তিনবার রক্ষা পেয়েছিলেন মাত্র এক ভোটের জোরে—বিচারকালে শাসনতন্ত্র অনুসারে চীফ্ জাস্টিস চেজ (Chase) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন আর রাষ্ট্রপতি

শাসনতান্ত্রিক শালীনতাবোধে অনুপস্থিত ছিলেন। শাসনতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে সেনেটারদের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৬ জন রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত করলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হ'ত; তিনবার ৩৫ জন অভিযোগের স্বপক্ষে ও ১৯ জন অভিযোগের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। যে ভাষায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাতে এ কথা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযুক্ত রাষ্ট্রপতির কৌঁসুলিও দৃঢভাবে তা সমর্থন করেছেন যে এরকম বিচারে পদাধিকারীর কার্য-প্রণালীর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আদৌ নয়—এ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক অস্ত্র যার দ্বারা—নিম্নপরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যরা সেনেটের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের যোগসাজসে এমন রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করবেন যাঁর সঙ্গে তাঁদের নিছক মতের বনিবনা হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করার এই ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই অনাস্থা প্রস্তাবমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। যদিও মরচে পড়া বন্দুকের মতোই, তবু এখনো বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ, মন্দ আচরণ ও অন্যান্য গর্হিত কাজে প্রকাশ্যে লিপ্ত হবার অভিযোগে কোন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ চলতে পারে। এড্ওয়ার্ড, এস. করউইন (Edward S. Korwin) অবশ্য একে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে আখ্যাত করেছেন, এ যদি তা না হয়ে থাকে তার কারণ, অতীতে রাষ্ট্রপতিরা এমনভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন যার ফলে জনসাধারণ এই অস্ত্র প্রয়োগ করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করেন নি। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে পরবর্তী কোন রাষ্ট্রপতি যদি অভিযুক্ত হন তবে ব্যক্তিগতভাবে আইন লঙ্ঘন করার জন্যই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে—রাজনৈতিক অপরাধের জন্য নয়। কংগ্রেস অথবা এর কোন একটি পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে মৃদুভাবে অভিযুক্ত (Soft Impeachment) করতে পারে, যদিও গত একশ বছরে মাত্র একবারই রাষ্ট্রপতি এ ভাবে অভিযুক্ত হয়েছেন। ১৮৩৪এ জনসাধারণের আয়কর জনিত কার্যব্যবস্থা অবলম্বনে বিলম্ব করেছিলেন বলে এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের বিরুদ্ধে তা আনীত হয়েছিল। অবশ্য জ্যাকসন যে তাতে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তা তার পরবর্তী কার্যাবলীতে প্রমাণিত হয় না। বরং এ কথা বলা যায় আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক ব্যুমেরাং হয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রপতিত্বকে ধিক্কৃত করার কংগ্রেসের যে ক্ষমতা আছে (censure) তার এক রূপান্তর দেখা গিয়েছিল ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিম্ন ও উচ্চতর

পরিষদের প্রজাতন্ত্রপন্থী (Republican) সভ্যদের সম্মেলনে যেখানে রাষ্ট্রসচিব এ্যাচিসনের (Acheson) অপসারণ দাবী করা হয়েছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের এই অভূতপূর্ব অনাস্থা প্রস্তাব ক্রসেলন আলোচনায় এ্যাচিসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল ঠিকই কিন্তু এও একটি ব্যুমেরাং হয়ে রয়েছে। আমাদেব মনে হয় এর পরে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কিছুতেই প্রজাতন্ত্রীদের কথামত এ্যাচিসনকে সরাতে রাজী হতেন না—এমন কি পদচ্যুতির আশঙ্কাতেও নয়। সবশেষে সেনেটের তিনটি নেতিবাচক ক্ষমতার উল্লেখ অনিবার্য—এদের মধ্যে ছুটি সংবিধান থেকে প্রাপ্ত এবং তৃতীয়তটি কংগ্রেস নিজেই জাহির করে। (১) রাষ্ট্রপতির কোন মনোনয়ন কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জোরে চেপে রাখতে পারে। (২) রাষ্ট্রপতি যে সব চুক্তি কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন এক তৃতীয়াংশ ভোটে কংগ্রেস তা চেপে রাখতে পারে। (৩) এমন কি সামান্য সংখ্যক গোয়ারগোবিন্দ সদস্য ছুই পরিষদেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি জরুরি প্রয়োজনে যে সমস্ত ক্ষমতা ও টাকা পয়সা চান তা নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা করতে পারে—বলা বাহুল্য এরা কোন দলের তোয়াক্কা রাখেন না। রাষ্ট্রপতির পদ্ধতির সমালোচনা এমন কি তাঁর উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেনেটে যে আক্রমণ পরিচালিত হয় তার অনেক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নজির আছে।

রাষ্ট্রপতিকে প্রবর্তিত ও প্রতিনিবৃত্ত করার ব্যাপাবে কংগ্রেসের ক্ষমতা কতদূর সক্রিয় তা আলোচনা করা হলো। আসলে তাঁর উপর কংগ্রেসের আধিপত্য নেতিবাচক। এই প্রসঙ্গে ছুটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ, আইন বা অর্থসংক্রান্ত কোন বড়ো কার্যক্রম (ঘরোয়া কি বিদেশী) রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই যার সাহায্যে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন আইন পাশ করাতে বা অর্থব্যয়ে রাজি করাতে পারেন। এই গ্রন্থে একাধিকবার আমি যেমন গর্ব ও শ্রদ্ধাসহকারে আমাদের কার্য-নির্বাহক বিভাগের অনন্য স্বাধীনতার কথা বলেছি,—তেমনি একই ভাবে আমি আইনসভার অনন্য স্বাধীনতার কথা বলতে পারতাম। যেমন কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ অনাস্থা প্রস্তাব এনে রাষ্ট্রপতিকে সরাতে পারেন না, তেমনি তিনিও কংগ্রেসের অবসান ঘটাতে পাবেন না। তাঁর এবং তাঁদের কার্যকাল ঋজুভাবে নির্ধারিত। এই পৃথিবীতে

একমাত্র আমাদের আইন পারিষদের উপরেই রাজনৈতিক ঘটনা ও সংবিধান-গত নীতির দিক্ থেকে রাষ্ট্রপতির প্রতিপত্তি খাটবে না। তাঁর প্রভাব আছে এবং সে প্রভাব যে বাস্তবিকই ব্যাপক তা ১৯৩৩ এর মার্চ মাসে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবিসম্বাদী ক্ষমতা নেই। কংগ্রেসকে যে ভেঙ্গে দেওয়া যাবে না এটাই এর স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। এত ক্ষমতা পাচ্ছে সরাসরি সংবিধান থেকে, এর ক্ষমতাও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্য থেকে উদ্ভূত।

বিয়ার্ড লিখিত (Beard—Republic) রিপাব্লিক গ্রন্থটি থেকে অংশ উদ্ধৃত ক'রে কথাটির ব্যাখ্যা করবো। প্রথম অধ্যায়ে আমি যেমন করেছি উপরি উক্ত বইএর গ্ল্যাকন (Glaucon) ডাঃ স্মিথও তেমনি পররাষ্ট্র ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির অব্যাহত ক্ষমতা সম্বন্ধে জোরালো আলোচনা করেছিলেন এবং বই এর সক্রেটিস অধ্যাপক বিয়ার্ডও তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন :

আপনাকে এখন কয়েকটি প্রশ্ন করছি যার হাঁ কি না উত্তর চাই। রাষ্ট্রপতি একাই কি অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের পরিধি স্থির করতে পারেন—যেমন ধরুন শুল্ক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বা জাহাজের নির্ধারিত শুল্ক ব্যাপারে বা অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হার বা ভ্রমণ ব্যাপারে ?

—না, কংগ্রেসেরই আছে সেই ক্ষমতা।

রাষ্ট্রপতি কি তাঁর ইচ্ছানুসারে বহিরাগতদের ব্যাপারে বা দেশত্যাগেচ্ছুদের ব্যাপারে অনুশাসন জারি করতে পারেন ?

—না, কংগ্রেসই অভিবাসন-বিধি (Immigration) প্রণয়ন করেন।

রাষ্ট্রপতি কি যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশাগত ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার নির্ধারণ করতে পারেন ?

—না।

রাষ্ট্রপতি কি আমাদের সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও অন্যান্য সশস্ত্র ফৌজের আকার ও সংখ্যা নিরূপণ করতে পারেন ?

—না।

একা রাষ্ট্রপতি কি অন্যান্য দেশে দূতাবাস ও বাণিজ্য-মন্ত্রণালয় (consulate) স্থাপন করতে পারেন এবং স্বনির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা সেগুলো চালাতে পারেন ?

—না, যেহেতু কংগ্রেস তাঁদের অর্থ জোগাবে,—ইচ্ছা করলে সে পররাষ্ট্র

সম্পর্কীয় এই শাখা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া মন্ত্রী ও দূতের মনোনয়ন সেনেটের অনুমোদন ব্যতীত বৈধ নয়।

অন্যরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাষ্ট্রপতি পারেন কি?

—না, সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন চাই, তবে রাষ্ট্রপতি ছোটখাট চুক্তি সেনেটের পরামর্শ ব্যতিরেকেও করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন কি?

—না, কংগ্রেসেরই সে ক্ষমতা থাকার কথা। শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন কি?

—যদি চুক্তির কথা ওঠে সেনেটের সমর্থন অত্যাবশ্যক।

রাষ্ট্রপতি কি আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নিজে নির্ধারণ করতে ও ঘোষণা করতে পারেন, পারেন কি তিনি তা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে?

—এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে। অবশ্যই রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করতে পারেন, কিন্তু তিনি নিছক ঘোষণার দ্বারা তা সেনেটের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

এইরূপ কথোপকথন আরো আছে, কিন্তু এই অনুচ্ছেদই এ কথাটা মনে করাবার পক্ষে যথেষ্ট যে তাঁর বিস্ময়কর অধিকারের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করতে হয়।

আমাদের শাসন ব্যবস্থার এই নিগূঢ় সম্পর্কসূত্রে আরো অনেক বাগ্‌বিস্তার সম্ভব, কিন্তু আশা করি এর মধ্যে এই একটি কথা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছি: আমেরিকার রাষ্ট্রপতির উপর খবরদারি করতে সক্ষম এই এক দর্পিত, ঈর্ষিত, সচেতন সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এমন কোন রাষ্ট্রপতি আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি যিনি খেদে বা শ্রদ্ধায় এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন নি।

তৃতীয় স্বাধীন সংস্থার রাষ্ট্রপতিত্বের উপর আধিপত্যের দ্যোতনা অবশ্য উল্লিখিত প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম। কার্যতঃ রাষ্ট্রপতি যে ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, মনে হয় যেন সুপ্রীম কোর্টের অস্তিত্বই নেই। বিচারালয়ের এমন ক্ষমতা নেই যে, অপরিণামদর্শী রাষ্ট্রপতির অবিবেচিত কার্য বিচারজনিত অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে আনতে পারে।

একথা বিশেষভাবে রাষ্ট্রপতির যুদ্ধকালীন কার্যকলাপে লক্ষণীয়। ইউনাইটেড্ স্টেটস্ রিপোর্টস্ এ আমাদের তিনটি প্রধান বিরোধের আগে ও পরের

বিবরণী কেউ যদি পড়েন, তিনি এটি লক্ষ্য করবেন। ঠিক যে মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি (লিঙ্কন কি উইলসন কি রুজভেল্ট) যিনিই হোন জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ও "Commander-In-Chief" ধারার আশ্রয় নিয়েছেন, বিচারালয় তখুনি চাতুর্য্যের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কোন সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছে, তাঁর সেনানিবৃন্দের সঙ্গেও কোন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় নি। তবে যুদ্ধকালে বিচারালয়ের সংযম অনিবার্য ও আবশ্যিক। কোন জায়গা খালি করে দেবার আদেশ, কোন যন্ত্রোৎপাদনকেন্দ্র দখলীকরণ, হেবিয়াস কর্পাসের সনদ স্থগিত রাখা প্রভৃতি ব্যাপার জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের পক্ষে এতই জরুরি যে বিচারালয়ের পক্ষে কোন জিজ্ঞাসা উত্থাপন সম্ভব নয়। শান্তির সময়ে বরং তা সম্ভব, কিন্তু যুদ্ধের সময় এই খেয়ালপনা অর্থহীন এবং বিচারালয়ও রাষ্ট্রপতির সর্বাধিনায়কত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে না। কংগ্রেসের অর্থবলের মতোই, বিচারালয়ের সমালোচনা প্রয়োজনের সময়ে কম প্রয়োজনে লাগে।

তবু বিচারালয়ও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে স্মরণীয় বিজয়ের স্বাক্ষর রেখেছে। "হার্মাক্রর হত্যাকারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র" (১৯৩৫) প্রভৃতি কয়েকটি বিচারের বিলম্বিত রায় অবশ্য সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের উপরই বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এক্সপার্টে মিলিগান (১৮৬৬)। যে রাষ্ট্রপতিকে এর রায়ে তিরস্কৃত করা হয়েছিল তিনি অবশ্য রায়দানের এক বছর আগেই নিহত হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অসামরিক লোকদের সামরিক বিচার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেক্টর ভ্রাতৃবৃন্দ বনাম যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩৪) এবং ইয়ংস্টাউন সীট এ্যাণ্ড টিউব কোঃ বনাম সয়ার (১৯৫২) (Youngstown Sheet and Tube Co. VS. Sawyer, 1952) প্রভৃতি বিচার স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতিকে মাঝপথে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ন্যাশনাল রিকভারি এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটরা এর বৈধতা সেক্টর বিচারের ফলে আর ছিল না, এ বিচার সম্বন্ধে আর আর যা কিছুই বলা হোক না কেন।

এই বিচার শাসনতান্ত্রিক সরকারের এক সুস্থ রূপ আমাদের দেখিয়েছে, এর ফলে রাষ্ট্রপতি নিজেই, বিচারালয় নয়, এন. আর. এ কে ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। ইস্পাত রাষ্ট্রীয়করণের প্রচেষ্টা সম্পর্কীয় বিচারেও

শাসনতান্ত্রিক বৈধতার এক নাটকীয় অভিব্যক্তি আমরা দেখেছি এবং এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধায় না হলেও বশ্যতায় নিয়মতান্ত্রিকতার কাছে মাথা নত করে বাণিজ্য সচিবকে ইস্পাত শিল্পের উপর দখল ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই বিবরণীকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত টেনে আনতে গেলে বলতে হয় রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার ১৯৫৮ তে দুবার সুপ্রীম কোর্টের হাতে দুটি বিরক্তিকর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন: "কেণ্ট বনাম ডালেস" বিচারে রাষ্ট্রসচিব পাসপোর্ট মঞ্জুর না করে যে ভাবে পররাষ্ট্রনীতির গতি ঠিক করতে চেয়েছিলেন তা বিশেষভাবে সীমিত হয়েছিল এবং "কোল বনাম ইয়ং" বিচারক রাষ্ট্রপতির আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে বরখাস্ত করার যে নিয়মসম্মত ক্ষমতা ছিল তা যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করে দিয়েছিল।

এ সব কোন বিচারেই রাষ্ট্রপতি বিচারালয়ের সামনে নিজে হাজির হন নি। মিসিসিপি বনাম জনসন এ চেজ এর (Chase) অভিমত বা বুর বিচারে (Burr Trial) জেফারসনের মার্শালের আদেশ অবজ্ঞা করার মধ্যে এই সত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে যে ন্যায়াধিকরণের রাষ্ট্রপতিকে কোন কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া বা না দেওয়ার বা তাঁকে প্রশ্ন করার কোন ক্ষমতা নেই। তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা অবশ্য ন্যায়াধিকরণের আওতার বহির্ভূত নন। রাষ্ট্রপতির নামে যে সব অনুশাসন প্রচলিত তার যে কোন একটার প্রয়োগের সময়ই প্রয়োগকারীর বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আসতে পারে। "লিটল বনাম বারেম" (Little VS Barreme) (১৮০৪) এ পরিষ্কারভাবে বিচারালয় রাষ্ট্রপতির একটি অনুজ্ঞা বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিল—পানামা রিফাইনিং কোঃ বনাম রিয়াল (১৯৩৪) (Panama Refining Co. VS Ryan) এ সূত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিচার।

রাষ্ট্রপতির কার্যকলাপের উপর বিচারালয়ের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্যকালে আমি কঠোর বা হতাশ্বাস হতে চাই না। কেউ এটা অস্বীকার করবে না যে "হামফ্রির হত্যাকারী বনাম যুক্তরাষ্ট্র" (Humphrey's Executor vs U. S.)-এর নৈতিক একটি বার্তা আছে যার ফলে ভবিষ্যতের কোন রাষ্ট্রপতিই কোনো উল্লেখযোগ্য কার্য প্রতিষ্ঠানের কমিশনারকে বরখাস্ত করে বোলতার চাকে হাত দেবেন না এটা ধরে নেওয়া যায়। বিচারপতি ম্যাদারল্যাণ্ডের অভিমত উপেক্ষা করার মতো ঘটনা যদি ঘটেই, তবে কংগ্রেস, জনগণ

ও বিচারালয়ের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। এবং তাঁদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে ১৯৩৪ এ রুজভেল্ট যে অপসারণ ঘটিয়েছিলেন তার সঙ্গে প্রস্তাবিত কার্যব্যবস্থার পার্থক্য কতটা। তবুও একথা মানতেই হবে এবং হামফ্রির বিচারে ও—"ওয়াইনার বনাম যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫৮)" (Weiner V. U. S. 1958) এ এটা প্রমাণিত যে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে যে কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে বিচারালয় সহানুভূতি দেখান বা কিছু টাকা পয়সা দেওয়া ছাড়া পদচ্যুত ব্যক্তিকে আর কোন সাহায্যই করতে পারে না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিচারালয় একটি অন্যতম রক্ষা-কবচ এ যদি আমরা ভেবে থাকি তবে আত্মপ্রতারণা করছি মাত্র। বস্তুতঃ বিচারালয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দিয়েছে—যেমন ধরুন ১৮৬৩ এর প্রাইজ কেসগুলি (Prize cases) যাতে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অঙ্গরাষ্ট্রগুলি অবরোধ করার লিঙ্কনের সফল প্রচেষ্টাকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, ইন. রে. দেবস্, ১৮৯৫ (In re Debs 1895) এ ক্লিভ-ল্যাণ্ডের প্যুলমান ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা সমর্থিত হয়েছিল, মেয়ার্স বনাম যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৬ (Myers V. U. S. 1926) এ রাষ্ট্রপতি (পরে মুখ্য বিচারপতি) অপসারণের ক্ষমতার উপর সম্ভবপর সমস্ত বিধিনিষেধ অবহেলা-ভরে ডিঙিয়ে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্র বনাম কারটিস-রাইট এক্সপোর্ট কর্পোঃ (১৯৩৬) (U. S V. Curtisw-right Export Corp. 1936) এ বিচারালয় মুক্তকণ্ঠে পররাষ্ট্র ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে এবং এ ছাড়াও নানা বিচারের নজির স্থাপন করা যায় যাতে রাষ্ট্রপতির অপরাধ মকুব করার ক্ষমতা ও আইনে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা বর্ধিত হয়েছে। আমেরিকার রাজনৈতিক ও ন্যায়নৈতিক পরিবেশ এমনি যে ন্যায়াধিকরণের পক্ষে রাষ্ট্রপতির বেশী সংখ্যক ক্ষমতার স্বপক্ষে কথা না বলে উপায় নেই। বস্তুতঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার ক্ষমতা বিচারালয়ের অতি সীমাবদ্ধ।

এর চেয়ে বেশী সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রপতিকে সংযত ক'রতে পারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনসংক্রান্ত বিভাগ নিজেই: ২০,০০০ সামরিক ও বেসামরিক সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংস্কার রাষ্ট্রপতিকে বেশ কাবু ক'রতে পারে। যদি এই ব্যাপারে গত ৫০ বছরের রাষ্ট্রপতিদের অভিমত চাওয়া

হয় তবে দেখা যাবে দু'একজন বাদে প্রায় সবাই এ ব্যাপারে একমত যে কোন কংগ্রেস সদস্যের চেয়ে কোন সরকারী কার্যাধ্যক্ষ বা কমিশনার বা সেনানায়ক রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছামূলক কার্যের প্রবলতর প্রতিবন্ধক। অনেকেই আবার এতদূর বলবেন যে রাষ্ট্রপতির কঠিনতম কাজ কংগ্রেসকে তাঁর কোনো প্রিয় রাজনৈতিক সংকল্পের অনুকূলে আনানো নয়, তার স্বনির্বাচিত সদস্য চালিত কর্মপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে তাঁর কোন কার্যসূচীকে বাস্তবে পরিণত করার ব্যাপারে প্রবর্তিত করা। এটা আমাদের আক্ষেপের সঙ্গে স্বীকার ক'রতেই হবে যে কোন রাষ্ট্রপতি তাঁর অধীনস্থ কর্মীসংস্থার সমবেত সহযোগিতা ছাড়া সহায়তাই কোন কিছু ক'রতে পারেন না। এই কর্মীদের অনেকেই তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের আগে কাজে যোগ দিয়েছে—এবং তাঁর কর্ম-বিরতির পরেও থাকবে। সেনেটে নামের তালিকা পাঠানোর আগের দিন পর্যন্ত যাঁদের নাম তিনি শোনেন নি সেই সব রাজনৈতিক কার্যনির্বাহকদের অনুগত সমর্থন তাঁর একান্তই প্রয়োজন। এই সহযোগিতা অর্জনের জন্য, শাসনযন্ত্রের বা তার একাংশের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে সকল শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

এর মানে এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা এমন একদল লোকের দ্বারা চালিত যারা রাষ্ট্রপতির ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা সদা বিপর্যস্ত করে। বরং এর উল্টোটাই সত্যি। আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরাও সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে কম আগ্রহশীল নন। কিন্তু কোন্‌টা সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক, এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও তাঁদের মধ্যে মতান্তর ঘটে; বিশেষতঃ যখন তিনি কোন সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছেন যাতে কংগ্রেসের পরাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও কোন কোন গোষ্ঠীর সমর্থন নেই। এ রকম পরিকল্পনার মানসরূপ আর তার বাস্তব বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দুস্তর গরমিল দেখা যায় এবং কোন কর্মপ্রতিষ্ঠানকে একেবারে পঙ্গু না করে রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর পরিকল্পনার অনুকূলে সোজাসুজি চালাও ও বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। অসামরিক ও সামরিক কর্মক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা মোচনের জন্য গত তিন জন রাষ্ট্রপতির মৌখিক ও লিখিত আদেশগুলি যে কতবার কিছু সংখ্যক গোঁয়াড় বা ভীরু-স্বভাবের কর্মচারীদের দ্বারা উপহসিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে সব কর্মচারীদের কর্মজীবন রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপরেই একান্তভাবে নির্ভর, সরকারি পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁদের কাছে ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারকে

যে কতোবার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেই সব দৃষ্টান্ত ভুলে যাবার নয়। শাসন সংক্রান্ত অধিকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রীতিমতভাবে সংযত হবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রুজভেল্টের ছিল। তাঁর উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য :

কোষাগার (Treasury) এত বড়ো এবং শাখাপ্রসারী যে আমি দেখেছি, যে কাজ ও যে ফল সেখান থেকে পেতে চাই তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে—সেখানে হেন্‌রি মর্গ্যান (Henry Morgan) থাকা সত্বেও। কিন্তু কোষাগার রাষ্ট্র বিভাগের (State Department) সঙ্গে তুল্য নয়। মর্মে মর্মে কূটনীতিজ্ঞদের চিন্তা পদ্ধতি, পরিকল্পনা ও মননকে প্রবর্তিত ক'রতে যদি কেউ চায়, তার অভিজ্ঞতা না থাকলে বুঝতে পারবে না সমস্যাটা ঠিক কোথায়। আবার কোষাগার ও রাষ্ট্রবিভাগ একত্রিত হ'য়েও নৌবিভাগের তুল্য নয়। নৌবিভাগে কিছু বদলানোর চেষ্টার অর্থ কোন বালকের বিছানায় মুষ্ট্যাঘাতের মতো। ডান আর বাঁ হাতে ঘুষি মারতে মারতে তুমি নিজেই অবসন্ন হয়ে পড়বে, দেখবে বিছানাটা আগে যা ছিল তাই আছে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রাষ্ট্রপতির বাধাবিপত্তির কথা আরো বলা যাবে। শাসনবিভাগের এমন কয়েকটি দিক্ রয়েছে যা অন্ধকার বা সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাষ্ট্রপতিকে ব্যাহত করতে পারে। এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। প্রথমতঃ আলোচ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের ব্যাপক আয়তন—রাষ্ট্রপতির পক্ষে মাত্র কয়েকজনের বেশী ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর নয় অথচ সবার কার্যকলাপের উপরেই রাষ্ট্রপতির বাঞ্ছিত পরিকল্পনার সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। বার্ক যে কথা প্রাচীন বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলেছিলেন, সে কথা আমরা আমেরিকার নব্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ব'লতে পারি—"বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শক্তিসঞ্চালন সর্বত্র সমান প্রাণবন্ত হয় না। এটি প্রকৃতির নিয়ম"।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকার আইনের উৎস বহুমুখী এবং পরিণামে লক্ষ্যণীয়, কার্যক্ষেত্রের বিকেন্দ্রিকরণ বা বহুমুখীত্ব। অনেক কর্ম প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রপতির বিধিবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রত্যক্ষ আওতা থেকে মুক্ত, অনেকগুলি আবার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পরিবেশের জন্য তাঁর প্রভাববিমুক্ত। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে নিবৃত্ত ক'রতে সক্ষম এ রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ত্বরান্বিত করতে পারেন কোন কোন গর্বিত প্রতিষ্ঠানের মামলাবাজ অধ্যক্ষরা,

কংগ্রেসে যাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা রাষ্ট্রপতির চেয়েও বেশী। এমন কি এই হিসাব থেকে আমি উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লি (William Mckinley) কেও বাদ দিচ্ছি না। জে. এডগার, হুভারের অধীনস্থ ফেডারেল ব্যুরো অফ ইন্‌ভেস্টিগেশন, শ্রীমতী রুথ শিপ্‌লেও কুমারী ফ্রান্সেস নাইটের নেতৃত্বে পাসপোর্টের অফিস ও ইঞ্জিনিয়ারদের অসংখ্য সংস্থাগুলি—কার্যক্ষেত্রের বহুমুখীত্ব (Pluralism) বলতে আমি এই সবই বুঝিয়েছি। যদিও ইচ্ছানুযায়ী পরিকল্পনা ও বিধান প্রয়োগে এই সব প্রতিষ্ঠান খুবই নির্ভরযোগ্য, তবু যদি রাষ্ট্রপতি বহুবর্ষ অনুসৃত প্রথা বা পদ্ধতির হঠাৎ পরিবর্তন চান তবে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দুর্বিপাক ডেকে আনবেন। শ্রীযুত হুভারের এমন একটি ভোগস্বত্ব ছিলো যা যে কোন অতিরিক্ত সুরক্ষিত শাসন কর্তার ঈর্ষ্যার উদ্রেক করতে পারতো এবং যেহেতু তাঁর কার্যকাল রাষ্ট্রপতির তুলনায় বেশী দীর্ঘস্থায়ী ছিলো, তাঁর সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে দুদণ্ড ভাবতেই হ'তো। ভেবে অবাক লাগে যে কতবার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান হুভারকে নিষ্কৃতি দেবার কথা ভেবেছেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন এবং তারপর নিজ কাজে মন দিয়েছেন, সর্বশেষে বক্তব্য, শাসন সংক্রান্ত বিভাগের ঐতিহ্য, গর্ব, চিরাচরিত মন্থরতা ও বিধিবদ্ধ অভিজ্ঞতা এই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রপতির—ইচ্ছা, ভালোমন্দ যাই হোক না কেন, উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকর্মচারীদের অগণ্য সংখ্যার উপর আইনতঃ তাঁর প্রতিপত্তি থাকলেও কার্যতঃ প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই এবং তাঁদের দ্বারা তিনি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রপতি এ ভেবে কোনই সান্ত্বনা পান না যে শাসনসংক্রান্ত বিভাগের শীর্ষ-স্থানীয় কার্যাধ্যক্ষদের তিনি নিয়োগ বা অপসারণ করতে সক্ষম, কারণ এঁদের খুব অল্পসংখ্যকই তাঁর অনুগত এবং সবাইকেই এটা মানিয়ে চলতে হয় যে ব্যুরো বা কোন ডিভিসনের কিছু কিছু অধ্যক্ষরা কংগ্রেসের কোন কোন কমিটির সঙ্গে ক্ষমতা, টাকা পয়সা ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতিকে ডিঙ্গিয়ে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ক'রে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এ রকম অনেক কার্যক্রম আছে যা রাষ্ট্রপতির পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়।

আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আরো এক ধরণের সাধাদানের পর্যায়। দুটি প্রধান দলের কথাই এখানে আমার বক্তব্য। আমরা এটা ভাল করে নানাদিক থেকেই জানি যে বিরোধী পক্ষের নেতারা

তাঁর পরিকল্পনাগুলি তচনচ করে দিতে এবং তাঁর জীবন বিপন্ন করতে যথেষ্ট। তাঁরা তাঁর সহকারীকে উত্যক্ত করেন, তাঁর পদ্ধতিগুলি খুঁটিয়ে দেখেন, অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাঁর অভিপ্রায় বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন, তিনি কতক্ষণ গলফ্ খেলেন তার হিসাব রাখেন এবং ১৯১৮, ১৯৪৬ বা ১৯৫৮ এর কংগ্রেসীয় নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর দলকে ভোটে পরাজিত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে পরাজিত করেন। যদি এ কথা সত্য বলে মানতে হয় যে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজ রাজনৈতিক দলের অধিনায়ক, প্রতীক ও বাহন তবে এ কথাও মানতে হবে যে তাঁর নির্বাচনের বিরুদ্ধতা করেছে যে দল সেই দল তাঁর চার বছরের মেয়াদী কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধতা করেই যাবে—তবে তিনি রাষ্ট্রপতি বলে কিছুটা সংযতভাবে—এই যা সান্ত্বনা। তাঁর সমাচার প্রধানতঃ তাঁর দলের সমাচার, এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধের বৃত্তান্ত। ঐ প্রতিপক্ষ হোয়াইট হাউসে নিজেদের প্রার্থীকে প্রেরণ করতে চায়, এবং জাতির একান্তকল্যাণের পক্ষে অনিবার্য ব্যাপারগুলিতে অংশ গ্রহণ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে সহজে তার অভীপ্সিত পথে যেতে দিতে উৎসুক নয়। এ সব ব্যাপারে সংগ্রাম-কালে তিনি প্রতিপক্ষের দ্বারা সর্বদাই বিপন্ন। নানাবিধ বিধিনিষেধের বেড়াজালে (Checks and Balance) আবদ্ধ আমাদের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর একটি অন্যতম মুখ্য প্রতিষেধক হচ্ছে বিরুদ্ধদল—যে দল রাষ্ট্রপতিত্বের দ্বন্দ্বে নির্বাচন যুদ্ধে পরাজিত। আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণেতারা অবশ্য এই দলবাজির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু বৃথাই এই সব চেষ্টা। কোন দলই নিজেকে দেশের প্রধান দল বলে মনে করতে পারেন না, যতক্ষণ না তাঁরা হোয়াইট হাউসের অধিকার ও প্রতিপত্তি পেয়েছেন। বাস্তবিকই পৃথিবীতে একমাত্র আমাদের দেশের কোন দলই বছর বছর ধরে জাতীয় কংগ্রেসকে চালনা করেও "ক্ষমতাচ্যুত দল" বলে যথাথরূপে বর্ণিত হতে পারেন—প্রায় দশ হাজার শব্দের কোন বাগাড়ম্বর-বহুল বর্ণনার চেয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই হলো সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক ভাষ্য।

তাঁর প্রতিপক্ষ দল পথের প্রতিবন্ধক হলে তাঁর নিজের দলও আরেক অর্থে মন্থর অন্তরায়। দলের প্রধান হিসাবে বিপুল তাঁর ক্ষমতা, কিন্তু যাঁরা তাঁকে নির্বাচিত করেছেন তাঁদের সঙ্গেই তাঁকে কাজ করতে হবে—পেনসিন্‌ভিনিয়ার

প্রতিনিধি সিম্পসন আইজেনহাওয়ারকে ১৯৫৯ এর জানুয়ারী মাসে ক্ষোভের সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন তা স্মরণযোগ্য। কংগ্রেসও তার মিত্রদের থেকে খুব বেশি এগিয়ে গেলে বা পিছিয়ে পড়লে তাঁর চলবে না। দলের ঐতিহ্যের প্রতি তিনি সম্মান জানাবেন, তারি মধ্য থেকে তার প্রধান অনুচরদের নির্বাচন করবেন, যদিও দলীয় কলহে সৎভাবে মধ্যস্থতা করবেন, যারা দলীয় আনুগত্যের কিছুটা বাইরের সীমানায় চলাফেরা করছে তাদের নানা অভিযোগ আক্রমণ গভীর বুদ্ধি সহকারে সহ্য করবেন। ভারসাম্য বিধানের জন্যই তাকে এ সব করতে হয় এবং পরবর্তী নির্বাচনের জয়লাভের প্রত্যাশাতেও। একই সঙ্গে আবার বলিষ্ঠ পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাঁকে অনেকখানি শক্তি খোয়াতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দলের সঙ্গে যোগ রেখে তিনি কাজ চালাবেন নতুবা কাজ করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমরা শাসনসংক্রান্ত প্রায় দশ বারোটি উদাহরণ থেকে জানি, তিনি দলকে যত পুনর্বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করুন, দলই তাকে পোষ মানাবার চেষ্টা বেশি করে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে শক্তিমান নেতা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তাঁর দলীয় বোঝা তাঁর কার্যকালের বেশির ভাগ বছর ধরে বহন করেছিলেন। কেভ আডুল্লামে (Cave of Adullam) সমবেত রিপাব্লিকানরা নয়, হাউস, রুলস্ কমিটির ডিমোক্রেটরা এবং সেনেট জুডিসিয়ারি কমিটির ডিমোক্রেটরা ছিলো তাঁর এবং তাঁর লক্ষ্যের মধ্যেকার দুর্ভেদ্য বিঘ্নস্বরূপ। আইজেনহাওয়ার অবশ্য অভিনবত্বে উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁকেও রিপাব্লিকান দলের নেতৃত্বভারে মন্থর হতে হয়েছে। যে দল তাকে সৃষ্টি করে সেই তার গতিরোধ করে এই হলো আধুনিক রাষ্ট্রপতির অবস্থা।

যখন আমরা আমাদের জাতীয় সরকার এবং তার প্রাণস্বরূপ দলগুলির বাইরে তাকাই, আমরা দেখতে পাই অন্যান্য তিনটি কেন্দ্র এবং শক্তি রাষ্ট্রপতিকে অসুবিধাজনক বক্রপথে যেতে বাধ্য করে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—পঞ্চাশটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা ও তার অগণিত শাখা-প্রশাখার কুটিল জাল, যাদের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিকল্পনাকে অসুবিধার মধ্যে ফেলবার ক্ষমতা আছে। অবশ্য যখন তারা জেফার্সনকে অস্বীকার করেছিল, ম্যাডিসনকে উপেক্ষা করেছিল, লিঙ্কনকে নাজেহাল করেছিল, তখনকার প্রতাপ এখন আর নেই, কিন্তু যদি এখনও রাষ্ট্রপতি

শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় ভেদনাশী সুবিচারের আশায় কোন পরীক্ষা কার্য চালান তবে তাঁকে এদের দ্বারা প্রতিহত হতে হবে। পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পরিচালনা ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য না করে এই সব রাষ্ট্র ও নগর তাঁর বিরক্তির কারণ হতে পারে। সানফ্রান্সিসকো শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাচ্য-বিরোধী একগুঁয়েমির ফলে থিওডোর রুজভেল্টের জাপান সংক্রান্ত কাযস্থচী বিফল হতে বসেছিল, পরে অবশ্য যখন কেলিফোর্ণিয়ার আগত জাপানীদের সংখ্যা কমান যায় কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন তাঁকে তারা ছেড়ে দিলো। যখন রাষ্ট্রপতির আন্তরিক অনুরোধ সত্তেও (সাক্রামেন্টোতে রাষ্ট্র-সচিব ব্রায়ানের প্রদত্ত বক্তৃতা এই সূত্রে স্মরণীয় যে দর্পিত জাপানকে অপমান করলে ফল ভাল হবে না) তারা জাপানীদের লক্ষ্য করে বিদেশাগতদের জমিসংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তন করেছিলো তখন কেলিফোর্ণিযার প্রজাতন্ত্রী সরকার রাষ্ট্রপতি উইলসনকে বেশ বিপদে ফেলেছিল। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা তার উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতার জন্য সব সময় উপেক্ষিত হয়েছে, এবং একটা যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে তা রাজা ইরানসৌদের নিয়ুইয়র্ক আগমন উপলক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে মেয়র ওয়াগনারের শিশু-সুলভ আচরণ থেকেই প্রমাণিত। যখন মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে এই সব কথা বলছি, তখন মনে রাখতে হবে যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে তৈল-সমস্যার সূচনা ও পরিণাম এই অঞ্চলটির সঙ্গে জড়িত এবং টেক্সাস রেলপথ সমিতির অস্তিত্ব সম্পর্কে এই প্রসঙ্গেই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এর মধ্যে যে কোনদিন আমাদের পশ্চিম ইউরোপকে প্রচুর পরিমাণে তৈল রপ্তানী করতে হবে। যেমন আমরা ১৯৫৭ এর সুয়েজ সঙ্কটক্ষণে করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তির আশায় রাষ্ট্রপতিকে বিপুল শ্রম স্বীকার করতে হয়। ব্যাপারটি যে কত সাধ্যসাধনা সম্ভব তা অধিকাংশ আমেরিকাবাসীর বোঝবার ক্ষমতা নেই। আশা করা যায় যে এই অঙ্গরাষ্ট্রগুলির অব্যাহত অস্তিত্বের জন্যে আমরা টেক্সাসের উপর যথেষ্টই নির্ভর করতে পারব। অবশ্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারের উপর এই সব অঙ্গরাষ্ট্রের চেয়েও মার্কিনী মুক্তধন বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রভাব কম নয়— এই মুক্তধন বিনিয়োগ ব্যবস্থা কয়েকটি পৌরপ্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র বাণিজ্য, সহযোগী সংস্থা ব্যক্তিগত ধন বিনিয়োগ বাণিজ্য সংস্থা, যৌথ সমবায় কেন্দ্র, সমিতি গোষ্ঠী,

ক্রেতা গোষ্ঠী এবং অনুরূপ নানা প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে মুক্তি ও উন্নয়নের পরিবেশ রচনা করে সচল ও ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। এই সব সংস্কার উন্নয়ন সচিব হিসাবে তিনি অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের আর্ত্ত আশঙ্কা দূরীভূত করতে পারেন যদি তাদের কাছ থেকে শ্রম ও বিনিয়োগ ব্যাপারে সাহায্য পান। সমর্থন বা সাহায্য পাবার এই স্পৃহা কোন কোন গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিহত হতে পারে এবং রাষ্ট্রপতির ঈপ্সিত উন্নতি বিলম্বিত হতে পারে।

বাস্তবিকই তিনি যে প্রতিহত হতে পারেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গত কয়েক বছরে একাধিকবার যৌথ অথবা একক বিনিয়োগকারীর দ্বারা তিনি অশোভনরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। দুঃসাহসী ব্যারণদের মধ্যে সর্বশেষ জন-এল লুইস অন্ততঃ তিনজন রাষ্ট্রপতিকে নরহত্যা অথবা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন। স্বদেশব্রতী ক্ল্যারেন্স রাণ্ডাল ১৯৫২ এপ্রিলে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ইস্পাত শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের আদেশ উপলক্ষ্য করে কী রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা চালিয়েছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। রাণ্ডালের ভাষণের ভূমিকা ও উপসংহারের অংশটুকু যথার্থই স্মরণীয় (মার্কিন মানসের যে প্রতিচ্ছবি এই ভাষণে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে হোয়াইট হাউসের রাজনীতিক নেতা সম্রাটেরই মতো)।

আকাশবাণীর শ্রোতাদের কাছে আমি একটি গভীর দায়িত্ব বোধ নিয়ে দাঁড়িয়েছি। মাইক্রোফোনের কাছে দাঁড়িয়ে গত রাত্রে একজন ব্যক্তি ইস্পাত-শিল্পের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন আমি আজ সেগুলো খণ্ডন করার প্রয়াস পাচ্ছি। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। আর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এমন এক দেশে বাস করছি যেখানে কোন নাগরিক চোখে আঙুল দিয়ে রাষ্ট্রপতির ভুল দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আজ আমি রাষ্ট্রপতির ভুল দেখাবার জন্য আসি নি।

গতরাত্রে স্বয়ং হ্যারি এস. ট্রুম্যান তাঁর কর্মক্ষেত্রের সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছেন এবং সেই ক্ষমতার যে অপব্যবহার করেছেন তা তাঁর দ্বারাই সংশোধিত হওয়া বিধেয়। প্রকৃত ঘটনার যে বিকৃত ভাষ্য তিনি দিয়েছেন সে সম্পর্কে আমি নির্বাক থাকব না। তিনি যে ক্ষতিসাধন করে আমেরিকার মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন সে সম্পর্কেও আমি কিছু বলতে চাই।

তিনি জাতির ইস্পাতশিল্প রাষ্ট্রকবলিত করেছেন। সেই শিল্প যাদের নিজস্ব সম্পদ সেই দশ লক্ষ জনতা আমার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। আমি বলছি রাষ্ট্রপতি বিধিসম্মত অধিকার লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। এবং কার জন্যে তিনি এমন কাজ করলেন এ সম্পর্কে আমেরিকার কোন ব্যক্তি যেন কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। আমেরিকার ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে ঘটে নি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদপ্তরের 'কিল মুরে' এবার হ্যারি এস-ট্রুম্যানকে রসিদে লিখেছিলেন "কড়ায় গণ্ডায় উসুল হল"। আমার বক্তব্য মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি বলেই রাষ্ট্রপতিকে আমার স্পষ্ট প্রত্যুত্তর নিবেদন করছি। রাষ্ট্রপতি গতরাত্রে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তা সমস্ত আমেরিকাবাসীকে গ্রহণ করার জন্য আমি যদি আহ্বান না জানাই তবে নাগরিকের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব।

শ্রীরাণ্ডেল এবং তার সহযোগিবৃন্দ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আট সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপতি ও বাণিজ্য সচিব সোয়ার আরব্ধ কার্যসূচী থেকে প্রতিনিবৃত্ত হলেন। ফলে তাঁদের কষ্টের যে অবসান হল তা নয় তবে রাষ্ট্রপতিকে তারা সংগ্রামে পরাভূত করলেন এই যা সান্ত্বনা।

ইতঃ পূর্বেই আমি দূরদেশস্থিত সতীর্থবৃন্দ ও অধীনস্থ কর্মীমণ্ডলীর প্রতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করছি। পৃথিবী জোড়া কৃত্রিম ও আন্তরিক বন্ধুদের পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও সম্ভব হলে গ্রহণ করা বিধেয়—কেন না গণতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর স্থায়িত্বের অনেকটাই নির্ভর করে এই মৈত্রীমূলক সম্পর্কগুলির উপর—রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের পক্ষে এটি একটি জরুরী সর্ত। সামরিক অথবা পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতিকে ভাবতে হয় দেশ ও বিদেশের মানুষেরা তাঁর সেই নীতি কী ভাবে গ্রহণ করবে। সুতরাং কূট-নীতিক সম্পর্ক অথবা যুদ্ধসংক্রান্ত কথাবার্তা চালাবার ব্যাপারে তাঁকে সংযত হয়েই চলতে হয়—সেই পরিধি লণ্ডন, প্যারী, টোকিও পর্যন্ত। নতুন দিল্লী থেকে সুরু করে ন্যুইয়র্ক জাতিপুঞ্জ ভবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অনেকবার রাষ্ট্রপতিরা ঠিক তাই করেছেন যা স্যার উইনষ্টন চার্চিল অথবা স্যার এণ্টনি এডেন জেনারেল দ্য গল অথবা সীংম্যান রী তাঁদের করতে প্রণোদিত করেছেন। শ্রীআইজেনহাওয়ার কি ১৯৫০এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতেন যদি এডেন এবং প্রধানমন্ত্রী ফয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ

না হতেন এবং যদি সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন না হতেন তবে স্যার এ্যাণ্টনিই কি তাঁকে ও রকম অনুনয় বিনয় করতেন? (ঐ নির্বাচনে শ্রীআইজেনহাওয়ার তাকে জয়ী দেখবার বাসনা দৃঢ়ভাবে পোষণ করেছিলেন বলেই ত সাড়া দিয়েছিলেন।)

১৯৫৯-৬০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রক্রিয়া কি অপেক্ষাকৃত সহজতর হত না যদি এ্যাডেনার এবং দ্য'গলের সংশয়ের দ্বারা তা বিক্ষিপ্ত না হয়ে পড়তো! যদি লক্ষ লক্ষ জার্মান ও ফরাসীরা রাশিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে দিতে বিমুখ না হত তবে কি আর—এ্যাডেনা ও দ্য'গল অমন সন্দিগ্ধ হতেন? এই সব দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কাজই প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন দেশে জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মানসিক প্রবণতা রাষ্ট্রনীতির কর্মপদ্ধতিকে কথনও বা বিলম্বিত করে দিতে সক্ষম।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উপর সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ খবরদারি করতে পারে আমেরিকার জনসাধারণের মতামত যা বিভিন্ন স্থিতস্বার্থ বিশিষ্ট নানা উপদেশের নিগূঢ় চাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শোনা যায় লিংকন্ বলতেন জনসাধারণের ভাবাবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তাকে এড়িয়ে বা তার বিরোধিতা করে কিছু করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। জনসাধারণের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি বিপুল কর্তৃত্ব সূচক অধিকার অর্জন করেছেন; কিন্তু সেই অধিকার তাদের অনুমোদিত বিধি অনুসারে, অর্থাৎ ঐতিহ্য সম্মত। সুষ্ঠু ও শোভন উপায়েই তাঁকে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি জনমত চালনা করেন। অবশ্য জনমত ব্যাপারটিতে অনেকগুলি জটিল গ্রন্থি রয়েছে এবং তা ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায় না। এক এক সময় আসে যখন সুর-সপ্তকের—সর্বোচ্চ সুরের সঙ্গে জনমত কোনমতেই মিলবে না; এ কথা—ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্ট তাঁর কোন বন্ধুকে একদা বলেছিলেন। এ কথার অর্থ এই যে রাষ্ট্রপতিকে একঘেয়ে বা একগুঁয়ে হলে চলবে না। রাষ্ট্রপতি জনমত কিছুটা চালনা করতে পারেন, কখনও নতুনদিকে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত নীতিবোধের বিরাট ও স্থায়ী রূপটির বিরুদ্ধে তাকে চালনা করতে পারেন না। যদি তিনি জনসাধারণের মূল অংশের কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অথবা অবিবেকী কুসংস্কার উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তবে

তিনি রাষ্ট্রপতি-সুলভ ব্যবহারের গৃহীত সীমা কিছুটা অতিক্রম করবেন। তাঁর শত্রুরা মশার ঝাঁকের মত বাড়তে থাকবে যদি তিনি এই খেলা বেশিমাত্রার খেলেন।

কোন রাষ্ট্রপতি, বিশেষ করে কোন শান্তিকালীন রাষ্ট্রপতি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রুজভেল্টের মতো ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও বহিবিশ্বে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে সব কিছুই তিনি করতে পারেন না, কংগ্রেসের কাছে আহত পৃথিবীতে আহত আমেরিকার পুনরুজ্জীবনের জন্য সব রকম আইনের জন্য অনুরোধ জানাতে পারতেন না। রাষ্ট্রপতির একনিষ্ঠ অনুরাগী অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির কয়েকটি কথার সাহায্যে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করব ঃ

যে সব বিরাট অভিনবত্বের জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত নয়, সেই সব অভিনবত্ব ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরিকল্পনার কৌশল এর দিক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে পারে; কিন্তু মূল ভাবাদর্শগুলিকে নিয়ে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গেলে বিপজ্জনক ফলাফলের সম্মুখীন হতে হবে। যে সব সমালোচক বলেন যে ১৯৩৩এ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জাতীয়করণ না করে একটি বৃহৎ সুযোগ হারিয়েছিলেন, তাঁরা রাষ্ট্রপতির কর্মপন্থার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন নি। যদিও ঐরকম একটি পরিকল্পনা নেওয়া সেই সঙ্কট মুহূর্তে সম্ভবপরও হতো, তা প্রত্যাশা বহির্ভূত হতো এবং তাঁর কার্যকালের অবশিষ্ট সময় তাঁর কর্তৃত্ব বিনষ্ট করে দিতো। তার আগে এমন কোন আলোচনা হয় নি যা জনসাধারণকে সেই মর্মে প্রস্তুত করতে পারতো। নির্বাচনসংক্রান্ত যে সব ধারণা রুজভেল্ট পোষণ করেন বলে সাধারণ লোক জানতো, তার মধ্যে এই সব কর্মপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত বলে তাদের ধারণা ছিল না। তিনি হয়ত লড়াইয়ে জিততে পারতেন কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য পরাভূত হ'ত।

১৯৩৭এ সুপ্রীম কোর্টকে সম্প্রসারিত করে নেওয়ার লড়াইয়ে রুজভেল্টের পরাজয়ের কথা ভেবে আমি ল্যাস্কি যা বলেছেন তার চেয়েও এগিয়ে গিয়ে বলবো, যে সে ক্ষেত্রে জিতাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না! ১৯৩৩এ এ দেশের বৃহৎ জনমত কখনই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা জাতীয় করণের ব্যাপারটিকে মানিয়ে নিতে পারতো না এবং নানাভাবেই রাষ্ট্রপতি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতেন। জনমতের এই সব পথ ও পদ্ধতি গত কয়েক দশকে বরং আরো শক্তিপ্রাপ্ত

হয়েছে এবং মার্কিনী জনমতের এই সব পথও পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে রেডিও টেলিভিজান আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান, **হোয়াইট হাউসে** পত্র প্রেরণ, এমন কি রাষ্ট্রপতির প্রতি সাবধান মূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে । রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উপর জনমতের প্রকৃত চাপ যে সব ক্ষেত্রে তীব্রতমরূপে অনুভূত হয়, সেগুলির উল্লেখ এই অধ্যায়েই করেছি। জনমত রাষ্ট্রপতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে যখন কংগ্রেসকে তাঁর ভেটো অমান্য করতে প্রবুদ্ধ করে, কোন অনুসন্ধান কমিটিকে হোয়াইটস্ হাউসের কোনো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নাজেহাল করতে অনুরোধ করে, ক্রিসমাস পর্যন্ত কয়েকজন সেনেটারকে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে উদ্বুদ্ধ করে, কোন পদচ্যুত কমিশনারকে বরখাস্তকারীর সঙ্গে আদালতে যুঝবার পরামর্শ দেয় এবং রাষ্ট্রপতির বিবৃত কোন আদেশপত্রকে দৃঢ়ভাবে নাকচ করার জন্য সুপ্রীম কোর্টকে প্রণোদিত করে। রাষ্ট্রপতিকে সংযত করার কাজে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান জনমত ছাড়া নির্জীব, কিন্তু জনমতের সংস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

কংগ্রেসের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। যখন রাষ্ট্রপতিকে কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত করে অথবা তাঁর কোন অনুরোধ প্রত্যাখান করে, তখনই নিজেদের ধন্য মনে করে, কেন না তাঁদের ধারণা যে জাতীয় চিন্তার গতি প্রকৃতি তাঁরাই তখন সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। যদি তিনি কংগ্রেসকে ভুলভাবে কোনো ব্যাপারে প্রণোদিত করেন, অথবা সমস্ত নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করে নিজমতে অগ্রসর হয়ে যান, তবে তিনি প্রায় চিরতরে জনমতের সমর্থন হারান।

পরিশেষে অবশ্য উল্লেখ্য যে বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ বিধিনিষেধই রাষ্ট্রপতিকে সংযত করে রাখতে সক্ষম। তাঁর বিবেক ও শিক্ষা-দীক্ষা ইতিহাসবোধ এবং সেই বোধের দ্বারা নিরপেক্ষরূপে সমালোচিত হবার অভিপ্রায়, কর্মের বোঝার ভারে নুয়ে না পড়ে দৃপ্তভাবে কর্মসাধনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা—এই সব মিলে রাষ্ট্রপতিকে জাগ্রত রাখে, তাঁকে এমন কোন কাজ করতে দেয় না যা তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পরিপন্থী। তিনি আমাদের সবারই মতন মার্কিন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সবার চেয়ে এটা ভাল করে বোঝেন যে তাঁর সমুন্নত কর্মক্ষেত্রে কি ভাবে ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতে হয়। তিনি যদি ইতিহাস অথবা রাজনীতি

অথবা শাসন চালনার বিন্দুবিসর্গও জানেন, তবে তাঁর এটুকু অন্ততঃ জানা আছে যে স্বাভাবিক প্রত্যাশার সীমানা রক্ষা করে তিনি অনেক বড বড় কাজ করতে পারেন—নিয়মতন্ত্র, গণতন্ত্র, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং খৃষ্টীয় নীতিবোধরূপে গৃহীত ধারণাগুলিকে সম্মানিত করে, অন্ততঃ ক্ষুণ্ণ না ক'রে।

রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা বিষয়ক আলোচনার আরম্ভ বিন্দুতে আবার আমরা ফিরছি এবং পুনর্বার আমি এ কথাই বলছি যে আমেরিকার প্রচলিত ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র চলবে না। কখনো কখনো আমাদের এই প্রজাতন্ত্র "বিধাতার ক্রুদ্ধ মানব-পুত্রদের" আয়ত্তে এসেছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে গিয়ে মারাত্মক বিস্ফোরণ মূলক কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু কেউই রাষ্ট্রপতিত্বের উচ্চ শিখরে সমারূঢ় হবার প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। আমাদের রাজনৈতিক নিয়মাবলীর অন্যতম প্রয়োজনীয় চাহিদা এটি যে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে দক্ষ রাজনীতিক হতে হবে যিনি শতকক্ষযুক্ত একটি ভবনের মতো একটি দলকে মিলিত করতে পারবেন এবং দ্বিতীয়তঃ একজন রাষ্ট্রনায়কের উপযোগী নৈপুণ্যে আমেরিকার সুবৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে স্বীয় অধিকার ন্যস্ত করতে পারবেন। নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াটি বাস্তবিকই অবশেষে অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করে কে ক্রুদ্ধ, উদ্বিগ্ন ও নীতিশূন্য সুতরাং নির্বাচনের পক্ষে অনুপযুক্ত। থেড্ডাস ষ্টিভেন্স, হিউই লং বা সেনেটার ম্যাকার্থির মতো মানুষ নিজ নিজ কালে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেন ; কিন্তু জয়লাভেচ্ছু কোন দলই এ রকম ব্যক্তিকে মনোনয়ন জ্ঞাপন করবে না। ১৯৫২ কি ১৯৫৩এও যে সেনেটার ম্যাকার্থি রাষ্ট্রপতিত্ব পরিগ্রহ করতে পারলে না (যদিও অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতিকে নাজেহাল করার ক্ষমতা তার ছিল) তা থেকে মার্কিন মানবতার একটি পরিচয় পরিস্ফুট হচ্ছে। পূর্বে উল্লিখিত হ্যামিল্টনের একটি মত এখনো সত্য বলে প্রতীত হয় :

নির্বাচনের সমস্ত প্রক্রিয়াটির ভিতরে একটি নীতিগত নিশ্চিতি রয়েছে বলেই যে কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈপ্সিত গুণাবলী ছাড়া রাষ্ট্রপতি হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ছোট ছোট ষড়যন্ত্র করার ক্ষমতা, জনপ্রিয়তার অর্জনের ছোটখাটো নৈপুণ্য থাকলে কেউ হয়তো কোন একটি অঙ্গরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হতে পারেন, কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা ও স্বীকৃতি অর্জন করতে হলে অন্ততঃ

আরও কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক, বিশেষতঃ যদি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সম্মানিত পদ অর্জন করতে চান। এটা বলা শক্ত নয় যে অসাধারণ যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী ব্যক্তিরাই ঐ পদের প্রার্থী হবেন।

আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল যে রাজনৈতিক দল তা চালনার সবিশেষ যোগ্যতা তাঁর থাকা চাই, আর চাই বিশ্বের অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও বিদগ্ধ নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন করার মত গুণ।

যিনি রাষ্ট্রপতির পদারূঢ় এবং এই রচনা মুহূর্তেই যিনি ঐ পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছেন তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক্। আমাদের অন্যান্য রাষ্ট্রপতির মতো তিনিও স্বৈরতন্ত্রের পরিপন্থী ; কিন্তু তাঁদের সবার মতোই, কখনো কখনো তিনি ক্ষমতার অপব্যবহারও করতে পারেন। তাঁর উপর আরোপিত বিধিনিষেধের বেড়াজাল সম্পর্কেই আমার আলোচনা। ঐ সব বিধিনিষেধ তাঁকে প্রায়শঃই ক্ষমতার মারাত্মক অপব্যবহার থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে। দুটি মন্তব্য দিয়েই এই আলোচনার ছেদ টানা যেতে পারে। প্রথমতঃ, কংগ্রেস, বিচারালয়, শাসনযন্ত্র, দলসমূহ, অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ, আর্থিক-ব্যবস্থা ও জনসাধারণ এই সব শক্তিশালী বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান এককভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। এই সবগুলি মিলে একটি জটিল জাল রচনা করে এবং এদের পরস্পরের যোগাযোগেই তারগ্রন্থি শক্ত ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। একটি অপরটিকে সুরক্ষিত করে এবং অপরটির দ্বারা সুরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপতির কোন কাজ যদি যথার্থই অশোভন হয় তবে তা আমাদের ব্যবস্থা-বিধিব প্রতিটি অংশে প্রবল প্রতিবাদ জাগাবে। এমন কি ডিকসন ইয়েটস সংক্রান্ত ব্যাপারে আইজেনহাওয়ার কৃত ভুলগুলির অনুরূপ কোন বিতর্কিত কর্মপন্থা কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ, শাসকবর্গ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদ্‌গণকেও সমবেত বিরোধিতার সূত্রে মিলিত করবে। একাধিক সমালোচকেরা সেই বিতর্কসূত্রে মন্তব্য করেছেন যে রাষ্ট্রপতি জন, সি কালজাউনের "সংঘবদ্ধ সংখ্যাধিক্যের" মতবাদটির সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। নতুবা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে সংখ্যাগুরুর সমন্বিত সহযোগিতা ছাড়া কোন প্রয়োজনীয় কার্যসূচী গ্রহণ করতে গেলেই কিছু কুফল ডেকে আনবে। এটা ঠিক অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আইজেনহাওয়ার যুদ্ধে জিতলেও উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে পরাভূত হবেন।

যখন তিনি দ্বন্দ্বে পরাজিত হলেন, তখন শুধুমাত্র তিনি মেমফিস (Memphis) নগরীর কাছেই প্রতিহত হলেন না; কিন্তু আরও যে সব সংস্থা দুর্দমরূপে নানাদিকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো তাঁদের কাছেও হারলেন। এ রকম অনেকেই আছেন যাঁরা ভাবেন ভিয়েন-ইয়েটস্ চুক্তি যথার্থভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিলো। এটা ভাবলে অবশ্য সেই সত্যই প্রমাণ হয় যে ঐ ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিকে ভাল-মন্দ দুই-ই করার ক্ষমতা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম। পরিশেষে অবশ্য আমরা ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত এই সত্যই পোষণ করবো যে রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত বিধিনিষেধের বেড়াজাল সুষ্ঠুরূপেই আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করবে। স্বাধীন মানুষদের মধ্যে অবশ্য অনেক কিছুই আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল। আমরা যেমন এটা আশা করতে পারি না যে ক্ষমতা শুধুমাত্র ভাল করবে, এটাও আমাদের প্রত্যাশিত নয় যে—বিধিনিষেধের ব্যবহার শুধুমাত্র অন্যায় নিবৃত্ত করার জন্যই হবে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি গ্যালিভারের মতো দশ হাজার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শৃঙ্খলে অনড় বা আবদ্ধ নন, প্রমিথিউসের মতো নৈরাশ্যের শিলাখণ্ডে শৃঙ্খলিতও নন। বরং বলা চলে তিনি মহাপ্রতাপান্বিত সিংহের মতন বহুদূর পর্যন্ত চলাফেরা করতে পারেন এবং তার বিশাল কর্মক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করে অনেক বিরাট কিছু করতে পারেন। আমাদের বিধিনিষেধের এই বহুমুখী ব্যবস্থা তাঁকে সীমার সংযমে নিয়ন্ত্রিত রাখবার জন্য, তাঁর ব্যবহার্য ক্ষমতাবলী অস্বীকার করে তাঁকে বিকল করে দেওয়ার জন্য নয়। যদি তিনি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন তবে তাঁকে খুব অল্প বাধারই সম্মুখীন হতে হবে। তাহলে এই হলো শক্তিমান ও সফল রাষ্ট্রপতির পরম সংজ্ঞা; যিনি ভাল করেই জানেন তার ঈপ্সিত-পথে তিনি কতদূর যেতে পারেন। যদি তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিধি সম্বন্ধে অজ্ঞ হন তবে তিনি এর শক্তি ব্যবহার করতে পারবেন না। মাথা কুটে মরা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী শক্তিশালী বহুবিচিত্র বিষয়ের সমন্বয়, কিন্তু তার ভিতরে স্বাধীনতা ও নীতিবোধের একটি শক্তদানা নিহিত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রপতিপদের ঐতিহাসিক ভূমিকা

মার্কিন রাষ্ট্রপতিত্বের মূল শিকড় খুঁজতে গেলে সুদূর অতীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। গত দেড়শো বছর ধরে পৃথিবীতে অনেক আদর্শ সংবিধান ও কার্যনির্বাহক শাসন-সংস্থার উত্থান ও বিলোপ ঘটেছে, কিন্তু যথার্থ শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রপতিত্ব অব্যাহত রয়েছে। এই পদের ইতিহাস চিত্তাকর্ষী এবং সেই ইতিহাস না জানলে এই পদের সম্পূর্ণ গুরুত্ব ও পরিচয় প্রণিধান করা সম্ভব নয়। অতএব বিলম্ব না করে সেই বিষয় আলোচনা করছি।

এর উৎস নির্ণয় সূত্রে প্রথমেই আমি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান রচনার জন্য যে কনভেনসন হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করবো, যদিও আর সব কিছুর মতই এরও নিজস্ব একটি উৎস রয়েছে, এ ক্ষেত্রে উৎসটি ইংলণ্ডের সংবিধানের ইতিবৃত্তে নিহিত। আমেরিকার শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় ধারায় নির্দিষ্ট কার্যনির্বাহক বিভাগের প্রকৃতি বুঝতে গেলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে কারা এটি প্রণয়ন করেছিলেন, কি উদ্দেশ্য তাদের মনে ছিল, কোন্ উপাদান নিয়ে তাঁরা কাজ করেছিলেন, কোন্ অভিজ্ঞতা তাঁদের পথপ্রদর্শক হয়েছিলো।

যাঁরা রাষ্ট্রপতি পদটিকে আকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জেম্স-উইলসন, তিনি তাঁর সকল শক্তি,

সপ্রতিভতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল কার্যনির্বাহক বিভাগের পক্ষে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছিলেন; ছিলেন জেম্‌স ম্যাডিসন যিনি প্রথমে মন্থর, কিন্তু পরে দৃঢ়ভাবে উইলসনের প্রগতিশীল অথচ যুক্তিসংগত মতামতগুলি সমর্থন করেছিলেন। আরো ছিলেন পূর্বে আলোচিত প্রায় খঞ্জ গভর্ণর মরিস, যিনি একটি সক্রিয় কার্যনির্বাহক বিভাগের পক্ষ নিয়ে কনভেনশনে যুঝেছিলেন এবং সংবিধানের শেষ খসড়ায় সেই নীতির জয়বার্তা মুদ্রাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। হ্যামিল্‌টন ও ওয়াশিংটনও তাঁদের নিজ নিজ উপায়ে প্রারম্ভিক রাষ্ট্রপতিত্বের জন্য কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

এই ভদ্রমণ্ডলী যে ইচ্ছা পোষণ করতেন—কনভেনশনের সামগ্রিক অভিপ্রায়ও তাই ছিল; নতুন এই প্রজাতন্ত্রকে বিপ্লবের বহ্নিশিখা থেকে পুনরুদ্ধার করে এক উৎসাহী রাষ্ট্রের পত্তন করা যা আভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে, যা পারবে নিয়মানুগ স্বাধীনতার আশীর্বাদ লাভ করতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করতে, বাণিজ্যিক প্রাচুর্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে, সরকারে আস্থা জন্মাতে ও বিদেশে নিজ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে, অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে ঈপ্সিত সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনে ঐক্যবদ্ধ করতে ও বিদগ্ধ গুণীসমাজের হাতে শাসনব্যবস্থার ভার তুলে দিতে। রোজার শেরম্যান ও এড্‌মণ্ড্‌ র‍্যান্ডল্‌ফ-এর চেয়ে উইলসন ও মরিসের মত লোকেরাই বেশি ভাল বুঝেছিলেন যে একটি ক্ষমতাবান ও স্বাধীন কার্যনির্বাহক বিভাগ এ রকম রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য একটি প্রতিষ্ঠান।

যে সব উপাদান নিয়ে তাঁরা কাজ করেছিলেন সেগুলি হলো: ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতি তথা বৃটিশ রাজতন্ত্র, প্রারম্ভিক অঙ্গরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রগুলিতে নিষ্পন্ন কার্যনির্বাহক বিভাগের শক্তিবিষয়ক নিদান, কনফেডারেশনের ধারাগুলিতে যে শাসনসংক্রান্ত বিভাগ সম্পর্কীয় সমাধান ছিল তা এবং সুসমঞ্জস সরকারের পক্ষে লক ও মন্টেস্‌কিউ-এর রচনাবলী। ঐ কনভেনশনের নেতাদের বিমিশ্র অভিজ্ঞতা ১৭৭৭ এর ন্যুইয়র্ক শাসনতন্ত্রের এবং ১৭৮০-এর ম্যাসাচুসেট্‌স শাসনতন্ত্রের পথ নির্দেশ করে দিয়েছিল। এই দুই অঙ্গরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বাধীন কার্যনির্বাহক বিভাগগুলি স্থায়ী ও নিয়মনিষ্ঠ ভূমিকা পরিগ্রহ করেছিলেন এবং বিপরীতভাবে নর্থ ক্যারোলাইন ও রোড আইল্যাণ্ড এই দুই অঙ্গরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগের অপ্রমত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার ফিলাডেলফিয়ার প্রতিনিধিবর্গের

দৃষ্টি এড়ায় নি। তাদের শাসনবিধির (অঙ্গরাষ্ট্রীয় ও জাতীয়) ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুই আইন-প্রণয়ন বিধির ঘূর্ণাবর্তে মথিত হয়েছিল। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৭ এর মধ্যে সংবিধান ইতিহাসের বিবর্তনে নরমপন্থী হুইগদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান্তর ঘটেছিল, যাদের মধ্য থেকে সংবিধান প্রণেতাগণ বেরিয়ে এসেছিলেন। যদিও হুইগরা প্রথমে লোকসভায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু পরে জেফারসনের "নোটস্ অন ভার্জিনিয়ার" অনুসরণে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন যে "একশ তিয়াত্তর জন স্বৈরাচারী একজন উদ্ধত শাসকের চেয়ে কম অত্যাচারী নন।" নতুন প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রান্তে রক্ষণশীলদের মধ্যে কংগ্রেসের ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় আইনসভাগুলির মর্যাদার দ্রুত অবলুপ্তির জন্যই এমন এক সরকারের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যা আইনসভা ও শক্তিশালী শাসনসংক্রান্ত বিভাগের ক্ষমতার এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম—শাসনসংক্রান্ত বিভাগকে যা কেবলমাত্র একটি পঙ্গু বিভাগে পরিণত করবে না। এমন কি জর্জ ম্যাসন পর্যন্ত এই মত পোষণ করতেন যে কার্যনির্বাহক বিভাগকে ব্যবস্থাপক বিভাগের একটি শাখায় পরিণত করলে সুষ্ঠু সরকারের মূলনীতিগুলি বিপর্যস্ত হবে।

কনভেনশনের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথটি কিছুটা আয়াসসাধ্য এবং অনিশ্চিত ছিলো। এটা প্রায়ই মনে হতো এর পূর্ববর্তী দশকের সুকঠোর অভিজ্ঞতা প্রতিনিধিরা কাজে লাগাতে পারবেন না। সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় সন্নিবদ্ধ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। প্রচুর বিতর্ক বিবেচনা আর পুনর্বিবেচনা, কমিটিগুলির কাছে উল্লেখপঞ্জী এবং ব্যক্তিগত তৎপরতার যে পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে উইলসন ও তার সতীর্থরা সার্থকতায় উপনীত হয়েছিলেন, তার সমূহ বিবরণী উদ্ধার করা ঐতিহাসিকের পক্ষে দুরূহ। ম্যাডিসনের বিবরণীতে স্তিমিত রাষ্ট্রপতিপদের দুরূহ অগ্রগতির ইতিহাস মনোযোগের সঙ্গে দেখেছি। আর যা আমি বুঝতে পারি নি তাহ'ল কি ভাবে সুদৃঢ় কার্যনির্বাহক বিভাগের মুখপাত্ররা বিস্ময়কর-ভাবে জয়ী হলেন। এটুকু অবশ্য নিশ্চিতির সঙ্গে বলা চলে যে কার্যনির্বাহক বিভাগের আকৃতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার বিভিন্নধাপে অন্ততঃ আটটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং সেগুলির মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতিত্বের উদ্ভব হয়েছে। প্রতিটি সিদ্ধান্তই অবশ্য একটি সিদ্ধান্ত এর ব্যতিক্রম যেটি অচিরেই

সংশোধিত হয়েছিলো—'সুদৃঢ় কার্যনির্বাহকের পক্ষে' গৃহীত হয়েছিলো। রাষ্ট্রপতিপদ তথা আমাদের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার ফল দূরপ্রসারী হতে পারতো, যদি এর মধ্যে একটিও অন্যভাবে গৃহীত হতো (এটি খুব সহজ ভাবেই হতে পারতো)। এই সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করার প্রাক্কালে জানাই যে, অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে সংঘটিত ঘটনাবলীর এই ভাষ্য একটি আপাত সহজ টীকা মাত্র। ১। কার্যনির্বাহক বিভাগে আইন প্রণয়ন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করবে। যদিও এটি আটটি সিদ্ধান্তের মধ্যে সবচেয়ে সহজগ্রাহ্য ছিলো তবু শেরম্যানের মতো এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা মনে করতেন ব্যবস্থাপক বিভাগের হাতেই এ রকম কার্যনির্বাহককে সৃষ্টি ও মনোনীত করার সময়োপযোগী ক্ষমতা দেওয়া বিধেয়। বেশির ভাগ প্রতিনিধির কাছে এটা প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল যে সংবিধানেই কার্যনির্বাহক সংস্থার আকৃতি স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হবে। প্রথম মার্কিন সংবিধানে এটা করা হয় নি এবং কোন কোন গোঁড়া দেশপ্রেমিক মনে করেন যে 'আর্টিকেলস্ অফ কনভেডারেশনের' সেটি একটি অন্যতম ভুল।

২। কার্যনির্বাহক বিভাগ একটি মানুষের দ্বারাই গঠিত হবে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। এই সিদ্ধান্ত প্রচুর বিতর্কের পর গৃহীত হয়েছিলো। উইল্‌সন যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সমিতির (Committee on Detail) সভাপতি হিসাবে র‍্যানডল্‌ফ (Randolph) প্রমুখ ব্যক্তিদের এই আশঙ্কা প্রতিহত করলেন যে এক-নায়ক বিশিষ্ট কার্যনির্বাহক বিভাগ "স্বৈরাচারের অঙ্কুর" তখন এই নীতি জয়ী হ'লো। যদি র‍্যানডল্‌ফ ও তার বন্ধুদের জয় হতো তবে রাষ্ট্রপতিপদ সম্ভবতঃ তিনজনের মধ্যে বিভক্ত হতো।

৩। আইনপ্রণয়ন বিভাগের বাইরে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। কার্যনির্বাহক বিভাগের অন্য কোন সমস্যার উপরে সংবিধান প্রণেতাদের ক্রমন্বয় কথোপকথন ও ভোটগ্রহণ করতে হয় নি। অধিকাংশ সদস্যই প্রথমে শেরম্যানের এই যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভারই কার্যনির্বাহক বিভাগের নিয়োগ কর্তা হওয়া উচিত এবং ঐ বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে এ রকম নীতিও গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। এ রকমের ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি এই ছিল যে আইন-সভাই সমাজের সার্বভৌম ইচ্ছার আধার। ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সির দুই

গোষ্ঠীই ব্যবস্থাপক সভার অধীনে কার্যনির্বাহকের নির্বাচনের সুপারিশ করেছিল এবং সদস্যরা পাঁচবার কনভেনশনে এই পদ্ধতির অনুকূলে ভোট দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত মরিসের বাকপটুত্ব ও নীতিনৈপুণ্যে দ্বিতীয় ধারার প্রথম উপধারায় রাষ্ট্রপতিপদের জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা গৃহীত হলো। (১৭৭৬ এর মেরিল্যাণ্ড শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রের সেনেটার নির্বাচনের পদ্ধতি থেকে এটি গৃহীত হয়েছিলো)। কেবল মরিস ও উইলসন এই দুই বিপরীত-ধর্মী ভবিষ্যদ্বক্তাই কিন্তু একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রপতিত্বের জন্য জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচন দাবী করেছিলেন। আরো চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর ধরে রাষ্ট্রপতির গণতান্ত্রিক নির্বাচন মার্কিনী গণতন্ত্রের অভিযাত্রা অব্যাহত রাখবে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতার স্বপক্ষে ফিলডেলফিয়াতেই মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল : প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিকূলে আইনপ্রণয়ন পরিষদের পরিসর ও অধিকারের বাইরে তাঁর নির্বাচনের স্থান বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত।

৪। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হবে মেয়াদি, একমাত্র গর্হিত পাপ বা আচরণের দ্বারা যার ছেদ ঘটতে পারে। হ্যামিলটন "ফেডারেলিষ্টের" একটা গোটা সংখ্যা ধরে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত সমর্থন করেছিলেন যে এর ফলে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও তাঁর শাসনবিভাগের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যাবে। কিন্তু তিনি অথবা তাঁর অন্য কোন সহযোগী নির্দিষ্ট কার্যকালের প্রকৃত এই তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি যে এর ফলে পার্লিয়ামেণ্টারি শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব অসম্ভব করে তুলবে। এই জন্য তাদের বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না, কারণ ইংলণ্ডের তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরাও তখন পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি যে দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট সরকারের পথে তাঁদের সংবিধান কতখানি অগ্রসর হয়েছে।

৫। রাষ্ট্রপতি অনির্দিষ্টবার পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। এই সিদ্ধান্তের হেরফের হলে কোন রাষ্ট্রপতিকে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হবার চেষ্টা করতে দেওয়া হতো না। ফলে রাষ্ট্রপতিত্ব আজকের থেকে অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী হতো। ওয়াশিংটন, জ্যাকসন, উইলসন, লুই রুজভেল্ট এবং টুম্যানের দ্বিতীয় কার্যকাল প্রাপ্তি রাষ্ট্রপতি পদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, এটি হওয়া সম্ভবপর হত না এবং তাদের স্মরণীয় প্রথম

কার্যকালেই সব কিছুর অবসান হতো, যদি তাঁদের বন্ধুরা এবং প্রতিযোগীরা তাঁদের দ্বিতীয় নির্বাচনে যেতে না দিতেন। হ্যামিল্টন 'দি ফেডারেলিষ্ট'এ বলেছেন :

যদি জন ছয়েক লোক চরম শাসনভারে আসীন হতেন, তবে কি সমাজের উন্নতি হতো অথবা সরকারের স্থায়িত্ব সাধিত হতো? তাঁরা কি জনসাধারণের মধ্যে অসন্তুষ্ট প্রেতের মত বিচরণ করতেন না এবং যে প্রতিষ্ঠা তাঁরা কখনো অর্জন করতে পারতেন না তার জন্য হা-হুতাশ করে বেড়াতেন না।

৬। রাষ্টপতিকে ক্ষমতাদান করবে সংবিধান। তাঁর অনন্য ক্ষমতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং তা কংগ্রেস থেকে সঞ্জাত নয়। নিয়মসংগতরূপে আদেশ করার অধিকার, মনোনয়ন, মার্জনা, চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা, আইন প্রয়োগ সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা তার পর্যবেক্ষণ, কংগ্রেস আহ্বান, ভেটো দানের অধিকার তাঁর যদি নাই থাকলো তবে তাঁর আর অধিকার কতটুকু রইলো? হ্যামিল্টন "প্যাসিফিকাস" (Pacificus) রচনাকালে ১৭৯৩-খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ঘোষণার স্বপক্ষে কী করে কথা বলতেন, প্রথম রুজভেল্ট কী করে "বৃহৎ পরিবারের অধ্যক্ষ বিষয়ক" তত্ত্ব উদ্ভাবন করতেন; কি করে প্রধান বিচারক ট্যাফ্‌ট্ মায়ার্স বনাম যুক্তরাষ্ট্র বিচারটির ও রকম শ্বাসরোধকারী রায় লিখতেন যদি না দ্বিতীয় ধারার প্রথম কথাগুলি সরল ভাষায় সর্বব্যাপী ক্ষমতার কথা না বলতো "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির উপর কার্যনির্বাহক ক্ষমতা অর্পিত হবে"। রাষ্ট্রপতিত্বের পক্ষে এত জোর দিয়ে আর কে কি বলতে পারতেন?

৭। রাষ্ট্রপতি একটি মন্ত্রণাপরিষদ্ দ্বারা ব্যাহত হবেন না সুতরাং তাঁর মনোনয়নের অনুমোদনের জন্য বা ভেটোর সমর্থনে অথবা অন্যান্য কাজের জন্য তাঁকে এ রকম কোন পরিষদের দ্বারস্থ হতে হবে না। সমসাময়িক অঙ্গরাষ্ট্রীয় সব সরকারেরই কিছু কিছু ক্ষমতা এ রকম একটি পুনর্বিবেচনী সংস্থা দ্বারা (Revisionany Council) নিয়ন্ত্রিত হ'তো এবং "বহু কার্য-নির্বাহক" প্রথার অনুকূলে যাঁরা একতাবদ্ধ ছিলেন তাঁরা অন্ততঃ এটুকু দেখতে চেয়েছিলেন যে একক রাষ্ট্রপতিত্ব যেন এ রকম একটি নিয়ন্ত্রণী সংস্থার প্রভাবাধীন থাকে। ম্যাসনের প্রতিবাদ কিন্তু বৃথাই ধ্বনিত হয়েছিল।

কনভেনশনের শেষের দিকে রাষ্ট্রপতিকে একটি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার শেষ প্রবল চেষ্টা পরাহত হল এবং কার্যনির্বাহ বিভাগের ঐক্য সমস্ত আক্রমণ অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হলো।

(৮) সংবিধানের ১নং ধারায় একটি বিধান সন্নিবদ্ধ ছিল যে কোন সরকারী কর্মচারী পদাসীন থাকাকালে ব্যবস্থাপক সভার দুই পরিষদের কোন একটিরই সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন না। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যর্থকাম প্লেস বিল (Place Bill)-এর এই অনুকরণের কারণ, সদস্যরা সম্ভাব্য দুর্নীতি ও পঙ্কিল ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কা পোষণ করেছিলেন। এর ফলে যে কার্যনির্বাহক বিভাগ কংগ্রেসের কাছে কোন ক্রমেই দাবী থাকবে না —রাষ্ট্রবিবর্তনের এই ইতিহাস এবং তার তাৎপর্য স্বাভাবিক ভাবেই সদস্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সংবিধান থেকে এই ধারা তুলে দেবার জন্য যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছিল তা সমান সংখ্যক ভোটে পরাজিত হয়েছিল। জেমস মনরো বা ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স এমন কি টমাস জেফারসনের মতো রাষ্ট্রপতিরা সংবিধানে এই নিষেধাজ্ঞা না থাকলে কার্যনির্বাহক বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের কী নতুন দিকনির্ণয় করতেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র অনুমান করা যায় না।

রাষ্ট্রপতি পদকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য সম্মেলন আরো কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকতো না। কনভেনশন তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারতো, কংগ্রেসের অর্থ-মঞ্জুরী ক্ষমতার উপর রাষ্ট্রপতির ভেটোর ব্যবস্থা করতে পারতো, চার পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে তাদের রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল করতে পারতো এবং কেবলমাত্র সেনেটের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারতো। আমরা ঐ দ্বিতীয় ধারা সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকতে পারি। যখন আমরা লক্ষ্য করি কনভেনশন শেষ হবার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রস্তাবিত সেনেট সন্ধি-চুক্তি, রাষ্ট্রদূত ও বিচারক নিয়োগের সর্বাত্মক অধিকার লাভ করলো, তখনই বুঝতে পারি উইলসন ও মরিসের কাছে সমস্ত ব্যাপারটির কি রকম সুখাবহ পরিণতি গ্রহণ করেছিল।

তাঁদের সম্পাদিত কর্তব্যের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করে সংবিধান প্রণেতৃবর্গ নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন যে কনভেনশন বিরোধীদের কাছ-

থেকে রাষ্ট্রপতিপদ তীব্ররূপে বাধাপ্রাপ্ত হবে, কেন না তাঁদের আশঙ্কার কারণ বাস্তবিকই তখন দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো যখন প্যাট্রিক্ হেনরির এই সাবধান বাণী ধ্বনিত হলো যে শাসন সংক্রান্ত বিভাগের এই নতুন ক্ষমতা 'স্বৈরতন্ত্রের প্রতি অগ্রসর কুটিল কটাক্ষ'। হ্যামিল্‌টন অবশ্যই এই অভিযোগ দৃঢ়রূপে খণ্ডন করেছিলেন। রাষ্ট্রপতিত্বের অনুকূলে উৎসর্গীকৃত তাঁর ফেডারেলিষ্টের এই পংতিগুলিতে তাঁর ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এই নতুন ব্যবস্থার চেয়ে আয়াসসাধ্য আর কিছুই হতে পারতো না। তা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাই এত নির্দয় আক্রমণ ও অপটু সমালোচনার সম্মুখীন হয় নি।

প্রস্তাবিত রাষ্ট্রপতিত্বের প্রজাতন্ত্রী রূপের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিলো এই যে পশ্চিমের অন্যতম নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন; ঐ পদের প্রথম অধিকারী হবেন এবং আমৃত্যু ঐ পদে নির্বাচিত ও পুনর্নিবাচিত হয়ে চলবেন। ফিলাডেল্‌ফিয়ার কার্যনির্বাহক বিভাগের শক্তি ও স্বাধীনতা যে স্বীকৃত হলো তার সঙ্গে ওয়াশিংটনের নির্বাচন বিষয়ক ঐ ধারণার বিশেষ যোগ ছিল। পিয়ার্স বাটলার ইংল্যাণ্ডে তাঁর কোনো আত্মীয়কে কার্যনির্বাহকের ক্ষমতা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে,—"অধিক সংখ্যক সদস্যই মনে মনে চেয়েছিলেন ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতি হন এবং ঐভাবে চিন্তা করেই ওয়াশিংটনের গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিত্বকে ক্ষমতশালী করার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন —এ সম্ভাবনা না থাকলে রাষ্ট্রপতিত্ব এত শক্তিশালী হতো কিনা আমার সন্দেহ আছে।" ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে যাঁরা এর স্বপক্ষে প্রবল বিতর্কের সূচনা করেছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রচেষ্টা এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সহজতর হয়েছিল।

সংবিধান প্রণেতৃবর্গের দ্বারা প্রণীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি পদের আকার কি রকম হয়েছিল, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নেওয়া যাক। সেই সময়ে মানসিক আবহাওয়া বিচার করলে বস্তুত ঐ পদ শক্তি ও স্বাধীনতায় মণ্ডিত হয়েছিল এ কথা বলা যায়। হ্যামিল্টন 'দি ফেডারিলষ্ট'-এ স্পষ্টতই এটি বলেছিলেন, যে রাষ্ট্রপতিপদ শক্তি, ঐক্য, স্থায়িত্ব, যোগ্যতা, জন-সমর্থন ও জন-নির্ভরতাকে সার্থকরূপে সমন্বিত করেছিল। আইন প্রণয়ন বিভাগের বাইরে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্র, মেয়াদী কার্যকাল, অনির্দিষ্টবার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার

সুযোগ, যে উপদেশ তিনি পরিহার করতে চান্ তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার অধিকার এবং বিস্তৃত নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। শাসন চালনা তাঁরই হাতে, তিনিই শাসন অধিকর্তা, আমলাবর্গ তিনিই নির্বাচন করতেন, আইন প্রয়োগ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা সেটা তাঁকেই দেখাশোনা করতে হতো, তিনিই জাতির গৌরবান্বিত শীর্ষ স্থানীয় পুরুষ, করণাময় প্রজাতন্ত্রী রাজা, মৈত্রীমূলক বা শত্রুজনোচিত পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণে তিনি জাতির পরিচালক। ক্ষমতার পৃথকীকরণ—বা Separation of Powers সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের দুই পরিষদভবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তিনি কখনো কখনো উপদেশ দিতে পারতেন, কংগ্রেসের ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির (ভেটো) ক্ষমতা তাঁর ছিল। রাষ্ট্রপতি ছিলেন দৃঢ়, আত্ম-সম্ভ্রম সম্পন্ন, রাষ্ট্র ও সরকারের অ-রাজনীতিক প্রধান। সংক্ষেপে তাঁকে হতে হত একজন জর্জ ওয়াশিংটন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতিত্বের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম আজ তা থেকে খুব স্বতন্ত্র কোন সত্তা এর নেই যদিও চেহারাটা প্রায় শতগুণ পাল্টে গেছে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে তখনকার ধ্যান-ধারণা আজও প্রযোজ্য বরং তাঁর ক্ষমতার পরিধির বিস্তার ঘটেছে। আমরা যদি ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রপতিত্বের সঙ্গে আইজেনহাওয়ারের তুলনা করি তবে দেখতে পাব, এর নানা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপতি আজ অনেক বেশি শক্তিশালী। কংগ্রেসের ক্ষমতার তীব্র সংকোচন সাধিত হয়েছে এঁর মাধ্যমে—বস্তুতঃ শাসনতন্ত্র রচনাকারীদের অভীপ্সাকে একেবারে উল্টে দিয়ে রাষ্ট্রপতিত্ব আজ ক্ষমতার এক বিশেষ কেন্দ্র হিসাবে রূপান্তরিত; এই কেন্দ্রেই কংগ্রেসের ক্ষমতার বিপুল হস্তান্তর সাধিত হয়েছে। এর পরিধি জনসাধারণের উপর পরিব্যাপ্ত, বাস্তবিক-পক্ষে জনসাধারণের উপর এরকম সর্বব্যাপী ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হ্যামিল্টনকে পর্যন্ত বিচলিত করতে পারতো।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর হুইগরাই অত্যন্ত উদ্ধতভাবে দাবী করেছিলেন যে, সর্বজ্ঞ কংগ্রেসের নির্ধারিত নীতিকে কার্যে রূপায়িত করাই হবে রাষ্ট্রপতির একমাত্র কর্তব্য একথা—অনস্বীকার্য, কিন্তু রাষ্ট্রপতিরা সাধারণতঃ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে খুব বেশি একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাপারে বা সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়

ছাড়া। একথা ওয়াশিংটন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যদিও তাঁর রাজস্ব সচিব হ্যামিল্টন স্বীয় কার্যক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র নিয়মানুগ বা শাসনতন্ত্র নিরপেক্ষ ক্ষমতার বলিষ্ঠ প্রয়োগে ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বহিঃপ্রকাশে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না, তবু ধরে নেওয়া হয়েছিল তাঁর এই অনন্য দৃষ্টান্ত উত্তর পুরুষেরা অনুকরণ করবেন না। তবু এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং যোগ্য, রাষ্ট্রপতির হাতে এর বিস্তার ঘটেছে। আইন প্রণেতারূপে, নীতিস্রষ্টা হিসাবে, সর্বাধিনায়কের বেশে বা শাসনকর্তারূপে রাষ্ট্রপতি আমেরিকার গণ-জীবনের সর্বস্তরে স্থায়ী নীতি নির্ধারণে সক্ষম।

এটা সম্ভব হয়েছে কারণ তিনি বিশেষভাবে রাজনৈতিক চেতনাবিশিষ্ট এক নেতা। এই রূপান্তর অবশ্য শাসনতন্ত্র রচনাকারীদের বিস্ময় ও ক্ষোভের কারণ হতো। জেফারগণ এবং তাঁর উত্তর সাধকরা যেভাবে দলগত রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন তা আমাদের কাছে অনতিক্রমনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু শাসনতন্ত্র রচনাকারীরা ব্যাপারটাকে মোটেই—এভাবে দেখেন নি। তাঁরা যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন যে আমেরিকার প্রয়োজন এক দেশভক্ত রাষ্ট্রপতির, যিনি ধীর মস্তিষ্কে দলীয় স্বার্থ সঞ্জাত উত্তাপের উর্ধে বিচরণে সক্ষম হবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এটা চান নি যে এক রাজতন্ত্রের কাঠামো এখানে প্রজাতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্থাপিত হবে—বিশেষতঃ এমন এক রাজতন্ত্র যা তৃতীয় জর্জের মত দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ আবর্তে বিঘূর্ণিত হবে।

আর একটি পরিবর্তনও শাসনতন্ত্র রচনাকারীদের ক্ষোভের কারণ হতো, যদিও এঁদের মধ্যে কিছু লোক এর আগমন ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন : আমি বলছি রাষ্ট্রপতিত্বের গণতান্ত্রিক বিবর্তনের কথা। নির্বাচনের সময় ছাড়া অবশ্য বোঝা যায় না যে তিনি কি বিপুল পরিমাণে জননেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৮৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলে আসছে তার সঙ্গে যদিও ওয়াশিংটনের সময়কার গাম্ভীর্যপূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত, অরাজনৈতিক প্রচার অভিযানের তুলনা করি তবে বুঝতে পারবো যে আমেরিকার জনতা রাষ্ট্রপতিত্বকে কী পরিমাণে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ বলে মনে করে।

মূলতঃ, ওয়াশিংটনের সময় থেকে এই শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিত্বের এত মর্যাদা ছিল না। রাষ্ট্রপতিত্ব মর্যাদামণ্ডিত হয়েছিল কারণ ওয়াশিংটন

ছিলেন রাষ্ট্রপতি, আজ কিন্তু বিপরীত অবস্থা লক্ষ্যণীয়। আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার ফলেই বিরাট পুরুষে পরিণত হন কারণ রাষ্ট্রপতিত্বের মর্যাদা আজ রাষ্ট্রপতির উপর প্রতিফলিত। আমরা সহজেই ভুলে যাই যে শাসনতন্ত্রের প্রথম অর্ধশতাব্দীর বেশীর ভাগ সময়েই কংগ্রেস কখনো নিম্ন পরিষদ কখনো বা সেনেট—ছিল জনসাধারণের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে মনযোগের কেন্দ্রস্থল। আজকের রাষ্ট্রপতিত্বের নাটকীয়ত্বের ছদ্মাংশও তখনকার রাষ্ট্রপতিত্বে পরিলক্ষিত হতো না।

এ সব দেখে আমার মনে হয় যে আমেরিকার শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা ও মর্যাদার বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি সব সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি—এরও জোয়ার-ভাটা ছিল। ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রপতির পর অনেক দুর্বল রাষ্ট্রপতি এসেছেন, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতির অবসর গ্রহণ প্রাক্কালে কংগ্রেস স্বীয় ক্ষমতা জারি করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীদের ঈপ্সিত ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। তবু এ ধরণের ভাঁটা যতটা দৃষ্টিগোচর হতো ততটা কার্যকরী হতো না—প্রত্যেক ক্ষমতাপ্রিয় নতুন রাষ্ট্রপতিই তাঁর পূর্ববর্তী ক্ষমতাশালী পদাধিকারীর পথ অনুসরণ করতেন। লিঙ্কন নিয়েছিলেন জেফারসন ও পোলকের দীক্ষা, পিয়ার্স বা বুকাননকে অনুসরণ করার কোন চেষ্টা করেন নি তিনি। ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্ট তাঁর পূর্ববর্তী তিন ব্যর্থকাম রাষ্ট্রপতির ছবি ডিঙ্গিয়ে উইলসনের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজেছেন। থাড্‌ডাস ষ্টিভেন্স, বেন ওয়েড, শুলার কোলফ্যাক্স এবং তাঁদের বন্ধু ও উত্তরাধিকারীদের হাতে রাষ্ট্রপতিত্বের কী হাল হয়েছিল সে সম্বন্ধে হেনরি জোনস ফোর্ডের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

যদিও কখনো কখনো কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতার কাছে কোন কোন রাষ্ট্রপতি পরাভূত হয়েছিলেন, তবু, রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতার উৎসমুখ ছিল অব্যাহত, এবং যখনই এ রকম অস্বাভাবিক চাপ অপসৃত হয়েছে তখনই এ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ইতিহাসের পাতায় রাষ্ট্রপতিত্বের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে—এই বিবর্তন বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য ভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতিত্ব কি করে এত প্রত্যাঘাতশীল ও অটুট প্রমাণিত হলো? কি করে কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতা ও মর্যাদার দীর্ঘ লড়াই-এ হারিয়ে

দিলো? আমেরিকার ইতিহাসেই এর উত্তর নিহিত আছে। আমাদের ইতিহাসের কয়েকটি মূল ঘটনার বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রপতিত্বের পরাক্রমের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব হবে।

প্রথম কারণ সক্রিয় সরকারের উৎপত্তি। এই সরকার আমেরিকার সর্বাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত, উৎসাহিত এবং পরিচালিত করে। এই সঙ্কোচনশীল পৃথিবীতে দেশরক্ষার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। এই শিল্পোন্নতির সঙ্গে আমাদের সভ্যতা সহস্র সমস্যা নিয়ে এসেছে; আমেরিকার জাতীয় জীবনে তার প্রভাব কিছু কম নয়। দেশবাসী বার বার জাতীয় সরকারের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য চেয়েছে। জাতীয় মহাসভা তাতে সাড়াও দিয়েছে, কখনো ব্যস্ততা সহকারে কখনো বা মন্থরভাবে। অনেক আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে কংগ্রেসকে, এইজন্য, এবং সে সব আইন আমাদের জাতীয় জীবনকে এমনকি আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই সব আইন কার্যকরী করতে কংগ্রেসকে বিশলক্ষ সরকারী চাকুরি সৃষ্টি করতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় সরকার কথাটার অর্থ হলো প্রশাসনধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং যদিও অধিকাংশ শাসনসংক্রান্ত কাজই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ রাষ্ট্রপতির খবরদারির আওতার বাইরে সম্পাদিত হয়, অধিকাংশই তাঁর নামে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। তা ছাড়া আমি আগেও একথা বলেছি যে কংগ্রেসের কোন আইনই নতুন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন স্বাধীন ক্ষমতা দিতে পারে না যার ফলে রাষ্ট্রপতির "আইন যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না" তা দেখার যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা আছে তার সীমায়ন ঘটতে পারে। আমাদের সংবিধান কতকগুলি বাধা-নিষেধের আওতার মধ্যে বদ্ধ না থেকে যে ঐতিহাসিক প্রতিসরণ করেছে তার ফলে রাষ্ট্রপতি একজন প্রধান কর্মচারী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শিল্প-নির্ভর জাতি হিসাবে আমাদের উন্নতির ফলে রাষ্ট্রপতিকে শাসন কর্তৃত্বের এমন আসনে বসিয়েছে যার নজির বিরল। বাস্তবিক তাঁর ক্ষমতা এত অধিক যে তিনি তা ব্যবহারের সুযোগ পান না।

আজকে আমেরিকা সম্বন্ধে কোন বই—সম্পূর্ণ হবে না যদি তাতে Alexis-de-Tocqueville-র সুচিন্তিত কয়েকটি মন্তব্য যোগ করা না হয়। তাই আমি সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদের উক্তির উদ্ধৃতি করে রাষ্ট্রপতি পদের এই বিরাটত্বের

দ্বিতীয় কারণ দেখাতে চাই। সরকারী শাসনের অনিয়মিত বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে Tocqueville বলেছেন :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত ব্যাপারেই কেবল জাতির শাসন-সংক্রান্ত বিভাগ তার বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পায়। যদি রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা যায়, যদি তার মূল লক্ষ্য হয় অন্যান্য শক্তিশালী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তবে সরকারী শাসন ক্ষমতা প্রয়োজনের অনুপাতে বেশি গুরুত্ব পাবে।

যতদিন পর্যন্ত আমেরিকা পৃথিবীতে নিষ্ক্রিয় জাতি ছিল, কংগ্রেসই সরকারী ব্যাপারে ততদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ নিতে পারতো। জগতে আমাদের প্রধান শক্তিতে আত্ম উত্তোলন উনিশ শতকের সেই ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। থিওডোর রুজভেল্ট-এর রাষ্ট্রপতিত্বের শেষ বছর সম্পর্কে বলতে গিয়ে উড্রু উইলসন বলেছেন :

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে রাষ্ট্রপতির এতকাল যে গৃহীর রূপ দেখেছি তা আর দেখা যাবে না। জাতি এখন শক্তি ও সমৃদ্ধিতে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। পৃথিবীর অন্য সকল রাষ্ট্র এর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে কিছু থাকে ঈর্ষা কিছু থাকে ভয়। আর থাকে এই বিরাট শক্তি সামর্থ্য নিয়ে কি করবে এই দুশ্চিন্তা। এখন থেকে আমাদের রাষ্ট্রপতি সর্বদাই প্রধান ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনেতাগণের অন্যতম বলে গণ্য হবেন—তাঁর কার্যধারা মহান বুদ্ধিপ্রদীপ্ত যাই হোক না কেন। ভবিষ্যতে আমরা কখনোই রাষ্ট্রপতিকে কেবলমাত্র আমেরিকার শাসনকর্তারূপে দেখতে পাব না, তিরিশ ও চল্লিশ দশকের সেই দিন চিরতরে চলে গেছে যখন তিনি কেবল কার্যনির্বাহক ছিলেন। আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানে যিনি এই পদ অলঙ্কৃত করবেন তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারাই পদের মর্যাদা নির্ধারিত হবে।

এ কথা সুনিশ্চিত যে অতি প্রভাবশালী বা বৃহত্তর কেউ আমেরিকাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন থেকে নাবাতে বা রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন করতে পারবে না। হার্ডিঞ্জ অথবা পিয়ার্স অথবা ফিল মোরেরা এমন কি থাড ষ্টিভান্সের নেতৃত্বে কংগ্রেসের র‍্যাডিকাল রিপাব্লীকানদের একদল সন্ধি-স্থাপন বা শক্তি প্রয়োগে তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে কংগ্রেসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য; এই ব্যাপারে সে তত্ত্বাবধানও করতে পারে, কিন্তু

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে আর আপত্তি করতে পারে না। আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধরূপে একথা মানতে পারি যে একটি রাষ্ট্র আর একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যত সম্পর্কযুক্ত হবে ততই তার শাসনবিভাগ শক্তিশালী হবে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে আমাদের প্রবেশ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষার নীতি যখনই আমরা গ্রহণ করেছি তখনই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা স্থায়ীভাবে স্ফীত হয়ে গিয়েছে। পৃথিবী যত ছোট হবে তাঁর ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাবে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধির একটি আনুষঙ্গিক কারণ হচ্ছে বিগত শতাব্দীর কয়েকটি আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক জরুরী অবস্থা যা আমাদের সহ্য করতে হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি স্মর্তব্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আর একটি স্বতঃসিদ্ধ তাহলে এই হবে: নিয়মতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রে বড় কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রথমে সব সময়েই সাময়িক ভাবে কিন্তু পরে প্রায়শঃই স্থায়ীভাবে এই বৃদ্ধি ঘটে। এই মতের স্বপক্ষে রাষ্ট্রপতির হটাৎ ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে গৃহযুদ্ধের সময়ে লিঙ্কনের কথা, উইলসনের সময়ে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া অথবা অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিকারের জন্য ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট কংগ্রেসের কাছে যে বিশেষ ক্ষমতা চেয়েছিলেন সে কথা ভাবলেই চলবে। সংকটত্রাতা এই রাষ্ট্রপতিরা প্রত্যেকেই এই পদকে আগের চেয়ে বেশী শক্তিশালী করে গেছেন। সাধারণ অবস্থায় সাধারণ রাষ্ট্রপাতগণের কথা ও আমাদের ভুললে চলবে না কারণ তাঁদেরও নিজ নিজ দান কম নয়। ১৮৭৭ সালে হেস (Hayes) রেলওয়ে ধর্মঘট শান্ত করতে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। বক্সার বিদ্রোহের সময় ম্যাককিনলি (Mckinly) পাঁচহাজার নৌ ও স্থল সৈন্য চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন এবং হ্যারি ট্রুম্যান (Hary Truman) বহুসময়ে বন্যা, ঝড় বা অগ্নিকাণ্ড থেকে একটা রাজ্যকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন —এই সব সময়ে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল কারণ জনগণ তাঁর কাছে অনেক কিছু প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

বহুদিন ধরে কংগ্রেসের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বেড়েছে। আগেই বলেছি, সংবিধান রচনাকারীগণ চেয়েছিলেন কংগ্রেসই হবে আমাদের ভারকেন্দ্র। রাষ্ট্রপতিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা তাঁকে দক্ষ করে তোলার জন্য নয়; যাতে তিনি নিজ বৃত্তের পরিধি থেকে বেড়িয়ে

আইনসভার সার্বভৌম শক্তির ঘূর্ণিবাত্যায় নিজ সত্তা বিসর্জন না দেন তাঁর জন্যই তাকে স্বতন্ত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সংবিধান প্রণেতাগণ আমাদের প্রজাতন্ত্রের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির দিক ভেবে দেখেন নি। এর ফলে কংগ্রেস সদস্য বহুল, ক্লিষ্ট দুইটি সভায় পরিণত হয়েছে যাদের কথা ও কাজে কোন সামঞ্জস্য নেই। নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রে কংগ্রেস একটি অতীব শক্তিশালী অংশ —আমেরিকাবাসীগণ-এর জন্য গর্ব বোধ করতে পারেন। কিন্তু এই সংস্থার গঠন, আইন এবং উদ্দেশ্য এমন যে যদিও কোন কোন কাজ সে ভালভাবেই করতে পারে, অন্যান্য কাজ যৎসামান্যই পারে। বাইরের নেতৃত্ব, যা শুধু রাষ্ট্রপতির কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব, না পেলে তার পক্ষে বড়ো কিছু কাজ নিষ্পন্ন করা অসম্ভব। ১৯২১ সালে কংগ্রেস বাজেট প্রস্তুত করার প্রাথমিক দায়িত্ব যখন পুরোপুরি ছেড়ে ছিল তখন রাষ্ট্রপতির সাহায্য ভিক্ষা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। বহুদিনের এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করার ফলে রাষ্ট্রপতির হাতে অসীম ক্ষমতা এসে গেল। এতে তাঁরপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধাই হলো না, ব্যবস্থাপক প্রণালীর উপরও কর্তৃত্ব এসে গেল।

সত্যের গতি আরও গভীরে। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা না বাড়িয়ে নিজ ক্ষমতা কার্যকরী করতে পারে না। কতকগুলো স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের (Commission) সৃষ্টি করে সেগুলোর হাতে নতুন আইন কার্যকরী করার অধিকার অর্পণ করায় কংগ্রেসীয় ক্ষমতারও একটি সীমা আছে, সুতরাং নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার জন্য যে প্রচেষ্টা কংগ্রেসের তরফ থেকে হয় তার লাভটা যায় রাষ্ট্রপতির ঘরে—তাঁর ক্ষমতা এতে বাড়ে। ১৯৪৭ সালের Tafk Hardley বিধির ২য় ধারা (Title II) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যা দিয়ে বোঝা যাবে যে কংগ্রেস নিজের ক্ষমতা বাড়াতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কি করে বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। জোসেফ ডব্লিউ মার্টিন এবং রবার্ট এ. ট্যাফটের নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেসের মতো খুব অল্প সংখ্যক কংগ্রেসই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখেছে। তবুও শ্রমিকসঙ্ঘগুলোকে বশে আনার জন্য আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে তাদের অনেক নতুন ক্ষমতা দিতে হয়েছে। যাতে তিনি গুরুতর ধর্মঘটের সময় উচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। সমস্ত

আলোচনাকে আরেকটু সুখকর করার জন্য টুম্যানের-এর উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি সংসদের উভয় কক্ষ থেকে দুই তৃতীয়াংশের বেশী ভোটে ক্ষমতা আদায় করে নিয়ে দশটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনিপুণ ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি আজ যে ক্ষমতার আসীন তার জন্য কংগ্রেসের দান কম নয়, সে দান ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক।

হেনরী জোন্‌স ফোর্ড মার্কিননীতির উত্থান এবং বৃদ্ধি তাঁর (Rise and growth of American Policies (1898)। বইতে বলেছেন যে আমেরিকার গণতন্ত্রই সব চেয়ে বড় কারণ যা রাষ্ট্রপতিকে মর্যাদার এবং ক্ষমতার এই আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৭৮৭ সালের যাঁরা রাষ্ট্রপতি পদ-মর্যাদার বিরোধী ছিলেন তাঁরা হুইগ ধারণার বশবর্তী হয়ে বিশ্বাস করতেন যে আইন প্রণয়ন সভাই হচ্ছে জনপ্রিয় সংস্থা এবং কার্যনির্বাহক বিভাগের প্রকৃতি অনেকটা রাজকীয়। গভর্ণর মরিসের মত খুব অল্প সংখ্যক লোকই তখন ভাবতে পেরেছিলেন যে গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কয়েকটি ক্ষমতাশালী লোকের প্রভাবাধীন ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে দাঁড়াবেন। তিনি যখনই ভেবেছিলেন যে কয়েকজন ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী লোকই এই ব্যবস্থাপক সভা অধিকার করে বসবে এবং রাষ্ট্রপতি হয়ে দাঁড়াবেন জনসাধারণের রক্ষক। বাস্তবিকই মরিসের ভবিষ্যৎবাণী সফল হতে মাত্র ৪০ বছর লেগেছিল। এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন সময় হতে রাষ্ট্রপতির পদ সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক পদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে। রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার জন্য জনগণের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করেন, তাঁদের আস্থা হারালে এঁর ক্ষমতারও সঙ্কোচ হয়। আমার নিশ্চিত ধারণা, গণতান্ত্রিক ভাবধারার অভ্যুদয় ও জ্যাকসনের হাতে রাষ্ট্রপতিত্বের পুনর্বাসনের ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িকতার মধ্যে একটা গভীর কার্য-কারণ যোগ ছিল। যে প্রবল গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বের ফলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদলাভ করেছিলেন তাই তাঁকে পরে জনসাধারণের নামে বলিষ্ঠভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের রাষ্ট্রপতিগণ কখনই কংগ্রেসের সাথে বারবার সার্থক দ্বন্দ্বে নামতেন না যদি না তাঁরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত না হতেন। আমেরিকার গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিত্ব সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রয়োজনীয় অংশ। তাই তিনি যত বিরাট কিছুই করুন না কেন আমেরিকার জনগণের কাছে তা

কখনও বিস্ময়াবহ নয়। সত্যি বলতে কি গণতান্ত্রিক উপায়ে গণতন্ত্র রক্ষার্থে রাষ্ট্রপতি যদি কিছু করেন তবে তার শক্তির সীমা নেই।

রাষ্ট্রপতিত্বের এই বিবর্তনের পক্ষে যে সব শক্তি সাহায্য করেছিল তাদের সম্বন্ধে বক্তব্য নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে কিন্তু এখন আমি রাষ্ট্রপতি পদাধিকারীদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সক্রিয় রাষ্ট্রের সংগঠন বা আমাদের বিশ্ব নেতৃত্ব, যুদ্ধকালীন সংকট বা যুদ্ধোত্তর আর্থিক মন্দাবস্থা, কংগ্রেসের সংকট অথবা গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি এই সব প্রবল শক্তিসমূহের কোন কিছুই রাষ্ট্রপতিত্বের উপর কোন প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হ'ত না যদি না শক্ত, সজাগ এবং যোগ্য ব্যক্তিরা এই সম্মানিত পদ অলংকৃত করতেন এবং তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটনার রূপ দিতেন। অতীতের রাষ্ট্রপতিদের ছায়া সর্বদাই বর্তমান রাষ্ট্রপতির কর্মপদ্ধতির মধ্যে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রতিফলিত হয়। যদি তাঁর পূর্ববর্তীরা অতীতে কিছু না করে থাকেন তবে বর্তমান পদাধিকারীর পক্ষে সে সব কিছু করতে গেলে প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হবে। রাষ্ট্রপতিরাও রাষ্ট্রপতিত্বের বিবর্তনে সাহায্য করেছেন, অতএব এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রপতিদের প্রধান কাজ সম্বন্ধে আলোচনায় বৃত হতে চাই।

সেই আটজন রাষ্ট্রপতি কে বা কারা তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছয়জন রাষ্ট্রপতির কথাও স্মরণযোগ্য যারা কংগ্রেসের প্রাধান্যকালে রাষ্ট্রপতিত্বের পক্ষে শক্ত লড়াই চালিয়েছিলেন। এ কথা মনে রাখা ভাল যে আমি এঁদের রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিচার করছি, এবং রাষ্ট্রপতিত্বের বিবর্তনে এঁদের অবদানের মূল্যায়নে সচেষ্ট হচ্ছি। হারভার্ট হুভার মানুষ হিসাবে যতটা বড়ো ছিলেন, রাষ্ট্রপতি হিসাবে ততটা ছিলেন না এবং ১৮০৯ ও ১৮১৭ সালের ভুলের ফসল জেমস ম্যাডিসনের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কিছুমাত্র খাটো করতে পারেনি।

জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম পদাধিকারী বলে বড়ো রাষ্ট্রপতিত্বের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে সক্ষম হয়েছিলেন যদিও এই তাঁর সম্পূর্ণ চিত্র নয়। তাঁর আটবৎসর ব্যাপী কার্যকলাপের সার্থক মূল্যায়নে একথা বলতে হবে যে তিনি সংবিধানের স্বপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন ও এর সমালোচকদের আশংকা দূরীভূত করেছিলেন এবং এই দুই কাজেই যে সাহস ও দক্ষতা

দেখিয়েছিলেন তাই তাঁকে সম্ভাব্য প্রথম রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্যতম বলে চিহ্নিত করেছিল।

সংবিধানের পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রত্যাশা ছিল যে এক উৎসাহী শাসকের সৃষ্টি ক'রে এবং তাকে সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আইন সভার প্রভাবের বাইরে স্বাধীন কর্মক্ষমতা দিয়ে এমন এক শক্তির সৃজনে সহায়তা করা যার অভাব কনফেডারেশনের আর্টিকেলগুলির মধ্যে শোচনীয়রূপে পরিলক্ষিত হয়েছিলো—সে হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইন দৃঢ়তার সঙ্গে ও দ্রুত কার্যকরী করার ক্ষমতা। নীতি প্রণয়নে ও তার প্রয়োগে যে ক্ষমতার প্রয়োজন সেই ক্ষমতার তীব্র অভাব অনুভব করেছিলো এই নতুন প্রজাতন্ত্র। ম্যাডিসন, এলসওয়ার্থ ও কংগ্রেসের অন্যান্য ভদ্রলোকেরা সংবিধানের প্রথম ধারার যে ভাষ্য করেছিলেন তার ফলেই প্রথম অভাবের প্রতিকার হয়, দ্বিতীয় অভাবের নিবৃত্তি ঘটে ওয়াশিংটন কৃত সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার ভাষ্যে। তিনি নিশ্চয়ই রুজভেল্ট অথবা ট্রুম্যানের মতে আদর্শ রাষ্ট্রপতি ছিলেন না। যে সমস্ত ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত দেওয়া দরকার, সে সমস্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে তিনি বিরক্তিকরভাবে দীর্ঘ সময় নিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে যদিও তিনি জানতেন যে এরা তাঁদের বিরূপ মন্তব্য দিয়ে সমস্যাকে আরও ধোঁয়াটে এবং বিলম্বিত করবেন তবু তিনি হ্যামিলটন ও জেফারসনের পরামর্শ উপজীব্য সমস্যা সম্বন্ধে যাজ্ঞা করেছিলেন। তিনি অবশ্য জানতেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত এমন সব ঐতিহ্যের সৃষ্টি করবে যা তাঁর মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরেও যাঁদের জন্ম হবে না তাঁদেরও প্রভাবান্বিত করবে, এই উপলব্ধিই তাঁকে তাঁর কাজে সতর্ক হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। অবশ্য যখন তিনি কার্যে প্রবুদ্ধ হতেন তখন সাহস ও আস্থা নিয়েই প্রবুদ্ধ হতেন। তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তিনি সব সময়েই দৃঢ় কার্যব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্মবিমুখতার নয়। সংবিধান যে সব ব্যাপারে তাঁর এবং কংগ্রেসের মধ্যে কার্যসীমা সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছে সে সব ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি এগিয়েই গেছেন, পিছিয়ে পড়েন নি। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারেও তিনি গোটা বারো এমন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন যা পরবর্তীকালের পরাক্রমশীল কংগ্রেসও খর্ব করতে পারেন নি—উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—প্রজাতন্ত্রী ফরাসী দেশকে স্বীকৃতিদান, নিরপেক্ষতার ঘোষণা, ফরাসী মন্ত্রী গেনের (Genet) সম্বর্ধনা ও

পদচ্যুতি, জে (Jay)-এর চুক্তি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা, শাসন সংক্রান্ত বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ ও নিম্নপরিষদে কূটনৈতিক পত্রাবলী প্রেরণে অনিচ্ছা। হ্যামিলটনের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে তিনি হয়েছিলেন একজন প্রভাবশালী আইন প্রণেতা; তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে নিপুণ কার্যাধ্যক্ষ করে তুলেছিলো এবং তাঁর নিজের কাজের ফলেই তিনি এমন এক রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন যার তুলনায় সমস্ত রাজদণ্ডধারীরা নিতান্তই মেষশাবকের মতো প্রতীয়মান হতেন।

সংবিধানের সমালোচকদের ভয় ছিল দ্বিতীয় ধারায় কার্যনির্বাহকের যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ভবিষ্যতে কার্যনির্বাহক বিভাগের স্বাধীনতা ও প্রতাপের উৎস হয়ে উঠবে, এবং অন্যান্য সমস্ত জনপ্রিয় সরকারের মতো আমেরিকার সরকারও স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করবে। এ রকম বিপর্যয় যে হয়নি তার নানা কারণ ছিল, জনসাধারণের রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান স্বাধীনতার ব্যাপক আবেদন, বিরোধীদলের জাগ্রত প্রতিরোধ, শাসনতান্ত্রিক উৎকর্ষ এবং সর্বোপরি প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বপক্ষে ওয়াশিংটনের অনন্য আনুগত্য। সংবিধানের সংশয়মূলক বিধানুযায়ী এক আস্থাহীন কার্যাধ্যক্ষের পদ প্রথম পূরণ করা সহজসাধ্য ছিল না, সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য জন-দাবী প্রবল হয়ে উঠতে পারত যদি তিনি দু তিনটি মারাত্মক রকমের ভুল করতেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের তাঁর কার্যপরিধি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম মাত্রাবোধ ছিল, তিনি মারাত্মক রকমের কোন ভুলই করেন নি। তিনি সংবিধানের আওতার মধ্যেই পুরোপুরি কাজ করে গেছেন এবং 'ফেডারালিষ্ট'-এ হ্যামিলটন যে কথা বলে গিয়েছিলেন—কার্যনির্বাহক বিভাগের ক্ষমতা প্রজাতন্ত্রী সরকারের অভিব্যক্তির সঙ্গে সুসমঞ্জস—সে কথার যাথার্থ বারবার প্রমাণ করেছেন। জেফারসন তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে লিখেছিলেন—

—"চিন্তার দিক থেকে তিনি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না, এই মতবাদের যাথার্থ প্রমাণিত হয় ওয়াশিংটনের মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সঠিক মতবাদের মধ্য দিয়ে এবং ঐ অধিকার অর্জনের জন্যে তাঁর কঠোর নীতিবোধের মধ্য দিয়ে"।

ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রপতিত্ব যদি একনিষ্ঠভাবে শাসনতন্ত্রানুগ না হয়ে থাকে তবে তা কী?

ওয়াশিংটন যদি রাষ্ট্রপতিত্বের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পরাঙ্মুখ হতেন তবে প্রচণ্ড জুয়োখেলার কী ফল হতো বলা সহজ তো নয়ই, আনন্দদায়কও নয়। তিনি মাউণ্ট ভারনন (Mount vernon)-এ থাকতে চেয়েছিলেন একান্ত-ভাবেই এবং তাই যদি থাকতেন তবে সম্ভবতঃ জন এডাম্‌স্ বা জন রুট্‌লেজ অথবা জন জে বা জর্জ ক্লিনটন আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি হতেন এবং তার ফলে শাসনতন্ত্রের মৃত্যু ঘটা অসম্ভব ছিল না। কার্যনির্বাহক বিভাগের শক্তি ও সংযমের ভারসাম্যের জন্য যে সব গুণ থাকা দরকার, আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রপতি পদাধিকারীদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটনের মতো এত বেশী পরিমাণে সে সমস্ত গুণের অধিকারী আর কাউকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। নতুন এই প্রজাতন্ত্রের বিরাট ভাগ্য যে ওয়াশিংটন দেখিয়ে গিয়েছেন ক্ষমতা মানুষকে যেমন মহান করে তুলতে সক্ষম তেমনি সক্ষম অমানুষ করতে। আমেরিকার শাসনতন্ত্রানুগ রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রপতিত্বের যথার্থ স্থান নির্দেশ তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

এ-ছাড়াও তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে সংবিধানকে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন, তার ফলে আমেরিকার জনসাধারণের পক্ষে সংবিধানকে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। পেনসিলভেনিয়ার সেনেটর মাক্‌লে প্রমুখ ব্যক্তিরা অবশ্য ওয়াশিংটনের "দরবার"-এর জাঁকজমক দেখে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন কিন্তু তাঁরা ওয়াশিংটনের মতো পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাননি যে গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে আড়ম্বর কমিয়ে ফেলা যায় সত্যি কিন্তু একেবারে বর্জন করা যায় না। জন এডাম্‌স কিন্তু এ কথাটা বুঝেছিলেন এবং ওয়াশিংটনের মৃত্যুর বহু বছর পরে বেঞ্জামিন রাসকে লিখেছিলেন :

—ওয়াশিংটন এই কৌশল বেশ ভালই আয়ত্ত করেছিলেন, এবং আমরা একথা তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারি যে তিনি যদি সর্বোত্তম রাষ্ট্রপতি না হয়ে থাকেন, রাষ্ট্রপতিত্বের ভূমিকায় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। যখন সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর নিলেন তখন যে ভাষায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, যখন তাঁর "কমিশন" থেকে পদত্যাগ করবার জন্যে কংগ্রেসের কাছে ভাবগম্ভীর আবেদন জানিয়েছিলেন, যখন রাষ্ট্রপতিত্ব থেকে অবসর নিয়েছিলেন তখন জনসাধারণের কাছে যে বিদায়বাণী প্রচার করেছিলেন সে সমস্তের মধ্যেই সেক্‌সপীয়ার ও গ্যারিকেল সুলভ নাটকীয়ত্বের অভিব্যক্তি ছিল।

এমন কি প্রজাতন্ত্রী দলের অনুবর্তীরা এ কথা অস্বীকার করতে পারতেন না যে ১৭৮৯-এ নিউ ইংল্যাণ্ডে এবং ১৭৯১-তে দক্ষিণের অঙ্গরাষ্ট্রগুলিতে তাঁর সাড়ম্বর শোভাযাত্রা জনসাধারণের মনে সংবিধান সম্বন্ধে আস্থা অর্জণে সহায়তা করেছিলো এবং রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের উৎসাহিত করেছিলো। এই সাড়ম্বর শোভা যাত্রার প্রথমেই তাঁকে মাসাচুসেট্‌স্‌-এর গভর্নর জন হ্যানকক-এর সঙ্গে এক ভদ্ররকমের শক্ত লড়াই করতে হয়েছিলো, হেতু—ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই চিরন্তন প্রশ্ন কে কার সঙ্গে আগে দেখা করবেন? এই দ্বন্দ্বের তীব্রতার জন্য তাঁর প্রথম দুদিন বোষ্টনেই কেটে গেল কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় দাবি করলেন যে হ্যানককেই প্রথমে এসে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে হবে এবং তাঁর মতই শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হলো। জাতীয় সরকার তথা রাষ্ট্রাধিপতির মর্যাদার যে বৃদ্ধি এ প্রক্রিয়ায় সঞ্জাত হলো তার ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জন হ্যানককের আত্মসমর্পন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে হুইস্কি আন্দোলন আইনের সাহায্যে দমনের যে দুটি নজির ছিল তা আইজেনহাওয়ারকে ১৯৫৭-এ লিটল রক্ সঙ্কটের সময়ে যথেষ্ট মানসিক বল জোগান দিয়েছিল।

রাষ্ট্রপতিত্বের এবং প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল, মহত্ত্ববোধ, কর্তৃত্ব ও সংবিধানুবর্তিতা এবং এর মধ্যে সংবিধানুবর্তিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় ইচ্ছা করলে তিনি রাজা হতে পারতেন, কিন্তু আরো মহৎ হবার ইচ্ছাই পোষণ করেছিলেন—তিনি হয়েছিলেন যথার্থই প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রাধিনায়ক। তাঁর প্রারম্ভিক রাষ্ট্রীয় বক্তৃতায় তাঁর নির্বাচনের অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ ভাষা পেয়েছে:

"আমেরিকার জনসাধারণ যে পরীক্ষা হাতে নিয়েছেন তার যথার্থ লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতার পূতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা এবং প্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার রূপায়ন করা"।

ওয়াশিংটনের মহত্ত্ব তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কখনোই আমেরিকার লক্ষ্য হিসাবে এই মহতী চিত্রকে ম্লান হতে দেন নি। জেফারসন কৃতজ্ঞতায় লিখেছিলেন—"ওয়াশিংটন মুখ্যত সামরিক ও অসামরিক আইনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখিয়ে আকারে ও প্রকৃতিতে একেবারে নতুন এই শিশু রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছিলেন বিজ্ঞতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে।" পাছে আমরা ভুলে যাই ওয়াশিংটনও একজন মানুষ ছিলেন, আমি

সেনেটর উইলিয়াম ম্যাক্‌লের প্রশংসনীয় সাময়িকী থেকে একটি দৃশ্য তুলে ধরছি যেখানে কংগ্রেস সদস্যদের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক ঘটনা বিবৃত আছে :

রাষ্ট্রপতি তাঁর উত্তরলিপি কোটের পকেট থেকে নিলেন। তাঁর চশমা তাঁর জ্যাকেটের পকেটে ছিল, টুপি ছিল তাঁর বাঁ হাতে আর কাগজ ডান হাতে। যত জিনিস তিনি হাতে রাখতে পারতেন তার চেয়ে বেশী তাঁর হাতে ছিল। তিনি তাঁর টুপিটিকে বাহু আর বাঁদিকের বুকের কাছে ধরলেন। কিন্তু চশমার খাপ থেকে চশমা নিতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি চশমার খাপটাকে চিমনির উপর ধরে এই অসুবিধা এড়িয়ে গেলেন। চশমাটাকে ঠিক করে যা তাঁর ব্যস্ত হাতের পক্ষে খুব সহজ ছিল না, খুব ধীর সংযতভাবে উত্তরটি পাঠ করলেন।

জেফারসনের রাষ্ট্রপতিত্ব ইতিহাসের এক পিচ্ছিল অধ্যায়। মানুষ হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহৎ ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে খুব সুবিধার ছিলেন না। তাঁর চিরস্থায়ী কৃতিত্ব, যে তিনি এমন এক কার্যালয়ে প্রজাতন্ত্রবাদ প্রবেশ করিয়াছেন যা রাজতন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলো। লুসিয়ানা কিনতে গিয়ে যে শ্বাসরোধকারী ক্ষমতা প্রয়োগ তাঁকে করতে হয়েছিল (যা তাঁর নিজেরও দম শেষ করে দিয়েছিল) এবং বার (Burr) বিচারে জর্জ মার্শালের রায় অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রপতিত্বের যে স্বাধীনতা তিনি ঘোষণা করেছিলেন তাই তাই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

তাঁর সবচেয়ে বড়দান রাষ্ট্রপতিপদটিকে একটি রাজনৈতিক কার্যালয়ে পরিণত করা এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করা, এবং সত্যিই এই জায়গাতে জেফারসনের (Jafferson)-এর সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব। দলের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এবং তাঁকে নেতৃত্ব দিয়ে কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত করায় তাঁকে আমরা একজন কৃতী রাষ্ট্রপতি হিসাবেই গণ্য করি। অধ্যাপক বিঙ্কলি (Binkly) লক্ষ্য করেছেন যে অতো তৎপরতার সঙ্গে কংগ্রেসকে দিয়ে একদিনের মধ্যে (২২শে ডিসেম্বর ১৮০৭) Embargo বিধির মতো বিধি সম্পাদন করিয়ে নেওয়া আর কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি তাঁর পদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন অন্যান্য দুর্বল মানুষের হাতে তা রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতাহ্রাসেরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ তাঁদের তো আর তাঁর মতো

দলনেতার ও নীতিগত বিরোধ মীমাংসার দক্ষতা ছিল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের ফলাফল যখন অনিশ্চিত সেই সময়ে জন মার্শাল হ্যামিলটনকে এক চিঠিতে জেফারসনের পদ্ধতি ও প্রভাব সম্বন্ধে এক উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন :

আমার মনে হয় জেফারসন প্রতিনিধি পরিষদের সঙ্গে (House of Representative) বেশ মানিয়ে চলতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিত্বকে খর্ব করে তিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বাড়াবেন। তিনি নিজের দায়িত্ব কমিয়ে ফেলবেন, প্রশাসনের মৌলিক নীতিকে পঙ্গু করবেন এবং যে দল আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে তার দলপতি হয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

জন মার্শাল যে একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ও তীক্ষ্ণতর ভবিষ্যৎবক্তা ছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য অবশ্য তাঁর মতের এই তীব্র অভিব্যক্তি সমর্থন করার কোন প্রয়োজন নেই। জেফারসন সত্যি সত্যিই নিজেকে প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর নিজের ক্ষমতা দশগুণ বাড়িয়েছিলেন। বর্দ্ধিত এই শক্তি ছিল ব্যক্তিগত রাষ্ট্রপতির নয়, এই ক্ষমতা তাঁরই ছিল তাঁর পদাধিকারের নয়।

যতদিন তিনি প্রজাতন্ত্রী নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি ততদিন কংগ্রেসের নেতারা ছিল তাঁর পেটোয়া এবং দলটিকে তিনি চাবি স্বরূপ প্রায় কাজেই ব্যবহার করতেন। কে এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন ? তাঁর অন্যতম শত্রু টিমথি পিকারিং (Timothy Pickering) লিখেছেন,—"জেফারসন সব সময়ই কংগ্রেসের উপদেশ ও নির্দেশ মেনে নিজেকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে চাইতেন। তবুও তিনি তার নম্রতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিজমত চাপিয়ে দিতেন। আমার মনে হয় জেফারসনের রাষ্ট্রপতিত্বের এই ছিল মূল নীতি। যদি আমরা তাঁর শাসনের আট বছর লক্ষ্য করি এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগ অথবা বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব ঐ সময়েই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রপতিত্ব দৃষ্টিগোচর হত। যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি ১৮০৯ থেকে ১৮২৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তবে বলতে বাধ্য হব যে জেফারসন ঐ পদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে বিনষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমরা একজন শ্রেষ্ঠ মার্কিন পুরুষোত্তমকে নিয়ে আলোচনা করছি যাঁর অন্তর্নিহিত মহিমা অনস্বীকার্য, সেখান থেকে তাঁকে সরানো যাবে না।

এ্যাণ্ড্ৰু জ্যাকসন জেফারসনী ফলফসল পাক করে কর্তৃত্বের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তা এখনো আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ বছরের কংগ্রেসীয় প্রভুত্ব ও কমিটি কেন্দ্রিক প্রশাসনের শেষে তাঁর কর্তৃত্বব্যঞ্জক রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক করউইন বলেছিলেন—তিনি রাষ্ট্রপতিত্বকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করেন নি—ঢেলে সাজিয়েছেন।

জ্যাকসন রাষ্ট্রপতিত্বকে পুনর্গঠিত করেছিলেন প্রশাসনিক কার্যাধ্যক্ষের নিজ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত করে ও মন্ত্রিপরিষদ্ (ক্যাবিনেট)-কে সুবিধামত ছোট করে। নির্বাচনে জেতার পর লোভনীয় পদগুলো তিনি এমনভাবে বণ্টন করে দিয়েছিলেন যার ফলে তিনি এক দল অতিবিশ্বস্ত অনুগামী পেয়েছিলেন, ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারে যে সব প্রতিবন্ধক ছিল সেগুলো দূর করে তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, একধারে দলপতি ও রাষ্ট্রাধিপতির ভূমিকা পরিগ্রহ করেছিলেন এবং সাউথ ক্যারোলিনাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রবলভাবে আইন প্রয়োগে তিনি বিন্দু-মাত্র দ্বিধা করবেন না। কথায় বা কাজে রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা ঘোষণার কোন সুযোগই তিনি নষ্ট করতেন না। বলা বাহুল্য তাঁর পূর্বে এই পদের ক্ষমতা শাসনতন্ত্রপ্রণেতারা যতটা চেয়েছিলেন কংগ্রেস তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে খর্ব করে দিয়েছিল। তিনি যে ভাবে ব্যাঙ্ক বিলে ভেটো দিয়েছিলেন, যে ভাবে নাকচবাদীদের (nullifiers) বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ভাবে সেনেটের তিরস্কার (censure)-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতিত্বের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্ময়ের খোরাক জোগায়।

জ্যাকসনের শত্রুরা যারা ম্যাডিসন ও মনরোর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল তারা যে তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বকে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধতা বলে গণ্য করবে তাতে আশ্চয হবার কোন কারণ নেই। চ্যান্সেলার কেণ্ট বিচারক স্টোরিকে লিখেছিলেন—জ্যাকসন আমার কাছে একজন ঘৃণ্য, অজ্ঞ, বেপরোয়া, ঈর্ষিত, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অত্যাচারী শাসক বলে প্রতিভাত।

ওয়েবস্টার সেনেটে আর্তস্বরে বলেছিলেন—রাষ্ট্রপতিই শাসন করেছেন আর সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ মাত্র। হুইগদের মুখমাত্র ক্লে বলেছিলেন—আমরা এক বিপ্লবের মধ্যে আছি। এ বিপ্লব এখন পর্যন্ত কোন রক্তপাত

ঘটায় নি কিন্তু অতি দ্রুত রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রীরূপ আমূল পরিবর্তিত করে একজন ব্যক্তির হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতাকে অর্পণ করতে যাচ্ছে।

ক্লে ঠিকই বলেছিলেন: তিনি ও তাঁর বন্ধুরা এক বিপ্লবের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এর মূল অনুসন্ধান করার বা এর বৈশিষ্ট্য বোঝার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিপ্লব হচ্ছিল জনসাধারণের মধ্যে এবং তার ফলে আমাদের সরকারের রূপ অভিজাততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল এর প্রজাতন্ত্রী কাঠামোর কোন ক্ষতি না করে। জ্যাকসন এ বিপ্লবের নেতা ছিলেন না কিন্তু এর সুফল ভোগ করেছিলেন। এক প্রতিবাদের ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে তিনি রাষ্ট্রপতিত্ব অর্জন করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজে না ছিলেন তার নেতা, না বুঝতেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। তবু ঠিক বিপ্লবের প্রয়োজনে যেমনটি দরকার—নিষ্ঠুর, কূটনৈতিক এবং উগ্রবক্তা, তিনি ছিলেন তাই। জ্যাকসন রাষ্ট্রপতি না হলেও রাষ্ট্রপতিত্ব নিশ্চিতই একটি গণতান্ত্রিক পদাধিকারে পরিণত হত—কিন্তু গণতান্ত্রিক শক্তির আধার এবং গণ অনুভূতির স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে কংগ্রেসের জায়গায় রাষ্ট্রপতিত্বকে স্থাপিত করার কৃতিত্ব অবশ্য তাঁরই। এবং এখানেই ক্লে ও তাঁর অনুগামীদের ভুল—তারা হুইগদের মতো মনে করতেন যে কার্যনির্বাহক বিভাগের ক্ষমতার রূপ অবশ্যই অগণতান্ত্রিক। জ্যাকসন যে বলতেন তিনিও জনসাধারণের প্রতিনিধি, অন্ততঃ প্রতিনিধি পরিষদের মতোই এবং সেনেটের চেয়ে বেশী, সে কথা তাঁদের কাছে বালকোচিত নয় ত স্বৈরাচারীর আস্ফালন বলে মনে হ'ত। তিনি ছিলেন আমেরিকার জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁর সাফল্যের মূল কারণ ছিল এই এবং তিনি তা ভাল ক'রেই জানতেন।

রাষ্ট্রপতি আমেরিকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা মৌলিক এবং এর দায়িত্ব তাঁর মধ্যেই সমাহৃত। জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা তাঁর বিশেষ কর্তব্য। প্রতিনিধি পরিষদ্ ও সেনেটের আক্রমণ থেকে শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করাও তাঁর কাজ।

জ্যাকসন অনেক ভুল করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্তগুলি মোটেই আদর্শস্থানীয় নয়; এক শতাব্দীতে এরকম রাষ্ট্রপতি একজনের বেশী হলে বেশ মুস্কিল হয় সন্দেহ নেই। তবু আমাদের প্রশাসনের উপর তাঁর প্রভাব অপরিসীম এবং তা মোটামুটিভাবে ভালই বলতে হবে। তিনি তাঁর নেতৃত্বের সমর্থনে যথার্থই

বলতে পারতেন—"আমার দেশের ইতিহাস আমাকে যে জায়গা দেবে আমি সানন্দে তা অনুমান করে নেব। কার্যকারিতা ও ঐতিহাসিক নেতৃত্বের দিক থেকে বিচার করে আমি রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে তাঁর স্থান পঞ্চমে এবং রাষ্ট্রপতিত্বের উপর প্রভাব বিস্তারে তাঁর স্থান ওয়াশিংটনের পরেই বলে মনে করি।

জ্যাকসনের রাষ্ট্রপতিত্বের প্রতিক্রিয়া প্রবল এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল, এমন কি লিঙ্কন যখন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেন তখনো তার জের চলছিল। সেই প্রতিক্রিয়া দাসপ্রথা সংক্রান্ত বিতর্কে আরো জটিল হয়ে রাষ্ট্রপতিত্বের উপর তার ছায়া ফেলেছিল, কিন্তু তবুও সেই বিগত নায়কের অবদানকে তা ম্লান করতে পারে নি। রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে জ্যাকসনের ভাবধারাই জয় হ'লো এবং লিঙ্কন যদিও শাসনকর্তা হিসাবে কোন অভিজ্ঞতা আগে অর্জন করেন নি (কিন্তু সক্রিয় রাজনীতির প্রভূত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল) তবু প্রয়োজনের সময়ে দৃঢ়চিত্তে জ্যাকসনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন নি।

রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা না নিয়েই লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে হুইগদল বা জ্যাকসননীতির কোনটারই অনুকূলে মত ব্যক্ত করেন নি (আমি এখানে রাষ্ট্রপতিত্ব সম্পর্কীয় ভাবধারার কথাই বলছি—দলীয় নীতির কথা তুলছি না) এবং তাঁর অনেক সমালোচক প্রায় দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর প্রশাসন দাবিত্বের গুরুভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়বে। অনতিকালের মধ্যেই লিঙ্কন প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁদের রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে অমূলক আশঙ্কার বা তাঁর নিজ দক্ষতা সম্বন্ধে অহেতুক অনাস্থার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তিনি ভগবানের কাছে শপথ করেছিলেন সংবিধানকে রক্ষা করবেন এবং তার প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা তিনি রক্ষা করবেনই তা না হলে সংবিধান একটা চোথা কাগজে পরিণত হবে। অব্যবস্থিতচিত্ত বুকানন স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন অঙ্গরাষ্ট্রকে জোর করে যুক্তরাষ্ট্রে রাখতে চেষ্টা করেন নি, কিন্তু লিঙ্কন ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া—তিনি অঙ্গরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন হবার দাবির জবাব দিয়েছিলেন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। তাঁর কার্যাবলী কি আকার নেবে সে সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তিনি কোন পন্থা গ্রহণেই পরাঙ্মুখ ছিলেন না—সামরিক সর্বাধিনায়ক হিসাবে, বা আইন

পালক হিসাবে বা সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলীর একমাত্র অধিকারী হিসাবে।

আমাকে দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়েছিল। আমাকে হয় কংগ্রেসের পছন্দমত পথ, প্রশাখা বা পদ্ধতির অনুসরণ করতে হতো যার ফলে প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়তো, নয়তো বিপ্লবকে প্রতিহত করবার জন্য সংবিধান যে ব্যাপক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে তার আশ্রয় নিতে হত। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করে সংবিধানের আশীর্বাদকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছিলাম।

সরকার এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য লিঙ্কন রাষ্ট্রপতিত্বকে ক্ষমতার এমন চূড়ায় স্থাপন করেছিলেন যা আমেরিকার তখনকার লোক কল্পনাও করতে পারে নি। তাঁর সেই এগার সপ্তাহব্যাপী বিখ্যাত একনায়কত্ব কালে তিনি সৈন্যবাহিনীকে তলব করেছিলেন, দক্ষিণের অপরাষ্ট্রগুলিকে ঘিরে ফেলে ছিলেন, সৈন্য ও নৌ-বাহিনীকে বে-আইনী-ভাবে বাড়িয়েছিলেন, সরকারী অর্থ বে-আইনী ভাবে ঋণ দান কার্যে ব্যবহার করেছিলেন, বড়ো রকমের একটা সরকারী ঋণের আদেশ দিয়েছিলেন, দেশদ্রোহিতাসূচক পত্র বিনিময় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সম্ভাব্য দেশদ্রোহীদের আটক করে রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং চিরাচরিত প্রথা অগ্রাহ্য করে ওয়াশিংটন ও ন্যুইয়র্ক মধ্যেকার জায়গায় হেবিয়াস কার্পাসের অধিকার সাময়িক ভাবে নাকচ করেছিলেন। ৪ঠা জুলাই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এক বাণীতে তাঁর আরব্ধ কার্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সন্দিগ্ধদের সন্দেহ নিরসন করার জন্য সরকারের যুদ্ধ করার ক্ষমতা (এটা তাঁরই চিন্তার ফল) সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং কংগ্রেসকে তাঁর কাজের অনুমোদন করতে বলেছিলেন। সৈন্যবাহিনী তলব করে অপরাষ্ট্রগুলিকে ঘিরে ফেলার সিদ্ধান্ত যে আইনানুগ সে বিষয়ে লিঙ্কনের কোন সন্দেহ ছিল না এবং ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন কেন পিছিয়ে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করতেন না। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের নিয়মতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে তিনি অবশ্য ভিন্ন ধরণের যুক্তি উত্থাপন করতেন।

এই ব্যবস্থাগুলো (আইনানুগ বা বে-আইনী যাই হোক না কেন) অবলম্বন

করতে হয়েছিল জনসাধারণের ইচ্ছাকে দেশের প্রয়োজনে রূপায়িত করার জন্ম এবং এই ভরসায় যে এখনকার মতো তখনো কংগ্রেস ওগুলো অনুমোদন করতে দ্বিধা করতেন না। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে—কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের বাইরে কিছুই করা হয় নি।

তিনি জোরের সঙ্গে দাবী করেছিলেন যে হেবিয়াস কার্পাস স্থগিত রাখার ক্ষমতা কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির উভয়েরই ছিল কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো এ সংক্রান্ত বিতর্কের মীমাংসার ভার আইনসভার সদস্যদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাণীর মর্মার্থ ছিল যে আমেরিকার সরকারের অন্যান্য সমস্ত সরকারের মতোই আত্মরক্ষার চূড়ান্ত অধিকার আছে এবং সেই ক্ষমতা মুখ্যতঃ রাষ্ট্রপতির। সেই ক্ষমতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এমন কি প্রয়োজনবোধে তার জন্যে দেশের প্রচলিত মৌলিক আইন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হতে পারে।

সব আইন চালু হবে কেবলমাত্র একটাই কি হবে না আর তার ফলে প্রশাসন কি একেবারে ভেঙ্গে পড়বে না? এমন কি এ রকম ক্ষেত্রে সরকারের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের পরিণাম কি ভয়াবহ হবে না যদি সরকার বলপূর্বক অপসারিত হয়? অথচ একটিমাত্র আইনকে উপেক্ষা করলে সরকারের অস্তিত্ব অটুট থাকবে।

অর্থাৎ জরুরী প্রয়োজনের মুহূর্তে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন প্রশাসক কার্যারূঢ় হবার সময় যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তার দাবীতে একটা বিশেষ আইন ভঙ্গ করে অন্যগুলো রক্ষা করতে সচেষ্ট হতে পারেন।

জরুরী প্রয়োজনের স্বপক্ষে এ ছিল অত্যন্ত প্রবল ও অনন্য যুক্তি। দেশের প্রয়োজনে জরুরী ক্ষমতা কি করে প্রয়োগ করা হবে তার কোন নজির এ রেখে যায় নি সত্য, কিন্তু নির্ভরযোগ্যভাবে এতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে একজন গণতন্ত্রী ক্ষমতায় আসীন হলে শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করার শপথ অনুযায়ী কত ব্যাপক ক্ষমতা জাহির করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির আহ্বানে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হলো তখন তাঁকে জেমস্. কে. পোল্ক (Jamas. K. Polk)-এর মত, জ্যাকসনের মতো নয়, ছোট করে ফেলার জন্য চেষ্টার ত্রুটি কংগ্রেস রাখে নি। যদিও সর্বদাই কংগ্রেসকে সম্মানই দেখিয়েছেন তিনি তবু লিঙ্কন এগিয়েই গেলেন ক্ষমতার অভিব্যক্তিতে বারে বারে সংবিধানের যুদ্ধ সম্পর্কিত ধারার নামে একের পর এক অসাধারণ

কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এ সমস্ত কাজেই অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি একটি অত্যন্ত সক্রিয় মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারিলেও, রাষ্ট্রপতিত্বকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পর লিঙ্কন তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ভাষ্য অত্যন্তই স্ফীত ছিল এবং মনে হয় সামরিক প্রয়োজনের চাহিদায়—যে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করার শাসনতন্ত্র সম্মত ক্ষমতা তাঁর ছিল বলে তিনি মনে করতেন। শিকাগো আগত কয়েকজন দর্শনপ্রার্থীকে তিনি বলেছিলেন, "প্রধান সমরাধিনায়ক হিসাবে শত্রুকে পর্যুদস্ত করার জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি"। স্বাধীনতার সনদ (ইমান্‌সিপেশন প্রোক্লামেশন) ও ইণ্ডিয়ানায় সামরিক আইন জারি করা থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁর কাছে "ব্যবস্থা" শব্দের মানে কি ছিল।

লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলার আছে। তিনি শাসক হিসাবে সুবিধার ছিলেন না, কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, রাজনৈতিক নেতা ও জননেতা হিসাবে তাঁর সাফল্য ছিল বিস্ময়কর। কংগ্রেস অবশ্য তাঁর "যুদ্ধ সম্পর্কিত ক্ষমতার" এমন ব্যাপক ব্যাপ্তি স্বীকার করে নি। নিম্নোক্ত যুক্তির স্বপক্ষে অনেক কিছুই বলা হয়েছে বলে আমি মনে করি: নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায়, জরুরী অবস্থার অজুহাতে এবং কার্যনির্বাহক বিভাগের ক্ষমতার ব্যাপকতার অনন্য ভাষ্যে লিঙ্কন রাষ্ট্রপতিত্বকে এক নতুন শাসনতান্ত্রিক ও নৈতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর ফলে ভবিষ্যতে সংকটকালে সরকারের ক্ষমতা কোথায় থাকবে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। যখন ১৯৫৫ সালে আইজেনহাওয়ারের অনুচরেরা রাষ্ট্রপতিত্বের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাই আমাদের আণবিকযুগের সংকটের বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ বলে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁরা লিঙ্কনের মহান্ ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করছিলেন মাত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও ভেবেছিলেন যে লিঙ্কন স্বৈরাচারী হলেও মনের দিক থেকে ছিলেন একান্তই একজন গণতন্ত্রী—প্রভূত ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন মনুষ্যত্বের নামে এবং রাষ্ট্রপতিত্বকে উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীনতার বেদীমূলে।

জেফারসনের মতো লিঙ্কনও রাষ্ট্রপতিত্বকে সাময়িকভাবে খর্ব করে গেলেন

বিদায় নিয়ে। এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল। বেচারা এণ্ড্রু জনসন ম্যাডিসনের চেয়ে সাহসী হয়েও এর ফল ভোগ করেছিলেন বিশেষ করে তিনি যখন নিঃশঙ্ক চিত্তে যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভাগ (War Department) ও যুদ্ধ সম্পর্কিত কংগ্রেসের কমিটিকে একযোগে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী তিরিশ বছরে বিশেষ করে গ্র্যান্ট ও হ্যারিসনের সময়ে কংগ্রেসের হাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিশেষ সঙ্কোচন ঘটেছিল, কিন্তু শিল্পসমৃদ্ধ জাতি হিসাবে আমাদের উত্তোলন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আমাদের অনুপ্রবেশ রাষ্ট্রপতিত্বকে আবার ক্ষমতার নতুন দীপ্তিতে ভাস্বর করে দিল এবং কর্ণেল রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসে আমাদের প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রপতি হিসাবে আবির্ভূত হলেন!

থিওডোর রুজভেল্ট-এর মূল্যায়ন একটা ছ'বছরের শিশুর মূল্যায়নের মতোই কঠিন। সময়ে সময়ে তিনি ছিলেন এক বিরাট পুরুষ আবার অন্য সময়ে মার্ক হান্নার ভাষায় এক গো-পালক বিশেষ। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক বলশালী রাষ্ট্রপতি—তাঁর শক্তির বীজ অনেকটাই আবার তার গো-পালকের ভূমিকার মধ্যে উপ্ত ছিল। রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতিত্বের উপর পশ্চিমী-নাট্যের নাটকীয়ত্ব আরোপ করেছিলেন এবং দর্শকদের মনে কোন সন্দেহই রাখেন নি যে তিনি হচ্ছেন একমাত্র ভদ্রলোক, আর সবাই—গণতন্ত্রী, সেনেট সদস্যরা, সমাজতন্ত্রীরা, কূটনীতিজ্ঞ প্রভৃতি—যাকে বলে, বিশেষ মন্দ লোক। একটি সক্রিয় ও চিত্তাকর্ষক কার্যালয়ের সহায়তায় তিনি রাষ্ট্রপতিত্বকে আমেরিকার খবরের কাগজের প্রথম পাতায় স্থাপন করেছিলেন এবং তখন থেকে ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রপতিত্ব স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। টেডি আমেরিকার তাজা তাজা ছেলেদের স্বপ্নের মানুষ ছিলেন—গরু চরাতেন, সৈনিকের ভূমিকায় পাঠ নিতেন, রাষ্ট্রপতি হলেন, পোপের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামলেন এবং যখন এ সমস্তর শেষ হয়ে গেল আফ্রিকায় হাতী আর সিংহ শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। রুজভেল্ট নিজেই রাষ্ট্রপতিত্বের এক অর্থপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছিলেন :—

যখন সান্ধ্যভোজের সময় ঘোষণা করা হলো মেয়র আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ভাষান্তরে বলা যায় একহাত দিয়ে আমাকে প্রায় ছোটছেলেরা যেমন পুতুলদের করে তেমনি করে তুলে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন……আমরা

যখন ভোজগৃহে প্রবেশ করলাম ও আহারের জন্য আসন পরিগ্রহ করলাম মেয়র লোভীর মত তাঁর ছুরির হাতল ঠুকে বেয়ারাকে খাবার আনতে বললেন এবং তারপর সহৃদয়চিত্তে আদেশ করলেন—ওয়েটার, পর্দা তুলে দেও, জনসাধারণ তাদের রাষ্ট্রপতিকে খেতে দেখুক।

থিওডোর রুজভেল্ট অবশ্য জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আহার গ্রহণ করা ছাড়াও আরো নানা কাজে রাষ্ট্রপতিত্বকে প্রতাপান্বিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশেষভাবে দক্ষ জনমত সৃষ্টিকারী ব্যক্তি। কংগ্রেসের নেতা হিসাবে তাঁর সাফল্য ছিল অসংখ্য এবং এই ভাবেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে একজন দক্ষ শাসকের প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত আইন প্রণয়নে সাহায্য করা ছাড়া আমেরিকার সমসাময়িক রাজনীতিতে অন্য গত্যন্তর নেই। তিনি আমাদের কূটনীতি অসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন যদিও তিনি নিজে অবশ্য মনে করতেন যে তাঁর আদেশ খুব মোলায়েম শোনাত না। অন্যদিকে আবার কর্তৃত্বের ছড়ি যে খুব একটা ঘোরাতেন তাও নয়। তবুও পানামা খালের ব্যাপারে ও পোর্টস্‌মাউথের চুক্তি সম্পর্কে তাঁর সাফল্য স্মরণযোগ্য। যখন তিনি আমেরিকার জাহাজগুলো পৃথিবীর নানা প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন এবং কংগ্রেসের পক্ষে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধতা করে সেগুলো ফেরত আনা ছাড়া গত্যন্তর রইল না তখন যে তিনি বিরাটত্বের পরিচয় দেন নি এ কথা কে বলবে?

রাষ্ট্রপতির দুর্ভাগ্যক্রমে এবং জাতির সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সাত বৎসরের কার্যকালের মধ্যে এমন কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় (তিনি নিজে অবশ্য তাই মনে করতেন) যে তাঁর নেতৃত্ব ছিল জ্যাক্‌সন লিঙ্কন ঘেঁষা, বুকাননের মতো নয়। ১৯০২ সালের কয়লা ধর্মঘটের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে কিন্তু তিনি সে সংকট তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিত পন্থা—সৈন্যবাহিনী কর্তৃক খনি দখলীকরণ ও চালনা গ্রহণ করার আগেই মীমাংসা করেছিলেন। এই ঘটনা, জমি প্রত্যাহারের ঘটনা ও আরো ছোটোখাটো কর্তৃত্বের ভূমিকা পরিগ্রহ করেছিলেন বলেই তিনি তাঁর "অভিভাবকত্বের নীতি" (Stewardship Theory) সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই নীতিই অবশ্য এখন পর্যন্ত সক্রিয় রাষ্ট্রপতিত্বের সাফাই হিসাবে চলে আসছে।

সাহস, সততা এবং জনসেবার অকপট ইচ্ছা ছাড়া আর যা দিয়ে প্রশাসনকে অনুপ্রাণিত করা যায় আমার মতে তা হচ্ছে—এই নীতি যে কার্যনির্বাহক বিভাগের ক্ষমতার গণ্ডী একমাত্র শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত বা শাসনতন্ত্রানুগ কংগ্রেসীয় আইনে নির্দিষ্ট বাধা নিষেধের দ্বারাই টানা যেতে পারে। আমার বক্তব্য এই যে প্রত্যেক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কার্যাদক্ষ জনসাধারণের অভিভাবক বিশেষ যিনি সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের ভালর জন্য কাজ করতে বাধ্য। তিনি কেবল নেতিবাচক ভাবে নিজের চামড়া বাঁচিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করবেন না। আমি এই মত গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নই যে রাষ্ট্রপতি জাতির জরুরী প্রয়োজনে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত না থাকলে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ। আমার বিশ্বাস জাতির প্রয়োজনে আবশ্যকীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করার অধিকার রাষ্ট্রপতির শুধু যে আছে তাই নয়, এটা তাঁর একান্ত পালনীয় কর্তব্য। কেবলমাত্র যেখানে শাসনতন্ত্র বা নিয়মসিদ্ধ আইন তাঁর হাত পা লিখিতভাবে বেঁধে দিয়েছে সেখানেই তিনি পঙ্গু।

একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিসাবে উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফ্‌ট্ "শাসন সংক্রান্ত বিভাগ-এর ক্ষমতা যে ভগবানের ক্ষমতার মতো অসীম ও সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করাই এর কাজ" এই মতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। সত্যি বলতে কি শাসনতন্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা হলে তাঁর মতই সমর্থিত হবে। কিন্তু জাতির জীবনের সন্ধিক্ষণে রুজভেল্টের পন্থাই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে— শাসনতান্ত্রিক নীতিবোধ যাই নির্দেশ করুক না কেন।

বৈদগ্ধ্যে এবং চরিত্রগুণে উড্‌রু উইলসন ছিলেন সবচেয়ে সেরা রাষ্ট্রপতি। তাঁর "Constitutional Government" (1908)-এর রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত অধ্যায় থেকে আমি বহুবার উদ্ধৃতি নিয়েছি এবং তাঁর চার বছরের রাষ্ট্রপতিত্বে তিনি ঐ সব ব্যঞ্জনাময় যদিও কিছুটা বাহুল্য দোষে দুষ্ট—ভাবধারাকে কর্মে রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। দক্ষ শাসক ও বিচক্ষণ দলনেতা উইলসন ছিলেন দেশের সত্য লক্ষ্য ও আশা আকাঙ্ক্ষার সংবেদনশীল মুখপাত্র। তিনি ছিলেন এক মহান্ রাষ্ট্রপ্রধান এবং আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে একজন যথার্থভাবে সক্রিয় নেতা। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইন সভার সম্পর্ক ঠিক একজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যা তাই। যদিও তিনি ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল তবু দরকার মতো নতুন ভাবধারা গ্রহণে পরাঙ্মুখ

ছিলেন না। রুজভেল্ট যখন ৮ এপ্রিল ১৯১৩ তে তাঁর সান্ধ্য পত্রিকা তুলে নিয়ে পড়লেন যে উইলসন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করেও জন এ্যাডাম্‌স্‌-এর পর প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে সার্থকভাবে কংগ্রেসের সামনে সশরীরে হাজির হয়ে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর মুখে যে ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল তা দেখবার মতো ছিল নিশ্চয়ই! অনেক ইতিহাসবিদই স্বীকার করেন যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্ব ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশাসনই গণতন্ত্র, দক্ষতা ও নীতিবোধে উইলসনের শাসনের প্রথম চার বছরে মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হবার পর অবশ্য তাঁর নানা অসাফল্যের নজির আমরা দেখতে পাই যদিও যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব লিঙ্কন ও দ্বিতীয় রুজভেল্ট অপেক্ষা কিছু মাত্র কম ছিল না। তাঁর কৃতিত্বের সবচেয়ে বড়ো নজির ছিল সমগ্র আমেরিকার অর্থনীতির উপর তাঁর ব্যাপক কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশে। অধিকাংশ জরুরী ক্ষমতাই অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন কংগ্রেসের আইনের মাধ্যমে। যখন তিনি বুঝলেন যে সাগরপারে যুদ্ধ করার জন্য এক সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তোলার সমস্যাই তাঁর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা নয়, তখন তিনি প্রত্যেক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যই কংগ্রেসের কাছে আইনের লিখিত অনুমোদনের প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হলেন।

লিঙ্কন দেখিয়ে গিয়েছেন সংকট কালে একক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রপতি কতদূর যেতে পারেন। এখন উইলসন দেখালেন কংগ্রেসের সহযোগিতায় কতদূর পাওয়া যায়। লিঙ্কনের ক্ষমতায় উৎস ছিল সংবিধান এবং তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করেই কাজ করে গেছেন। যুদ্ধ সম্পর্কিত কয়েকটি ব্যাপার ছাড়া উইলসনের ক্ষমতার উৎস ছিল একগোছা আইন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার পথই বেছে নিয়েছিলেন।

শেষের দিকে অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কংগ্রেসের সহযোগিতা হারালেন, দেশের সহযোগিতা পেলেন না এমন কি নিজেকে পর্যন্ত আত্মবঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে পারলেন না। ১৯১৮ সালে যখন তিনি অত্যন্ত উদ্ধতভাবে এক-গণতন্ত্রী কংগ্রেসের দাবি নিয়ে লোকসমক্ষে উপস্থিত হলেন তখন মারাত্মক ভুল করেছিলেন: "লীগ অফ নেশনস"-এর পক্ষে তাঁর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ

তাঁর গোঁড়ামিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। তবু ১৯১৮ সালে তাঁর ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা আগামী দিনের অনাগত কাহিনীসূচক হয়েছিল—দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর রাষ্ট্রপতি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তারই মহড়া ছিল তা উইলসন রাষ্ট্রপতিকে ন্যায় ও নীতির নতুন দীপ্তিতে ভাস্বর করে গেছেন। তাঁর পরবর্তী রাষ্ট্রপতিদের অসাফল্যই তাঁর সফলতার অকাট্য প্রমাণ।

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও হ্যারি ট্রুম্যান-এর স্থান শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম বলেই আমার ধারণা, কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে করা যাবে। ইতিমধ্যে যাঁদের ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের মতো তালিকায় শীর্ষে স্থান পাবার যোগ্যতা ছিল না, উইলসন ও জ্যাকসনের মতো দ্বিতীয় পংক্তিতেও যাদের নাম উল্লেখ নয় বা থিয়োডর রুজভেল্ট ও জেফারসনের মতো ঠিক তার পরেই যাদের আসন নয় সেই সব কম কৃতী কিন্তু সার্থকমনা ও অসাধ্যসাধনে পটু রাষ্ট্রপতিদের সম্বন্ধে কি কোন বক্তব্য নেই? আমি তাঁদের ছ'জনকে পর পর সাজিয়ে যাব যদিও অনেক ইতিহাসবিদই এঁদের স্মরণীয় রাষ্ট্রপতিদের তালিকায় স্থান দিতে অনিচ্ছুক।

গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড ৪১৪ বার ভেটো প্রয়োগ করে চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও স্বাধীনতা দেখিয়েছিলেন তা তাঁকে প্রায় এক মহৎ রাষ্ট্রপতি করে তুলেছিল। জেমস্ পোল্ক জ্যাকসন ও লিঙ্কনের মধ্যবর্তী সময়ের শূন্যতাকে পূরণ করতে যথেষ্টই সাহায্য করেছিলেন। এঁর সম্বন্ধে ইতিহাসবিদ্ জর্জ ব্যানক্রফ্‌ট্ পঞ্চাশ বছর পরে লিখেছিলেন ঃ

"সার্থকতার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রশাসন আমাদের ইতিহাসের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, অন্ততঃ একটি অন্যতম সার্থক দৃষ্টান্ত। তাঁর সফলতার কারণ তিনি ছিলেন কার্যালয়ের মধ্যমণি এবং তাঁর সমস্ত সচিবদের এমনভাবে কাজে অনুপ্রাণিত করতেন যার ফলে সমস্ত কাজের মধ্যে একটা সুমহান ঐক্যতান বেজে উঠতো। ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার সম্বন্ধে পরে বলবো।

রাজার ফোর্ড হেইসকে খুবই ছোট করে দেখা হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজের মন্ত্রিপরিষদ মনোনয়ন করার স্বাধীনতার প্রশ্নে জয়ী হয়েছিলেন, অসামরিক বিভাগের সংস্কারের প্রশ্নে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, সাতবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে ভেটো দিয়েছিলেন এবং ১৮৭৭ সালের বেলবোড্ ধর্মঘটের সময়

সৈন্য পাঠিয়ে যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁকে গ্র্যান্ট-এর থেকে উচ্চ আসনে বসিয়েছে।

জন এ্যাডাম্‌স্‌-এর দুর্ভাগ্য তিনি ওয়াশিংটনের মতো বিরাট পুরুষের পর রাষ্ট্রপতি পদারূঢ় হয়েছিলেন কিন্তু তিনিও ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের সঙ্গে সন্ধি চুক্তির অনুকূলে দুর্লভ বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মতে ধারণা ছিল রাষ্ট্রপতি একজন স্বদেশ প্রেমিক রাজার সঙ্গে তুলনীয়।

এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন-এর সাহস ছিল কিন্তু বুদ্ধি বিশেষ ছিল না। তিনিও কিন্তু কংগ্রেসের চূড়ান্তপন্থীদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতিত্বকে শক্তিশালী করার প্রয়াসই পেয়েছিলেন, শক্তি ক্ষুণ্ণ করার নয়।

এটা মনে রাখতে হবে এই তালিকার ভিত্তি মেধা নয়, এমন কি যোগ্যতাও নয়। সঙ্কীর্ণভাবে বিচার করলে নিম্নলিখিত সাতজন মানুষ জনমনের চেয়ে বড়ো রাষ্ট্রপতি ছিলেন—জন কুইন্‌সি এ্যাডামস্‌, ফন বিউরেন, টাইলার, আর্থার, ম্যাকফিনলে, ট্যাফ্‌ট ও হুভার। এঁদের মধ্যে কারুরই অবশ্য রাষ্ট্রপতিত্বের বিবর্তনে টেনেসির ঐ নিন্দিত মানুষটির মত কোন অবদান ছিল না।

এত সত্বর এই বিশ্লেষণ শেষ করার দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছি নিশ্চয়ই, তবু এই আলোচনার ছেদ টানার আগে তালিকার শেষের দিকে ম্যাডিসন, মনরো, ফিলমোর, বেঞ্জামিন হ্যারিসন এবং কুলিজের নামোল্লেখ করতে চাই। ডব্লু. এইচ. হ্যারিসন, টেলর ও গারফিল্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি বলে তাদের স্থান নির্দেশ করা গেল না কিন্তু পিয়ার্স, বুকানন, গ্র্যাণ্ট ও হার্ডিঞ্জ একেবারে সর্বনিকৃষ্ট রাষ্ট্রপতি হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বুকাননের প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল, গ্রাণ্ট ছিলেন বড় একজন সেনাপতি এবং হার্ডিঞ্জ-এর ভদ্রমন সর্বজনবিদিত কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে চূড়ান্ত-ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পিয়ার্স-এর নির্বাচনের পর নাথানিয়েল হথর্নস্‌-এর প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য—"ফ্র্যাঙ্ক, তোমার উপর আমার মায়া হচ্ছে, বিশ্বাস কর। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি তোমাকে করুণা করি" এবং তারপর নিউ হ্যাম্পশায়ারের নম্র কবি লিখলেন:

এক যে ছিলেন রাষ্ট্রপতি
তাঁর নাম পার্স

যদি রাষ্ট্রকে খতম করতে চাও
পার্সের স্মরণ নাও

এই অধ্যায় এ রকম শোচনীয় ভাবে শেষ করলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেব না তাই আমি আবার সেই ছয়জন রাষ্ট্রপতির (রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানকে আমি এখন বাদ দিচ্ছি) নামোল্লেখ করতে চাই যাঁরা রাষ্ট্রপতিত্বকে মহিমান্বিত করে গেছেন। এঁরা শুধু মহৎ মানুষ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি ছিলেন না, এঁরা ছিলেন এবং এখনও তাই আছেন আমাদের দেশের ইতিহাসে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আমরা আমেরিকার বিদগ্ধ জন সমাজ ও জাতীয় জীবনে বীরগাথা ও রোমাঞ্চের প্রয়োজন অনুভব করি যা স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের মত প্লিমাউথ আলামোর তীর্থভূমির মত "Fifty fore forty or fight"-এর মত শ্লোগান, "আমেরিকার" মত সঙ্গীত "Pickett's charge"-এর মত বীরত্বের, ও জন পল জোনস্‌-এর মতো বীরের। ডেভি ক্রকেটের সময়ে বেঁচে থেকে আমেরিকার জনজীবনে উপগাথার স্থান কে অস্বীকার করবে? গেটিস্‌বার্গ-এ দাঁড়িয়ে এর অর্থ কে বুঝতে পরাঙ্মুখ হবে? আর কারা এই উপগাথার জন্ম দিয়েছেন? আমাদের জনচিত্তে সার্থক বীরত্বের স্মারক কারা? এই যে বীরগাথা, শ্লোগান ও তীর্থভূমি তা কাদের কেন্দ্র করে? এঁরা হচ্ছেন সেই ছয়জন রাষ্ট্রপতি যাঁদের কথা আমি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছি। এঁরা প্রত্যেকেই কোন কোন কাহিনীর নায়ক, কোন কোন শৌর্যের প্রতীক বা আমেরিকার জনসাধারণের ধ্যানের আধার। একত্রে তাঁরা আমেরিকার সব মহাপুরুষদের প্রায় অর্ধেক। জাতীয় জীবনে ক্রিস্টোফার কলম্বাস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ডানিয়েল বুন, রবার্ট লী, টমাস এডিসন; গল্পে ডিয়ার-স্লেয়ার (হরিণমারা) রুজু ডিক (Deer slayer ও Regged Dick) ও উপ-গাথায় পল বুনিয়ান এবং The lonesome Cowboy (নিঃসঙ্গ গো-পালক) বাদ দিলে এঁদের অমরত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কেউ নেই।

লিঙ্কন ওয়াশিংটন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জেফারসন, সীমান্তের প্রহরী জ্যাক্‌সন, যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিদাতা ও ঐক্যবিধাতা লিঙ্কন, সর্বতোভাবে আমেরিকান থিয়োডর রুজভেল্ট, শান্তির পারাবত উইলসন এঁরা সকলেই আমেরিকাবাসিদের গর্ব ও শ্রদ্ধার প্রতীক।

লিঙ্কন-এর স্মৃতি পুরাণ এদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। কে যেন বলেছেন.. "লিঙ্কন গণতন্ত্রের আবেগময় নাটকের শহীদ খৃষ্ট"। লিঙ্কন যে পথে হেঁটেছেন যে গৃহে থেকেছেন, যেখানে কাজ করেছেন সেখানে যে সব নতুন নতুন মানুষ রাষ্ট্রপতি হয়ে আসবেন তাঁদের শক্তি শুধু সেই কারণেই অপরিমেয়। রাষ্ট্রপতি শুধু অবিশ্বাস্য শক্তির অধিকারী নন, এ পদ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে এ পদ অবিনশ্বর উপকথার জন্মভূমি।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্ব

হারভার্ট হুভারের পদত্যাগে ৪ঠা মার্চ ১৯৩৩ সালে যে রাষ্ট্রপতিত্বের অবসান হ'ল তার তুলনায় ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৩ সনে পদারূঢ় আইজেনহাওয়ারের রাষ্ট্রপতিত্ব দৃশ্যতই অন্য রকম ছিল। শিল্প সভ্যতার বিশৃঙ্খলা বা উন্মত্ত পৃথিবীর কোলাহলকে শান্ত চিত্তে গ্রহণে অনিচ্ছুক আমেরিকার জনসাধারণ এই বিশ বছরে রাষ্ট্রপতিত্বের উপর নতুন নতুন দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত নানা নতুন সাহায্য রাষ্ট্রপতিত্বকে যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে ক্রমবর্ধমান সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করেছে। আমেরিকার জনচিত্তে, যে আমেরিকা রাষ্ট্রপতিত্বকে গৃহে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ও বিদেশে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিরূপে ভাবতে অভ্যস্ত, এ সশ্রদ্ধ আসন অধিকার করেছে। রাষ্ট্রপতিত্ব নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছে, পুরোপুরি না হলেও আংশিক ভাবে তো বটেই।

এ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপতি ও রুজভেল্ট ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতিত্বের পরিধির যে নতুন ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন তাই আমার আলোচ্য। পাছে লোকে মনে করে যে আমি দল টেনে কথা বলার চেষ্টা করছি আমি বলতে চাই যে আইজেনহাওয়ার অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে অথচ বিনা নাটকীয়তায় তাঁর পূর্ববর্তী গণতন্ত্রী রাষ্ট্র-পতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাষ্ট্রপতিত্বকে নতুন পোষাকে আবৃত করতে

সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যদি রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের মত প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতি নাও হয়ে থাকেন, অন্ততঃ তিনি এক সমতল শক্তিশালী রাষ্ট্রপতিত্বে পদারূঢ় ছিলেন। আর যাই হোক কার্যনির্বাহক বিভাগের গত বিশ বছরের অসাধারণ কর্মতৎপরতার সুফল তিনি প্রথম ভোগ করেছিলেন এ কথা নিশ্চিতভাবে সত্য। অন্যান্য সমস্ত জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রপতিত্বেরও বিবর্তন ঘটে কিন্তু এ যুগটা ছিল বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ। সুতরাং আমরা গত পঁচিশ বছরে রাষ্ট্রপতিত্বের গঠনে ও ক্ষমতার যে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ ক'রব।

প্রথম পরিবর্তন হয়েছে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির পারস্পরিক কার্য-সম্পর্কে। রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে ভূমিকার বিষয়ে আগেই বলেছি যে তিনি প্রায় প্রধানমন্ত্রীর মত বা কংগ্রেসের তৃতীয় পরিষদের মত ক্ষমতার জারক রসে সিক্ত। এখন আর তাঁর আগের মত কংগ্রেসের আইনের খসড়ার উপর কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করার বা আইন গৃহীত হয়ে যাবার পর চূড়ান্তভাবে হাঁ বা না বলার মাত্র ক্ষমতাই নেই, বরং এখন তিনি বিস্তারিত-ভাবে সুপারিশ পাঠান তাঁর বাণীর মাধ্যমে বা আইনের একটা পুরোপুরি খসড়ার মাধ্যমে। তারপর কংগ্রেসের প্রত্যেক পরিষদে বা কমিটিতে তার কী গতি হ'ল তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন এবং প্রত্যেক সম্মানজনক-পন্থার সাহায্যে কংগ্রেসের ভদ্রলোকদের তিনি যা প্রথমে চেয়েছেন তা দিতে প্রবুদ্ধ করেন। আধুনিক রাষ্ট্রপতির অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের বা দলের অনুসৃত সূচীকে আইনে পরিণত করার জন্য ভদ্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া। যদি তাঁর বিস্তৃত কর্মসূচী না থেকে থাকে তবে তাঁকে অলস বলে ধরে নেওয়া হবে; যদি কংগ্রেসকে অন্ততঃ কিছু খসড়া আইনে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারেন তবে তিনি ব্যর্থকাম বলে প্রতীয়মান হবেন। আধুনিক রাষ্ট্রপতির সাফল্যের পরিমাপ আমরা করি কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তাঁর জয়ের বা পরাজয়ের নিরিখ করে।

* সব সময়ে কিন্তু এ রকম ছিল না। রাষ্ট্রপতি যে আইন প্রণয়নের প্রত্যেক স্তরে একজন সক্রিয় সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছেন এটা সম্ভব হয়েছে তিনজন বিংশশতাব্দীর রাষ্ট্রপতির কুশলতায়: থিয়োডর রুজভেল্ট, উড্রুউইলসন ও ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্ট। এঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন অঙ্গরাষ্ট্রের যশস্বী

রাজ্যপাল থেকে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এবং এঁদের সাফল্যের পরিমাপ করা হয়েছিল আইনসভাতে এঁদের নেতৃত্বের কৃতকার্যতার মানদণ্ডে। প্রত্যেকেই এমন সময় এসেছিলেন যখন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় নতুন নতুন আইনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং এঁরা কেউ কংগ্রেসে দলগত আনুগত্যের যূপকাষ্ঠে আত্মসমর্পণ করেন নি। যুগসংকটের সন্ধিক্ষণে এই বিরাট পুরুষকারদের আবির্ভাব কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির পারস্পরিক সম্পর্কে বিপ্লব সংঘটিত করেছিল এবং আমেরিকার মানুষের রাষ্ট্রপতিদের সামগ্রিক অবদানের মূল্যায়নের মানদণ্ডকে উল্টে দিয়েছিল।

এই বিপ্লব ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্টের কার্যকলাপের শেষের দিকে পর্যন্ত অসমাপ্ত ছিল কারণ দ্বিতীয় পক্ষ কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির স্বাধীন কার্যকলাপের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল না। কংগ্রেসের ভদ্রলোকেরা যে মনে করতেন সময় রাষ্ট্রপতির অনুকূলে থাকবে না, রুজভেল্টের নেতৃত্ব তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেই পঙ্গু হয়ে পড়বে বা জরুরী সমস্যার সমাধানে অক্ষম হবে বা পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হার্ডিঙ্গ না হলেও হুভারের পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হবেন সে জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপতি গোঁড়া রক্ষণশীল হয়েও কংগ্রেসের লেজুড় হিসাবে কাজ করতে স্বীকৃত হলেন না। শ্রীযুত ট্রুম্যান তাঁর আট বৎসর ব্যাপী কার্যকালের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত চাপ দিয়ে গেছেন, এমন কি কখনো কখনো চেষ্টা ফলপ্রসূ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও। পরিশেষে তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের শেষের দিকে কংগ্রেসের প্রজাতন্ত্রীরা পর্যন্ত অত্যন্ত বিতর্কমূলক শ্রমসমস্যা, করসমস্যা, মুদ্রাস্ফীতিসমস্যা ও শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে তার মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সময়ের যে পরিবর্তন হয়েছে তার প্রমাণ তাঁরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহূত হয়ে হোয়াইট হাউসে গিয়ে তাঁর নিজের মুখের জবানীতে তাঁর বক্তব্য শোনা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে করতেন না। সেনেটর জর্জ হোর যে সময়ে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছিলেন, সে সময় আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি :

মান্য সেনেট সদস্যরা হোয়াইট হাউস থেকে কোন গোপন বার্তায় আইন প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁদের নিজ অভিরুচির পরিপন্থী কিছু করতে অনুরুদ্ধ হলে ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত বোধ করতেন। যদি কোন ছোট উপদল বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রপতির যোগসাজসে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে প্রয়াস পেতেন বা কংগ্রেসে

তাঁদের সহকর্মীদের রাষ্ট্রপতির মনোভাব জানাবার চেষ্টা করতেন তবে নিজেদের বিপদই ডেকে আনতেন। প্রত্যেক সদস্যই নিজ নিজ পরিমণ্ডলের স্বকীয়তায় বিশিষ্ট ছিলেন এবং এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি বা অন্য কারো মাতব্বরি সহ্য করতেন না।

এই অনতিক্রমনীয় বিবর্তন সম্পূর্ণতা পেল রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার। ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৪-এর সাংবাদিক সম্মেলনে এই পর্যায়ের পূর্ণতা সংঘটিত হলো। ৮৩ জন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আইজেনহাওয়ার কংগ্রেসে কোন কার্যসূচী অনুমোদনের জন্য পাঠান নি বা সে সবের জন্য কোনও ক্রমবর্ধমান চাপাও দেন নি। পর্যবেক্ষকরা বলতে সুরু করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতিত্বের নব নব রূপায়ণ বা কংগ্রেসের সন্ধানী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বোধ হয় সীমাবদ্ধ। কিন্তু যেই দ্বিতীয় অধিবেশনের পদধ্বনি শোনা গেল, রাষ্ট্রপতি উদ্যম দেখাতে সুরু করলেন এবং ১৯৫৪ সালের কংগ্রেসের প্রথম বৈঠকের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দীর্ঘ ও বিস্তারিত বাণীতে (message) কৃষি-সমস্যা, সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যবিধি, পররাষ্ট্রনীতি, শ্রমসমস্যা ও অর্থ সমস্যা সম্বন্ধে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করলেন। তারপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সাহায্য করলো।

প্রশ্ন—রাষ্ট্রপতি কি বলবেন তাঁর প্রস্তাবের অংশ কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনে অনুমোদিত হবে বলে তাঁর প্রত্যাশা ?

উত্তর—রাষ্ট্রপতি বললেন, “আমি একটা জিনিষ স্পষ্ট করে বলতে চাই। আমি যে কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবাবলী পাঠাচ্ছি তা কালাপহরণের জন্য নয় বা নিজে খুব কৃতীপুরুষ তা প্রমাণ করার জন্যও নয়। এগুলো যাতে আইনে পরিণত হয়, আমি তা দেখব। এ বিষয়ে আপনারা কোন ভুল করবেন না—আমি এর জন্যই হোয়াইট হাউসে এসেছি এবং এই সব করতে দৃঢ়সংকল্প।

পঞ্চাশ বছর আগে এই ধরণের মন্তব্য কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যদের ভীষণভাবে উত্তেজিত করতে সচেষ্ট ছিল এবং রাষ্ট্রপতির যে অল্প সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব থাকতেন তাঁদের প্রচণ্ড সংশয়ের খোরাক জোগাত। এমন কি বিশ বছর আগেও কংগ্রেসের গোঁড়া রক্ষণশীল সদস্যরা এতে অপমানিত বোধ করতেন, নরমপন্থীরা স্থূলতার অভিব্যক্তি বলে মনে করতেন।

১৯৫৪ সালে কিন্তু বেশী কেউ এর প্রতিবাদ করেন নি, এমন কি লক্ষ্য পর্যন্ত করেন নি। শুধুমাত্র কয়েকজন বলেছিলেন যে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে।

সেই জাগরণের মুহূর্ত থেকে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের রুচি ও দেশের রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে থেকে ঐ প্রতিজ্ঞাকে সফল করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি যে সব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তখনকার দিনে তা বিতর্কের সূচনা করত কিন্তু আজকাল একান্তই স্বাভাবিক ব'লে গৃহীত হয়ে গেছে। শাসন ও আইন-বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কে আগে যা অস্বাভাবিক ছিল, আজ তা স্বাভাবিক, যা অপ্রত্যাশিত ছিল আজ তা বিশেষ ভাবে প্রত্যাশিত—এই হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্বের মর্মার্থ। হার্ডিঞ্জ হার্ডিঙ্গ বা ম্যাক্‌কিন্‌লের হাতে যে ক্ষমতা ছিল আজকের রাষ্ট্রপতির তার চেয়ে বেশী নেই। ইলেকট্রনিক্‌স্‌-এর যুগে অবশ্য জনচিত্তে আবেদন করার পথ বেশী সুগম হয়েছে। পক্ষান্তরে আবার অসামরিক বিভাগের সংস্কারের ফলে স্বজনপোষণের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। হোয়াইট হাউসে সম্মেলন ডাকা, দলের আনুগত্যের উপর দাবি রাখা, ভেটোর হুমকি ইত্যাদি পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। কিন্তু আইনের খসড়া রচনায় ও কংগ্রেসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনায় রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক যোগ্যতার বিপুল উন্নতি হয়েছে; আজকাল কংগ্রেস নিজেই রাষ্ট্রপতির কাছে তথ্য ও অনুমোদনের দাবি নিয়ে সাগ্রহে উপস্থিত হয়। তবু কিন্তু সেনেট সদস্য কেফাভার ও মন্‌রোনির আবেদন সত্ত্বেও আইন সভার দুই পরিষদ কোন সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন করে রাষ্ট্রপতির বর্দ্ধিত দায়িত্বের স্বীকৃতি দেয় নি। সংবিধান ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে শাসনসংক্রান্তবিভাগ ও আইন-বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যা বিধান দিয়েছিল আজও তাই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই সম্পর্কের স্মরণীয় পরিবর্তন সাংগঠনিক নয়,—সাংবিধানিকও নয়, এ পরিবর্তন দেশের হাওয়া-বাতাসের পরিবর্তন। দেশ এখন রাষ্ট্রপতির কাছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রত্যাশা করে, আশা করে তিনি তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন। তাঁর উপর আজকের সংবাদপত্রের জগত হয়তো ভীরুতা ও অকর্মণ্যতার জন্য দোষারোপ করবে কিন্তু দৃঢ়তা ও সক্রিয়তার জন্য কিছুতেই করবে না।

দেশ যা চায়, কংগ্রেস তাই চায়। আগামী দিনে রাষ্ট্রপতি যদি কংগ্রেসকে

কর্মে অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হন মৃদু বিরক্তি হয়তো এ প্রকাশ করতে পারে, উন্মত্ত বিরোধিতা করবে না নিশ্চয়ই।

আজও আমেরিকার জাতীয় সমস্যায় রাষ্ট্রপতির বিস্তৃত পরিকল্পনা খসড়া আকারে কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্য যায় এবং তারপর রাষ্ট্রপতি ঐ পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি গৃহীত হয় তার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন। এই ব্যবস্থা আমাদের সাংবিধানিক ক্ষেত্রে এক প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপ্লব এত দূরে এগিয়ে গেছে যে এখন আমরা রাষ্ট্রপতির উপযুক্ততা বিচার করার জন্য নতুন মানদণ্ডের দাবি জানাচ্ছি। কার্যনির্বাহকবিভাগ ও ব্যবস্থাপক সভার সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নতুন পর্দ্ধতির দরকার হয়ে পড়েছে, এই স্থায়ী সমস্যার সম্বন্ধে আমি শেষ অধ্যায়ে আলোচনা ক'রব।

কংগ্রেসের সক্রিয় নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে: নতুন নতুন জনসংযোগের রাস্তা বেরিয়ে পড়েছে যার সাহায্যে তিনি জনমতকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন, জনমতের প্রতিধ্বনি শুনতে পারেন। রেডিও ও টেলিভিসন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজ রাষ্ট্রপতি সরাসরি জাতির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হতে পারেন, এর ফলে কংগ্রেসের প্রতিকূলে ও রাষ্ট্রপতির অনুকূলে যে বিপুল শক্তি তার নাটকীয় সম্ভাবনা নিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে তার মাপজোক নেই। Capital cloak room বা Face the Nation-এর মত স্হচীর সঙ্গে হোয়াইট হাউস্ থেকে ১৫ মিনিটের রেডিও বক্তৃতা বা টেলিকাষ্টের কোন তুলনাই চলতে পারে না। সেনেটার ম্যাকার্থি ও কেফাভার-এর আমেরিকার গৃহিণীদের পক্ষে আবেগময় আন্দোলন কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি বা তার সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধিতে কোনই সাহায্য করে নি। ইলেকট্রনিকস্-এর যাদুতে রাষ্ট্রপতিই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন এবং আশা করি যে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছায় নিজের সাধারণ কার্যবিবরণী রেডিওতে প্রচারে প্রয়াসী হবে না। কংগ্রেসকে এটা মানিয়ে চলতেই হবে যে রাষ্ট্রপতির ষ্টিফেন পটারের ভাষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি স্বাভাবিক সুবিধা আছে যা তার সেই রাষ্ট্রপতিকেও এই রূঢ় বাস্তব স্বীকার করতে হবে যে তাঁর এই অনন্য পদাধিকারে যতদিন তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন কার্যতঃ তার গোপনীয়তার কোন স্থান নেই।

সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জনমতের সেতুবন্ধন সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে আজকাল সাধিত হয়। রাষ্ট্রপতির নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলন আজ একটা অভ্যস্থ প্রথা। ভাবতে অবাক লাগে যে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সময় থেকেই মাত্র এ প্রথা নিয়মিত ভাবে চালু হয়েছে। প্রথম থেকেই অবশ্য রাষ্ট্রপতি সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছেন, কিন্তু উড্রু উইলসনের সময় থেকেই সাংবাদিকরা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নয় অধিকার হিসাবেই নিয়মিতভাবে এবং পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুসারে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত হতে আরম্ভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগ-দানের পর থেকে উইলসন তাঁর প্রশাসনকে অসুবিধাজনক প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এ প্রথা বর্জন করেন। পরবর্তী প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপতির তাঁর ১৯১৩-১৯১৭ এর দক্ষতার সমকক্ষ হবার না ছিল যোগ্যতা না ছিল ইচ্ছা। হার্ডিঙ্গ গরম গরম প্রশ্নের জবাবে এমন বেসামাল হয়ে পড়তেন যে তিনি নিয়ম পরিবর্তন করে আগে ভাগে লিখিত প্রশ্ন চাইতে আরম্ভ করলেন, কুলিজ এই প্রথাই অনুসরণ করবেন তবে সাধারণতঃ সংবাদপত্রকে এড়িয়ে চলতেন; হুভারও তাই করতেন—পরে যখন পরাজয়ের কালো ছায়া মাথার উপর এসে পড়ল তখন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকাই বন্ধ করে দিলেন।

সংবাদপত্রের জগত ছাড়া ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্ট এর প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হত। তিনি এই প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করে একে নতুন সম্ভাবনা ও জনকৌতূহলের কেন্দ্র করে তুললেন। সাংবাদিক সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন সদস্যই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন; প্রশ্নোত্তর এর পর্যায় চলত মুখে মুখে। উইলসনই প্রথমে এই প্রথা চালু করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে তাঁর নাম কোন উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা যাবে না। রুজভেল্ট এই নিয়ম মেনে চলতেন। এ ছাড়া অবশ্য সম্মেলন অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আবহাওয়ায় পরিচালিত হ'ত—রাষ্ট্রপতির স্বাভাবিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা তাকে উদ্যোগীর ভূমিকা নিতে সাহায্য করত। শ্রীযুক্ত ট্রুম্যান প্রথম কার্যকালে কিছু অসাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরে কিন্তু বেশ সামলে নিয়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর সার্থক অনুগামী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে পুরাণো স্টেট বিল্ডিং যেখানে কয়েক শত লোকের বসার ব্যবস্থা আছে সেখানে, সরিয়ে নেবার বহু

বিতর্কিত সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। এর ফলে অবশ্য সম্মেলনের চেহারা আগের হৃদ্যতা পূর্ণ পরিবেশের তুলনায় বেশ খানিকটা কেতাদুরস্ত হয়ে দাঁড়ায়।

ওয়াশিংটনে যখন থাকতেন আইজেনহাওয়ার সপ্তাহে একবার সম্মেলন ডাকার চেষ্টা করতেন, বারে বারে দৃঢ়স্বরে তিনি দাবি করতেন যে সাংবাদিক সম্মেলন আধুনিক আমেরিকার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। ১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৫ তিনি সর্বপ্রথম টেলিভিশন ও নিউজরিল ক্যামেরার সামনে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন: লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী সে দিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে তাঁদের রাষ্ট্রপতিকে হাঁটতে চলতে দেখেছিল। তাঁর আন্তরিকতা, যোগ্যতা ও মর্যাদাবোধ সে সন্ধ্যায় অত্যন্ত সমালোচনাপ্রিয় দর্শকদের মনেও গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছিল— গণতন্ত্রের এই মহিমময় অভিব্যক্তি তাঁদের বিহ্বল করে দিয়েছিল। টেলিকাস্টে ও চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হবার আগে সম্মেলনের মন্তব্যগুলো হোয়াইট হাউস পর্যালোচনা করে তবে ছাড়তেন এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে উল্লেখ না করার যে সর্বজন বিদিত প্রথা ছিল এ ব্যবস্থা তার যথার্থ পরিপূরকই ছিল। এই নতুন পরীক্ষা বেশ সফল হয়েছিল ফলে আজ টেলিভিশানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকা এক প্রচলিত প্রথা। ক্রমেই এর আবেদন কমে আসছে কিন্তু তা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। আজকাল অবশ্য সম্মেলনের সারাংশই টেলিভিশনে তুলে ধরা হয়। সকল কৃতী রাষ্ট্রপতিরই এ থেকে এই শিক্ষা হয়েছে যে নতুন কোন অস্ত্র হাতে পেলে তাকে অতিব্যবহারে অকেজো করে ফেলতে নেই। যতদিন অতিব্যবহারে এ মলিন না হচ্ছে ততদিন টেলিভিশনের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলন আমেরিকার গণতন্ত্রের একটি অন্যতম প্রয়োজনীয়, সংবাদ সংগ্রাহী ও মনোরঞ্জক কৌশল হয়ে থাকবে। অধিকন্তু সাংবাদিক সম্মেলনের এই সব টেপি (Taped) করা ফিল্ম ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের কাছে এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে দাড়াবে, ফলে রাষ্ট্রপতির জীবনচরিত লেখা এখনকার মত সৃজন ধর্মী না হলেও অনায়াস সাধ্য হবে।

টেলিভিশন করা হোক বা নাই হোক আমাদের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে রাষ্ট্রপতির সাংবাদিক সম্মেলন এখন একটা অপরিবর্তনীয় প্রথা। এটা সম্ভব যে কোন কোন রাষ্ট্রপতি হয়তো এ ধরণের আধা সার্কাস মার্কা আধা প্রশ্নোত্তর

পছন্দ করবেন না ও প্রচলিত প্রথাকে সংক্ষিপ্ত করে আনবেন, কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে থেকেই যে দ্বিগুণ উৎসাহে এ প্রথা পুনর্বার চালু করার অঙ্গীকার করবেন তাতে সন্দেহ নেই। এ কথা নিতান্তই সত্য, কারণ অংশতঃ জনসাধারণ এটা এখন চায় এবং আশা ভঙ্গ হলে ক্ষুণ্ণ হয়, অংশতঃ এটা রাষ্ট্রপতির পক্ষে মোটামুটি ভাবে এক প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। কোন রাষ্ট্রপতিই একে বাদ দিয়ে চলতে পারেন না, বিশেষ করে কোন সামাজিক ভাবাপন্ন বিদায়মুখী রাষ্ট্রপতি যিনি পুনর্নির্বাচিত হতে চান তিনি তো কিছুতেই পারেন না।

সংবাদ পত্রে ও বই এ রাষ্ট্রপতির সাংবাদিক সম্মেলন ও বৃটিশ হাউস অফ কমন্স-এর প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সাদৃশ্য নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারকে নানা রকম প্রশ্ন করার সুযোগ আছে সত্যি, কিন্তু বৃটিশ প্রথার সঙ্গে নানা পার্থক্যও আছে। রাষ্ট্রপতি 'কোন মন্তব্য করব না' এই কথা বলে প্রশ্নের গতি পরিবর্তিত করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী তা পারেন না। প্রশ্নকর্তারা কোনক্রমেই তাঁর সহকর্মী নন যদিও তাঁরা ভাবতে ভালবাসেন যে তাঁরা আমেরিকার জনসাধারণের প্রতিনিধি—গভীর দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এক নতুন শ্রেণী। আমার জ্ঞানতঃ কোন সাংবাদিকই আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে তাঁর অসন্তোষজনক উত্তরের জন্য প্রকাশ্যে নিন্দা করেন নি বা নতুন ব্যাখ্যা দাবি করেন নি। বস্তুতঃ যে সাংবাদিক এ রকম প্রয়াসে ব্রতী হবেন তাঁর পেশা সেদিনই খতম এবং প্রশ্নগুলো এমন হতে হবে যাতে রাষ্ট্রপতিকে একেবারে ঠেসে ধরা না হয়, যাতে তিনি দেয়ালে পিঠ দিয়ে তার উত্তর দিতে বাধ্য হবেন না। যেমন খুসী ঘুরিয়ে নিতে পারবেন।

বস্তুতঃ তাঁর নিজের কার্য সিদ্ধির পক্ষে এর চেয়ে শক্তিশালী কোন অস্ত্র রাষ্ট্রপতির নেই, এখান থেকে যত সহজে জনসাধারণের উপর উপদেশ বর্ষণ করা যায় এমন আর কিছুতেই যায় না এবং জনসাধারণের মন্তব্য সংশয় ও সমালোচনা রাষ্ট্রপতির কর্ণগোচর হবার এর চেয়ে ভাল কোন মাধ্যম নেই। আইজেনহাওয়ার নিজেই বলেছেন :

আমি মনে করি কার্যতঃ এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র। অনেক রকম মন্তব্যই আমি পড়েছি সেখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিরা একে পীড়াদায়ক অনুষ্ঠান

বলে অতীতে মনে করেছেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। তা'ছাড়া প্রশ্ন আমি চাই কারণ আমার মনে হয় অধিকাংশ সময়েই জনমতকে এ প্রতিধ্বনিত করে।

আমাদের গত তিন রাষ্ট্রপতি বারংবার দেখিয়ে গেছেন যে সাংবাদিক সম্মেলন তাঁদের প্রচেষ্টাকে ক্ষুণ্ণ করে নি বরং অনুপ্রাণিত করেছে, সুতরাং এ প্রথা বর্জনের কোন সম্ভাবনাই নেই, এমন কি হারবার্ট হুভারের সময় এ যেমন এক নিরুত্তাপ আকর্ষণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল. তা হবার সম্ভাবনাও নেই। যে রাষ্ট্রপতি চিন্তা না করেই জবাব দিতে অভ্যস্ত, যিনি প্রশ্নোত্তরের আগে কোন পরামর্শ নেন না, যিনি সহজেই উত্তেজিত হয়ে উঠেন এ রকম রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক সম্মেলনের সোজাসুজি প্রশ্নোত্তরে একেবারে কাহিল হয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু এ রকম লোকতো জনসংযোগের সমস্ত উপায়কেই এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন! সাংবাদিক সম্মেলনের এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের যোগ্যতম শিক্ষার্থী লুই ব্রাউন্‌লোর এক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি :

এই প্রথার পরিবর্তন করা কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষেই সম্ভবপর নয়, কোন কার্যকরী হস্তক্ষেপই এর উপর সম্ভব নয়। কোন আইন এ প্রথার জন্ম দেয় নি, কোন সাংবিধানিক অনুশাসনও নয় কিন্তু তবুও আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কোন রাষ্ট্রপতিই সুস্থ মস্তিষ্কে হৃষ্টচিত্তে এই অনন্য অনুষ্ঠান তাঁকে যে ক্ষমতা দেয় তা বর্জন করবেন না। এই অনুষ্ঠান তিনি যেমন চান তাকে সেভাবেই জনমানসে প্রতিফলিত করে, দেশের এবং প্রায়শঃই বিদেশের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়।

শান্তির সংরক্ষকের ভূমিকাই গত পঁচিশ বছর ধরে রাষ্ট্রপতির সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা। রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানকে ধন্যবাদ, জনসাধারণের দাবি পূরণে যে ভাবে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তার ফলেই আমরা রাষ্ট্রপতিকে দেশের সর্বত্র একমাত্র শান্তিরক্ষক বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি। অঙ্গরাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষই সাধাণতঃ অগ্নি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি নিবারণ করেন। কিন্তু সে সব দুর্ঘটনা কয়েকটি অঙ্গরাষ্ট্রকে এক সঙ্গে আঘাত করে বা যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের হানিকর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয়ত্তাধীন নয় তা নিশ্চিতই হোয়াইট হাউসের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাকে কর্মে প্রবৃদ্ধ করে।

আমেরিকার শান্তিভঙ্গকারী শ্রম বিরোধ সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। "নিউ ডিলের" পরে সরকারের "শ্রমিক-মালিকসম্পর্ক" নীতির যে প্রসার ঘটেছে তার ফলে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও ক্ষমতার বিশেষ রূপান্তর সাধিত হয়েছে। সরকার সাধারণভাবে এ সম্পর্কে যে মনোভাব অবলম্বন করে থাকেন তার গতি রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট করে দেন না, কিন্তু জাতীয় সংকট সৃষ্টিকারী শ্রমবিরোধে তিনি একজন প্রভাবশালী তৃতীয় পক্ষ, এমন কি যখন তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন তখনও। ১৯৪৭ সনের ট্যাফট—হার্ট্লি (Taft—Hartley) আইনে শিল্পে স্থায়ী শান্তির উল্লেখ আছে। শান্তি সংরক্ষণে রাষ্ট্রপতির মুখ্য ভূমিকা এখন সর্বজন স্বীকৃত। এই পর্যায়ে তাঁর ক্ষমতা তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(১) জননিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর হিংসাত্মক ধর্মঘটের সময় সৈন্যবাহিনী নিয়োগ ক'রে আমেরিকার শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খল ধর্মঘট দমন করা অঙ্গরাষ্ট্র ও স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনশীল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি শিল্পবিরোধের দুটি ক্ষেত্রে মাত্র হস্তক্ষেপ করেন: যখন তিনি ন্যায্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তক্ষেপ করতে অনুরুদ্ধ হন কারণ তাঁরা নিজেরা শান্তি রক্ষায় অসমর্থ আর যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও সম্পত্তি প্রকাশ্যেই এমন ভাবে পদদলিত যে শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার স্পষ্টতঃ জরুরী হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি অনুরুদ্ধ হয়েও হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করতে পারেন; আবার তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুলম্যান ধর্মঘটের সময় ক্লীভল্যাণ্ডের মত অনাহুত এবং অবাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন। সম্প্রতিকালে এ ক্ষমতার ব্যবহার বিশেষ বিরল হয়ে পড়েছে। আমাদের শ্রম বিরোধে হিংসার স্থান ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে, উপরন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষই যোগ্যতার সঙ্গে যথার্থ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে জনস্বার্থের প্রয়োজনে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম বলে আমাদের ধারণা। তবুও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অব্যাহত, এর ব্যাপ্তি বলপ্রয়োগের হুমকি থেকে আরম্ভ হয়ে সামরিক আইন পর্যন্ত বিস্তৃত। আমার ধারণা এ ক্ষমতার প্রয়োগ আমরা ভবিষ্যতে আরো দেখব।

(২) যুদ্ধের ঠিক আগে বা পরে অথবা যুদ্ধকালে শিল্পোৎপাদনের প্রতিবন্ধক দূরীভূত করা।

রাষ্ট্রপতি যুদ্ধকালীন শ্রম বিরোধে অস্বাভাবিকভাবে তৎপর হয়ে উঠতে

পারেন। মুখ্য সমরাধিনায়ক হিসাবে—আর সকলের চেয়ে সমরাস্ত্রের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহতভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখা রাষ্ট্রপতির বিশেষ দায়িত্ব। সর্বাত্মক যুদ্ধের পটভূমিকায় রাষ্ট্রপতি শিল্প সম্পর্কে শক্তিশালী পক্ষ। তাঁর ক্ষমতা দুটি পরিপূরক খাতে প্রবাহিত হয়ঃ প্রথমতঃ তিনি অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তাকে সাহায্য করার জন্য বিশেষ সংস্থা তিনি গঠন করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ এ সব সংস্থার সিদ্ধান্ত বা অনুশাসন কার্যকরী করার জন্য তিনি অদৃশ্য শক্তির আশ্রয় নিতে পারেন্ যেমন, অবাধ্য শ্রমিক সংস্থা বা মালিককে জনসমক্ষে প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে তুলে ধরতে পারেন, অথবা শ্রমিকদের হুমকি দিতে পারেন যে তাঁদের অসুবিধাজনকভাবে নতুনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে অথবা কোন কারখানার দুর্মূল্য কাঁচামাল সরবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন সংকটজনক কর্মবিরতি বন্ধ করতে পারেন রাষ্ট্র দখলের হুমকি দিয়ে।

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান উভয়েই এই বিরাট ক্ষমতা উৎসাহের সঙ্গে প্রয়োগ করে কৃতকার্য হয়েছিলেন। ১৯৪১-১৯৪৬ সনের মধ্যে তাঁরা দুজনে ৬০টির বেশী কারখানা দখল করার আদেশপত্রে সই করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৪৪ সনের মণ্টগোমারি ওয়ার্ড এর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শত্রু সৈন্যকে পর্যুদস্ত করার এক অভিনব কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। শ্রী সেওয়েল এভেরি (Sewell Avery) ছিলেন প্রতিপক্ষের অধিনায়ক। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি হতভম্ব সৈনিক জোর করে আভেরিকে তাঁর কার্যালয় থেকে অপসারিত করেন—ঐ সৈনিক যুগলের মায়েরা নিশ্চয়ই এঁদের এ রকম সৈনিক হবার জন্য লালন পালন করেন নি। ১৯৫২ সনের জুনে কোন ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রদখলে আনার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রপতি ব্যর্থকাম হবার পরে এ ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে না হলেও বেশ বেশী পরিমাণেই খর্ব হয়ে যায়।

(৩) জাতীয় অর্থনৈতিক সংকটে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা।

জাতীয় সমৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও যুদ্ধকালীন শিল্পোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটানো ছাড়াও মূল শিল্পে এবং পরিবহনবিভাগে ক্রমাগত শ্রমবিরোধ এক জরুরী সমস্যা। আমেরিকার জনসাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন টেলিফোন ব্যবস্থা বা ইস্পাত কারখানায় ব্যাপক ধর্মঘট কী রকম ক্ষতিকর হতে পারে। বিচারক এলান গোল্ডস্‌বরো (Alan Golds-

borough) জন লুইকে যে বিখ্যাত পাঠ দিয়েছিলেন তার অনেক আগেই আমরা জানতাম যে রেলরোডে বা কয়লা শিল্পে বিলম্বিত শ্রম বিরোধ সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। সুতরাং, ১৯৪৬-১৯৪৭ ধর্মঘটের স্রোতের পর ট্যাফ্‌ট্ হাউলি আইনের রচয়িতারা যে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শ্রম বিরোধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এ সম্পর্কে তাঁর আগের ক্ষমতাও কিছু ছিল: রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর সম্মান যার ফলে তাঁর পক্ষে ১৯০২ কয়লা ধর্মঘটে থিয়োডর রুজভেল্ট যেমন করে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তেমনি করে ঘরোয়াভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় এবং ১৯২৬ সনের রেলওয়ে লেবার এ্যাক্ট-এর ফলে অর্জিত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা যা অতিব্যবহারে এখন জীর্ণ। কংগ্রেস তারপর আরো এগিয়ে গিয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতির হাতে এমন ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল যার ফলে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হয়ে আশী দিন পর্যন্ত হানিকর ধর্মঘট বন্ধ রাখার জন্য আদালতের ইনজাংশন প্রার্থনা করতে পারেন। যদিও শ্রীযুত ট্রুম্যান ট্যাফ্‌ট্ হার্টলি আইনে ভেটো প্রয়োগ করে এর জরুরী বিধানগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ অভিমত জানিয়েছিলেন, তবু তিনি নিজে ১৯৪৮ সনে সাতবার একে ব্যবহার করেছিলেন এবং দ্বিতীয় কার্যকালের সময় করেছিলেন তিনবার। তিনি অবশ্য খুব সংযতভাবে এই আইন প্রয়োগ করেছিলেন, কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত কম অশান্ত সময়ের রাষ্ট্রপতি শ্রী আইজেনহাওয়ার এ ধরণের ক্ষমতা জাহির করতে ট্রুম্যানের চেয়ে অনেক বেশী অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তাঁর কার্যকালের প্রথম সাত বছর সাত বার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। ১৯৫৯ সনের ডক ও ইস্পাত ধর্মঘট ট্যাফ্‌ট্ হার্টলি আইনের দ্বিতীয় ধারার (Title II) সীমাবদ্ধতা শোচনীয়ভাবে তুলে ধরেছিল। ধরে নিতে পারি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য আইনের খসড়ায় আরো ব্যাপক জরুরী ক্ষমতার বিধান থাকবে।

ব্যাপক ধর্মঘটে যাতে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য আমরা যে উপায়ই অবলম্বন করি না কেন এটা স্পষ্ট যে আগামী দিনে এই ধরণের শ্রম বিরোধে রাষ্ট্রপতির হৃদয়াবেগ, মনন ও রাজনীতিবোধ একটি ভূমিকা গ্রহণ করবে। এ রকমের দ্বন্দ্বে তার নিজের ভূমিকা খুবই অস্বস্তিকর।

জনস্বার্থের চূড়ান্ত অভিভাবক হিসাবে তাঁর ভূমিকা পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত, ক্ষমতা ব্যবহারে বিচক্ষণতা থাকা কর্তব্য। বিশেষ করে তাঁকে দেখতে হবে যে এমন কিছু তিনি করবেন না যার ফলে সংশ্লিষ্ট একপক্ষ রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ আহ্বান করতে প্রলুব্ধ হয়। তাঁকে বুঝতে হবে এ পর্যায়ে তাঁর ক্ষমতা হচ্ছে জরুরী ক্ষমতামাত্র, সরকারের সাহায্যে শ্রমবিরোধের আপোষ মীমাংসা বা যৌথ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার যে সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি আছে তা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে দিকে নজর রাখা কর্তব্য। যে বিরোধ স্বাভাবিক ভাবে মিটমাটের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে জড়িয়ে পড়া তাঁর মর্যাদার অনুকূল হবে না। সাধারণ আইন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই এর মীমাংসা বাঞ্ছনীয় তা যতই বিলম্বিত হোক না কেন। অন্যথায় তিনি সরকারী হস্তক্ষেপের কাঠামোকেই বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। শ্রমিক মালিক সম্পর্কে সমতা আনা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী রূপায়ণে একাগ্রতা প্রকাশ করা রাষ্ট্রপতির অন্যতম কর্তব্য।

তাঁর ক্ষমতা সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষভাবে কার্যকরী। আশার কথা এই যে অর্থ নৈতিক পরিবেশে মানুষ স্বার্থপর হয়ে সাফল্যলাভ করে—সেখানে অন্ততঃ একটা সীমারেখা টানা হয়েছে যার গণ্ডী সংশ্লিষ্ট পক্ষরা শাস্তির ভয়ে অতিক্রম করবেন না এবং আমাদের এক উচ্চ সেরিফ সেই অঞ্চল পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রথম অধ্যায়ে সমৃদ্ধির প্রবর্তক বলে রাষ্ট্রপতির যে ভূমিকার উল্লেখ করেছিলাম তার জের টেনে এই আলোচনা শেষ করতে চাই। রাষ্ট্রপতি এখন আর্থিক সংকটের সূচনাতেই তৎপর হবেন এটাই প্রত্যাশা করা হয়—বিপর্যয়ের পরে নয়। এই সূত্রে তাঁর ক্ষমতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এই ভূমিকার যথাযথ তাৎপর্যের পর্যালোচনার সময় এখনো আসে নি কিন্তু এটুকু বলা যায় এর বিশিষ্টতা এখনই লক্ষ্যণীয়। আগামী আর্থিক মন্দায় রাষ্ট্রপতি, যিনিই হোন না কেন, বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো ভূমিকা পরিগ্রহ করবেন সন্দেহ নেই।

আমি এই বই-এ একটা কথা বার বার বলেছি—রাষ্ট্রপতিত্ব একটি নিতান্ত ভাবেই গণতান্ত্রিক কার্যালয়। এর আজকের চেহারার অনেকটাই জনসাধারণের দান; রাষ্ট্রপতি সমর্থনের জন্য জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল, তারাও অভিভাবকত্ব ও শৃঙ্খলার জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী। আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্বের

বিবর্তনে একটি চতুর্থ শক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য : সে হচ্ছে সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্রম-বর্ধমান চূড়ান্ত ভূমিকা। অধুনা এই সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আমরা ক্রমেই অধিকতর সচেতন হয়ে উঠছি। আমরা যখন পরস্পরের বাক্ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি, যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবি স্বীকার মন্থরতার আশ্রয় নেই তখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ থেকে আমাদের অস্বস্তির কারণ ঘটায়। আমরা যত বেশী এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছি, জন প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রপতি তত বেশী স্বাধীনতার অনুকূলে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে মর্যাদা মণ্ডিত হয়ে উঠছেন।

অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রেও তাঁকে তীব্র বিধি-নিষেধের বেড়াজালের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক দলের কোন অংশ হয়তো বর্ণ-বিদ্বেষেই লাভবান হচ্ছে, জনমত হয়তো কোন ব্যাপারে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে, কংগ্রেস হয়তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রপতির ন্যূনতম কার্যসূচী ও গ্রহণে পরাঙ্মুখ। তবু তিনি যদি সহানুভূতিশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তবে অনেক কিছুই করতে পারেন, তিনি যদি নিরুত্তাপ কর্মহীনতা ও উদগ্র গণদাবির মধ্যে একটা মধ্যপথ অনুসরণ করতে সক্ষম হন তবে আমেরিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় বিশেষ কৃতকার্য হতে পারবেন। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা করা হচ্ছে এর মধ্যে দুই একটা আমাদের গত তিন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সৃষ্টি :

তিনি কংগ্রেসকে অনুরোধ করতে পারেন বিশেষ কোন আইন মঞ্জুর করতে —যেমন করে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮-এ দশটি বিতর্কিত ব্যবস্থা (চাকুরীর ক্ষেত্রে ন্যায্য আচরণ পরীক্ষা সংস্থা থেকে আরম্ভ করে কলম্বিয়া জেলার স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব পর্যন্ত) অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করে কংগ্রেস বাণী পাঠিয়েছিলেন বা যেমন করে আইজেন হাওয়ার সাধারণ নাগরিক, অঙ্গরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রপতির ও কংগ্রেসের নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের হুমকি দেবার সম্ভাবনার কথা ভেবে এই মর্মে ক্ষমতা চেয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেন সরাসরি এ ধরণের অভিযোগ আদালতের নজরে আনতে পারে ; মুখ্য আইনপ্রণেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতির সমস্ত ক্ষমতাই উনি অনিচ্ছুক কংগ্রেসের উপর জাহির করে এবম্বিধ আইন মঞ্জুর করাতে পারেন।

তিনি 'অনুদার' আইনে ভেটো দিতে পারেন যেমন রাষ্ট্রপতি ক্লিভল্যাণ্ড, ট্যাকট ও উইলসন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশেচ্ছুদের অক্ষর জ্ঞান পরীক্ষা করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন (অবশ্য ১৯১৭ সনে উইলসনের ভেটো সত্ত্বেও এ ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয়েছিল)। যতদিন সুপ্রীম কোর্ট বাক্‌-স্বাধীনতা ও বর্ণ বৈষম্যের ব্যাপারে প্রগতিশীল ভূমিকা পরিগ্রহ করে যাবে ততদিন ক্রুদ্ধ কংগ্রেসের আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা থেকে যাবে এবং রাষ্ট্রপতির হাতে অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত আইনে ভেটো দেবার ক্ষমতা আছে তার চেয়ে বড়ো আর কি রক্ষাকবচ থাকা সম্ভব যা বিচারালয়ের অধিকার খর্ব করার কংগ্রেসীয় সম্ভবপর প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে সচেষ্ট হতে পারে।

সমরাধিনায়ক হিসাবে যে ক্ষমতা তাঁর আছে তার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবপর। রুজভেল্টের মতো তিনিও কার্যনির্বাহবিভাগের অনুশাসনের সাহায্যে F. E. P. C. প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধকালে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারেন, ট্রুম্যানের মত তিনিও সৈন্যবাহিনীতে সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রবর্তনীয় একটি রাষ্ট্রপতির সংস্থা (Committee) সৃষ্টি করতে পারেন এবং আইজেনহাওয়ার যেমন তাঁর দুই পূর্ববর্তীর পথ অনুসরণ করে সৈন্যবাহিনীর সর্বস্তরে বর্ণ-বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষেও সে রকম কার্যসূচী গ্রহণ করা সম্ভব। রাষ্ট্রপতির প্রধান সমরাধিনায়কের ভূমিকাকে ধন্যবাদ, আমেরিকার সামরিক ঘাটিগুলিতে বর্ণ-বিভেদের সঙ্কোচনে রাষ্ট্রপতির অবদান যে কত বেশী তা খুব কম আমেরিকাবাসীই জানেন।

প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবেও তিনি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে অনুজ্ঞা দিতে সক্ষম। ১৯৪৮ সনে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থায় বর্ণবৈষম্যের প্রতিকূলে আদেশ জারী করেছিলেন, রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার সরকারী ঠিকাদাররা সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার সময় যাতে সকলকে চাকুরীর সমান সুযোগ দেয় তা দেখবার জন্য একটা কমিটি স্থাপন করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির নিয়োগকর্তা হিসাবে যে ক্ষমতা আছে তার যথাযথ প্রয়োগে সুপ্রিম কোর্টকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন অথবা সামাজিক অধিকারের পৃষ্ঠপোষক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ দিতে পারেন। যে সমস্ত পদাধিকারী বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজী নন অথবা এবম্বিধ কার্যসূচী বিপর্যস্ত করে দিতে যথেষ্ট

তাঁদের পদচ্যুতির আদেশ দেওয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভবপর, তবে যে আলোড়ন এতে উঠবে তার ঝাপ্টা অবশ্য সহ্য করতে হবে।

আইন প্রয়োগে তাঁর মুখ্য সহযোগী হচ্ছেন এ্যাটর্নি জেনারেল। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে সংখ্যালঘু সংস্থাসমূহ যাতে ন্যায়বিচার ও সাহায্য পায় তা দেখবার জন্য একে ক্রমাগত কর্মতৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আইজেনহাওয়ারের মতো বিচারালয়কে সাহায্য করার মানসে শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্যের অবসান দাবি করে ব্যক্তিগত মামলা দায়ের করতে তিনি এটর্নি জেনারেলকে অনুরোধ করতে পারেন। ট্রুম্যানের মত তিনি এঁকে United State Code-এর Title 18, Chapter 13, Section 241-242 ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলতে পারেন। ১৮৭০ সন থেকে এই আইন কোন নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত অধিকারকে ক্ষতি করে এমন কার্যকলাপ যুক্তরাষ্ট্রীয় এক্তিয়ারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে আসছে। এই আইন প্রয়োগ করা সহজ নয় তবে মধ্যে মধ্যে এই বিধানে শাস্তি হয়েছে তাও দেখা গেছে। Federal Burean of Investigation-কেও রাষ্ট্রপতি এই ধরণের অপরাধের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে আদেশ করতে পারেন। ১৮৫৭ সনের Civfl Rights Act-এর বিধানবলে বিচার বিভাগ কেন্দ্রীয় আদালতে নিগ্রো ভোটদাতাদের বিরুদ্ধে অঙ্গরাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনে ইনজাংসন জারীর দাবি জানাতে পারেন। এই আইন রাষ্ট্রপতির শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

দেশের স্বাধীন পরিবেশ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে সে বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করার জন্য প্রথিতযশা নাগরিকদের নিয়ে সংস্থা (commission) গঠন করার ক্ষমতা তার আছে বা কংগ্রেস এ রকম কোন সংস্থা গঠন করলে তার সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করার অধিকারও তাঁর আছে। শ্রীযুত ট্রুম্যানের সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত সংস্থা (Committee on Civil Rights)-এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের এক অগ্রণী দৃষ্টান্ত। ১৯৪৭ সালে এই সংস্থা এক স্মরণীয় স্মারকলিপিতে এই পর্যায়ে আমাদের অগ্রগতির বিশেষ বিবরণ দিয়েছে।

ন্যায়বিচার ও মনুষ্যত্বের পক্ষে তিনি তাঁর কতগুলি পুরাতন অথচ সম্মানজনক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেনঃ যেমন অপরাধীর জাতিত্বের উপর ভিত্তি করে যেখানে গুরুতর শাস্তির নিদান দেওয়া হয়েছে সেখানে তিনি

দণ্ডমকুবের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, রাষ্ট্রপতির আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে যে ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করে জাতিসংহার (genocide) নিবারণের সর্বশক্তি প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন (সেনেটের সহযোগিতা বাদেও). নিজের দলের পরিচালক হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদে স্থান দিতে পারেন।

District of Columbia-তে বর্ণ বৈষম্যের অবমাননাকর পরিবেশ আছে তা দূর করার জন্য বিশেষভাবে তিনি সচেষ্ট হতে পারেন। ট্রুম্যান অবশ্য যথার্থই বলেছিলেন যে প্রশাসনিক অনুজ্ঞা দিয়েই এই জেলায় জাতি বৈষম্যমূলক কার্যবিধি তিনি বন্ধ করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন না, তবু রাষ্ট্রপতি কয়েকটি অনুত্তেজক অনুজ্ঞা বা কয়েকটি ভাল দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক কিছু করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ১৯৫৩ সালে এ্যাটর্নি জেনারেল ব্রাউনেল সুপ্রিম কোর্টে তীব্র প্রতিবাদ করায় বিচারালয় ওয়াশিংটনের রেস্তোঁরায় বর্ণ-বৈষম্যমূলক কার্যবিধির বিরুদ্ধে যে আইন প্রচলিত ছিল তা বলবৎ করেন। ফলে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত একজন জেলা কমিশনার রেস্তোঁরা মালিকদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঐ আইন মেনে চলতে আদেশ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'লিটল রক' কথাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেবার নিশ্চয়ই দরকার নেই যে এই বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির আরো একটি ক্ষমতা আছে কিন্তু এই সম্ভাবনাপূর্ণ সত্যকে স্বীকার করতেই হবে যে রাষ্ট্রপতির আমেরিকার শান্তিরক্ষার্থে সেনাবাহিনী নিয়োগ করার যে ব্যাপক ক্ষমতা আছে তা ১৯৫৭-এর সেপ্টেম্বরে আইজেনহাওয়ার যে রকম পরিস্থিতিতে ব্যবহার করেছিলেন সে রকম অবস্থায় তিনি ব্যবহার করতে পারেন। সেই বিরাট সাংবিধানিক ও সামাজিক সঙ্কটে রাষ্ট্রপতি পরিমিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন কিনা বা যথেষ্ট বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন কিনা তা বহুদিনের তর্কের খোরাক জোগাবে—কিন্তু এ কথা উল্লেখযোগ্য যে যেদিন তিনি শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেই দিনই রাষ্ট্রপতি সৈন্যশক্তির সাহায্যে কেন্দ্রীয় আদালতের বর্ণভেদ পরিপন্থী রায় কার্যকরী করতে কতদূর যেতে পারেন সে সম্বন্ধে সকল বিতর্কের অবসান হয়েছিল। তিনি যদি শস্ত্রশক্তির সাহায্যে আমেরিকার জাতীয় জীবনে ন্যায় ও নীতির বিপুলতর প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী করতে নাও পারেন, অন্ততঃপক্ষে পথকে সুগম রাখতে নিশ্চয়ই পারেন।

পরিশেষে বক্তব্য, জাতির প্রতিভূ হিসাবে তাঁর ক্ষমতা তিনি এমন ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন যার ফলে আমেরিকার গণতন্ত্রকে বলবতী করার পক্ষে যারা সক্রিয় তাঁরা অনুপ্রাণিত হন আর যারা আদিমযুগের বর্বরতার দিকে একে ঠেলতে চান তাঁরা পরাহত হন। আরো ভালো করে বলা যায় রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা এমন ভাবে প্রয়োগ করবেন যার ফলে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যখন তিনি সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হানেন তখন এই মহান কার্যালয়ের নৈতিক মহত্ত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারি, যখন তিনি দক্ষিণের অঙ্গরাষ্ট্রীয় নেতাদের নতুন যুগের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার জন্য শান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়েন তখন এই কার্যালয়ের মর্যাদা শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে বর্ণভেদ দূর করার যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের জন্য নিশ্চিতভাবে পর্যায়ক্রমে এই কার্যালয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি দরকার।

আমি জানি, এই পর্যালোচনায় আমি একটা দিকেই আলোকসম্পাত করেছি। সময় সময় রাষ্ট্রপতিরা চরম ঔদাসীন্যে সামাজিক অধিকারের দাবীকে উপেক্ষা করেছেন, কখনো এমন কি শক্তিপ্রয়োগে তা খর্ব করেছেন। প্রশান্ত সৈকত (Pacific coast) থেকে সমস্ত জাপানী বংশোদ্ভূতদের অপসারণের যে আদেশ ১৯৪২ সনে রুজভেল্ট দিয়েছিলেন বা ট্রুম্যান-আইজেনহাওয়ার-এর আনুগত্য ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে অনুসৃত কার্যাবলী প্রমাণ করে যে অত্যন্ত বিবেকী রাষ্ট্রপতিও ভুল করতে বা মন্দ কাজ করতে বাধ্য হতে পারেন। আমি আগেই বলেছি যে রাষ্ট্রপতিকে অনেক সময়েই ধীর স্থির ভাবে কাজ করতে হয়—সম্ভাবনার সীমা সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকতে হয়। দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার ধূল্যবলুণ্ঠিত হবার প্রত্যেক উদাহরণই রাষ্ট্রপতির উষ্মা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়, বিশেষ করে যখন বিচারক ও জুরীরা এ কাজ করেন। যদি তিনি তাঁর অন্যান্য কাজে সহযোগিতা চান তবে সমগ্র জনসমাজের এক অংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে বা জনমতের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধ করলে তার চলবে না। তবু সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনি এক শক্তিশালী পক্ষ এবং এখন থেকে আমেরিকার গণতন্ত্রের বিবেকী ও সবল ডান হাত হিসাবে কাজ করে যাওয়া ছাড়া রাষ্ট্রপতির গত্যন্তর নেই।

রাষ্ট্রপতিত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কাঠামোতে, ক্ষমতায় নয়, যদিও ক্ষমতার নতুন রূপায়ণের ফলেই কাঠামোর এই পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন দায়িত্ব যখন এসে পড়তে লাগল, রাষ্ট্রপতি নানাভাবে তাঁর শক্তি বাড়িয়ে তার মুখোমুখী হতে আরম্ভ করলেন। একদল সহযোগী তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন বলেই রাষ্ট্রপতি সফলতা লাভ করেন। এই বিরাট কার্যালয়ের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রাষ্ট্রপতির কার্যনির্বাহক সংস্থা যার এক হাজার কর্মচারীর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা। কার্যনির্বাহক সংস্থা তাঁর জন্যেই, এ কাজে তিনি অক্ষম।

ফ্রাঙলীন রুজভেল্ট ৭৬তম কংগ্রেসের সহযোগিতায় ১৯৩৯ সালে এই সংস্থা স্থাপন করেন। তিনি তাঁর কার্যকালের প্রথম পর্যায়ে অনুভব করেছিলেন যে কার্যনির্বাহক হিসাবে তাঁর সাফল্য আরো বেশী হতে পারত যদি একদল দক্ষ সহযোগী তাঁকে সাহায্য করতেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই এই সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অবশ্য প্রথম এই আবিষ্কার করেন নি। নববিধানের (New Deal) ফলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বাড়ার অনেক আগে, জাতীয় সরকারের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকরা (এদের মধ্যে রাষ্ট্রপতিরাই সবচেয়ে বেশী সরব ছিলেন) কংগ্রেস ও জাতির মনোযোগ জনচেতনার মুখ্য অভিব্যক্তি রাষ্ট্রপতিত্বের অসহায়তার দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। শ্রীরুজভেল্ট সমস্যার আমূল সমাধানে প্রয়াসী হলেন। বড়ো বড়ো সমস্যা বিশেষ কমিশনের বিবেচনাধীন করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি, ১৯৩৬ সালে তিনি "President's Committee Administrative Management" নামে এক কমিটি গঠন করলেন। সভাপতি লুই ব্রাউনলো, সহযোগী চার্লস মেরিয়াম ও লুথার গালিক এর সুযোগ্য নেতৃত্বে একদল যশস্বী গবেষক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সমস্ত বিভাগে ব্যাপক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলেন। রাষ্ট্রপতিত্বের উপরই সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া হ'ল। ১৯৩৭ সনের জানুয়ারী মাসে কমিটি তার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে এক সংক্ষিপ্ততম মন্তব্যের মাধ্যমে জানালো—রাষ্ট্রপতির সাহায্য দরকার। কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত পাঠাবার সময় শ্রীরুজভেল্ট রাষ্ট্রপতিত্বের শোচনীয় অবস্থার এই চিত্র তুলে ধরলেন :

কমিটি আমাকে রেহাই দেয় নি ; বিশ বছর ধরে আমরা যা জানি তাঁরা তাই বলেছেন রাষ্ট্রপতি যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ ; তিনি

অতিরিক্ত কর্মভারে অবনমিত, তাঁরা আরো বলছেন যে প্রচলিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করা অসাধ্য কারণ সরকারের সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনাবশ্যক আলাপ আলোচনা ও ছোট খাটো ব্যাপারে মগ্ন থাকতে হয়। আমি এর যাথার্থ্য স্বীকার করি। বার বার আমার পূর্ববর্তীরা ঠিক এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁদের মত আমিও নিজের দোষ স্বীকার করছি।

শাসন সংক্রান্ত বিভাগের সর্বস্তরে রাষ্ট্রপতির এই কমিটির বহুবিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলো প্রযোজ্য ছিল। রাষ্ট্রপতির গুরুভারই এর প্রধান বিচার্য সমস্যা ছিল, এর সমাধানে কমিটির অভিমত ছিল এই যে ছ'জন কার্যনির্বাহক সহযোগী ও একদল প্রশাসনিক কর্মচারী রাষ্ট্রপতিকে বাজেট, কর্মসূচী ও ব্যক্তিগত অনুশাসন এর ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে রাষ্টপতির মনোনীত বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে যে-ঝড় উঠেছিল (Court packing Scheme) তার ঝাপ্টায় এই সব প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল ৭৫তম কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে স্বৈরতন্ত্রী বলে অভিযোগ আনলো। দু'বছর পরে কংগ্রেস নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ও রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যনির্বাহক সংস্থার সংস্কারকল্পে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করলো, "Committee on Administrative Management"—অবশ্য ঢালাও ফতোয়া জারি করেছিল যে কার্যনির্বাহক সংস্থার একশ প্রশাখাকে ঢেলে এমন করে সংখ্যায় ছোট করে ফেলা হউক যার ফলে প্রত্যেক কাযনির্বাহক সহযোগী এক একটা শাখার কর্ণধার হয়ে বসতে পারেন। কিন্তু পুনর্গঠন আইনে (Re-oganization Act) স্পষ্ট ভাষায় রাষ্ট্রপতিকে উনিশটি প্রশাখার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, এর মধ্যে অসামরিক বিনিয়োগ কমিশনও ছিল। এগুলো বাদে অবশ্য রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রশাখাগুলোর উপর ইচ্ছামত কর্তৃত্ব বহাল রইল।

৮২৪৮ সংখ্যক প্রশাসনিক অনুজ্ঞায় (৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করলেন। শ্রীগালিক বলেছিলেন যে জনসাধারণের দৃষ্টি, এ আকর্ষণ করে নি সত্য, তবু আমেরিকার ইতিহাসে এই অনুজ্ঞা এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই অনুজ্ঞায় কার্যনির্বাহক সংস্থা স্থাপনার প্রস্তাব ছিল, সংস্থাকে ছ'টি প্রশাখায় ভাগ করার সিদ্ধান্ত ছিল এবং Committee on

Administrative Management-এর নির্দেশানুসারে রাষ্ট্রপতিকে ব্যক্তিগত সহযোগী নিয়োগ করার ক্ষমতা দেবার কথা ছিল। অধ্যাপক লিওনার্ড হোয়াইট-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যে সরকারী কার্যনির্বাহক সংস্থার প্রশাসনিক পুনর্গঠনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে এক মনোরম আলোচনা রয়েছে। কার্যনির্বাহক সংস্থার গঠনে নিম্নলিখিত কারণগুলো কাজ করছিল বলে অনুমিত হয়েছিল :

(১) প্রধান কার্যনির্বাহক যাতে যথাযথভাবে সময় মত সব সংবাদ পান।

(২) সমস্যা অনুধাবনে ও ভবিষ্যতের কার্যক্রম নির্ধারণে তাঁকে সাহায্য করা।

(৩) তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেন তাড়াতাড়ি তাঁর ডেস্ক এ যায় তা দেখা, কাগজপত্র এমন ভাবে সাজিয়ে দেওয়া যার ফলে তাড়াতাড়ি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় এবং রাষ্ট্রপতিকে অবিবেচিত দ্রুত সিদ্ধান্তের হাত থেকে রক্ষা করা।

(৪) যে সব ব্যাপার অন্যত্র বিবেচিত হলে চলবে সে সমস্ত তাঁর কাছে উপস্থাপিত না করা।

(৫) তাঁর সময় বাঁচানো।

(৬) অধীনস্থ কর্মচারীরা যাতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে তার জন্যে বিধিবদ্ধ পন্থা ও প্রশাসনিক অনুজ্ঞার পরিকল্পনা করা।

এর চেয়ে আরো গভীর কারণও ছিল। এ ব্যবস্থা একজন সাধারণ কার্যাধ্যক্ষের জন্য ছিল না—এ ছিল স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে কর্তব্যের গুরুভার থেকে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা সেই কারণ অবিলম্বে আলোচিত হবে।

১৯৩৯ সনের সংকট থেকে আজ পর্যন্ত কার্যনির্বাহক কার্যালয় অতি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে আসছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একেবারে ত্রুটিহীন না হলেও রাষ্ট্রপতিকে এবং জাতিকে প্রশংসনীয়ভাবে সেবা করে গেছে এবং জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক কার্যবিধির এক সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা এর মধ্যে দেখা গেছে, রাষ্ট্রপতিত্বের নবরূপায়ণেও সাহায্য করেছে। গত কয়েক বছর ধরে রুজভেল্টের বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত রুজভেল্টকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসনকর্তা বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করেছেন।

৮২৪৮ সংখ্যক কার্যনির্বাহক অনুজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিচিত রায় একটু ধোঁয়াটে মনে হয়। গত তিন রাষ্ট্রপতির আমলে কার্যনির্বাহক সংস্থার কি কি

পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে সম্বন্ধে ক্লান্তিকর আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে আমি আজকের সংস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা ক'রব। রাষ্ট্রপতির কর্মচারীদের এ ভাবে ভাগ করা যায়।

রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে হোয়াইটহাউস কার্যালয়, এর জন্য চব্বিশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগত সাহায্যকারী এবং আবার এঁদের জন্য চব্বিশ সাহায্যকারী ও ৩৫০ জনের মত স্টেনোগ্রাফার, বার্তাপ্রেরক, কার্যসচিব যাদের কাজ হচ্ছে কাগজপত্র, চিঠি এবং সাহায্য প্রার্থনায় ঝুরি ঝুরি আবেদনপত্র বাছাই করা। যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিরই ক্ষমতা আছে নিজের সুবিধানুযায়ী তাঁর কাজ ভাগ করে দেওয়ার, তবু হোয়াইটহাউসের কিছু কিছু পদের বেশ খানিকটা স্থায়িত্ব এসে গেছে, যেমন, রাষ্ট্রপতির সহায়ক, সংবাদ সচিব, কর্মচারী সচিব, বিশেষ পরামর্শদাতা, কেবিনেট সচিব, নিয়োগ সচিব, কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ও মুখ্য ভাষণ লেখক। এঁদের সঙ্গে যুক্ত আছেন গুচ্ছের সহকারী তাদের কাউকে বলা হয় স্পেশাল বা বিশেষ সহকারী, আবার কাউকে বলা হয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা প্রশাসনিক সহকারী—এঁদের কাজ হচ্ছে আর্থিক ব্যাপারে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে, সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপারে, অঙ্গরাষ্ট্রদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে ও বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যাপারে, নিরস্ত্রীকরণ-সম্পর্কীয় ব্যাপারে, বাড়তি কৃষিপণ্য সম্পর্কে ও অন্তরীক্ষে নিরাপত্তার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি যে সব ক্ষেত্রে নিজে মনোযোগ দিতে সময় পান না সে সব ক্ষেত্রে তাঁর হয়ে দায়িত্ব পালন করা। রাষ্ট্রপতি আবার বিশেষ-বিশেষ পদাধিকারীদের আহ্বান করতে পারেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করার জন্য, যেমন আইজেনহাওয়ার Atomic Energy Commission-এর সভাপতি লুই স্ট্রাসকে ও Civil Service Commission-এর সভাপতি ফিলিপ ইয়াঙ্গকে করেছিলেন। তিনি আবার বিভিন্ন পদাধিকারীদের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁদের অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিজ কার্যালয়ে নিযুক্ত করতে পারেন। পরিশেষে সামরিক বিভাগের প্রত্যেক প্রশাখার জন্য একজন করে সহকারী রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট হয়েছিল রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় প্রতিরক্ষায় আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও সামরিক নীতির সমতাকরণে সাহায্য করার জন্য। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রসচিব ও প্রতিরক্ষা সচিব ও সামরিক

এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি কার্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ বর্তমানে এই পরিষদের সদস্যপদভুক্ত। এই আন্তর্বিভাগীয় পরিষদের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব একজন কার্যসচিবের নেতৃত্বে একদল স্থায়ী কর্মচারীর উপর ন্যস্ত। জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বাইরে (এবং কার্যনির্বাহক সংস্থার সঙ্গেও পুরাপুরি ভাবে যুক্ত নয়) কাজ করছে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি। যৌথ সর্বাধিনায়কবৃন্দ ও রাজস্ব সচিব আমন্ত্রণক্রমে উপরে উল্লিখিত পরিষদের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে পরিষদকে একটি বিশেষজ্ঞদের ক্যাবিনেট বলা যেতে পারে যার কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার বৈদেশিক ও সামরিক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া। ১৯৫৭ সনে পরিষদ এক "অপারেশনস কো-অর্ডিনেটিং বোর্ড" স্থাপন করেছিল পরিষদের নীতি সত্বর কার্যে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায়। বলা বাহুল্য পরিষদের নীতি মানে এই দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় রাষ্ট্রপতির নীতি। জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ্ ও অপারেশনস কো-অর্ডিনেটিং বোর্ডের মিলিত সভ্যসংখ্যা ষাট।

এম্প্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট ১৯৪৬ বিধানবলে তিনজন অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞ ও তাদের তিরিশজন কর্মচারী সমেত এক অর্থনৈতিক পরামর্শ সংস্থা স্থাপিত হয় এবং ঐ সংস্থার উপর রাষ্ট্রপতিকে বার্ষিক অর্থনৈতিক বিবরণীর প্রস্তুতিতে সাহায্য করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থিক বিবর্তনের গতি সম্বন্ধে সময়মত প্রামাণ্য সংবাদ সংগ্রহ করার দায়িত্বও এর ছিল, আর ছিল এই সংবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে বিবরণী পাঠানোর দায়িত্ব। বহুলতম চাকুরী, উৎপাদন এবং ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রচেষ্টা মানসে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো এর অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতি বা আইন সম্পর্কে যে সমস্ত পরামর্শ চাইবেন সে সমস্ত ব্যাপারে বিবরণী প্রস্তুত করা ও রাষ্ট্রপতিকে তা পাঠানো এর দায়িত্বের অংশীভূত। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন সমস্ত ব্যাপারেই এই সংস্থা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে। একে বাদ দিলে রাষ্ট্রপতির সচ্ছলতার নায়কের ভূমিকা একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। ১৯৫৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রশাসন ও সামরিক প্রস্তুতি কার্যালয়কে এক করে ১৯৫৮ সালে সামরিক ও অসামরিক প্রস্তুতি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এর দায়িত্ব হচ্ছে সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা

সম্পর্কীয় অসামরিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করা, এর সম্বন্ধে পরিকল্পনা করা ও সর্বপ্রকার সমন্বয় সাধন করা। এই ভাবে এই কার্যালয় রাষ্ট্রপতির প্রধান সমরাধিনায়কের ভূমিকার অনেক পর্যায়েই তাঁকে সাহায্য করে থাকে। কার্য-নির্বাহক কার্যালয়ের মধ্যে O. C. D. M -এর অবস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ১৬০০ কর্মচারী অধ্যুষিত এই এজেন্সিকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অঙ্গাঙ্গী অংশ বলা অনুচিত হবে। গভর্ণমেণ্ট অরগানাইজেসন্স্ ম্যানুয়াল-এর নিরুক্তাপ যুক্তির অনুসরণে আমরা হয়তো বলতে পারি যে O. C. D. M.-এর শীর্ষস্থানীয় তিন-চারজন কার্যাধ্যক্ষ মূলতঃ রাষ্ট্রপতির সহকারী। কিন্তু তাই যদি হবে তবে অসামরিক বিনিয়োগ সংস্থাকে কার্যনির্বাহক কার্যালয়ের অংশ বলে ধরা হবে না কেন?

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাজেট ব্যুরো যাকে রিচার্ড নিউস্টাড্ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সবচেয়ে পুরাতন এবং দৃঢ় অংশ বলে অভিহিত করেছেন। এর কাজ হচ্ছে সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা। ১৯৩৯ সনে ব্যুরোকে রাজস্ব বিভাগ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে, কার্যনির্বাহক কার্যালয়ের প্রথম দু'টি প্রশাখার একটি হচ্ছে এই ব্যুরো এবং যখন অন্যান্য প্রশাখা বিলীন হয়ে যাবে তখনও এ আজকের মতই কাজ করে যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর সাহায্য না পেলে প্রধান কার্যনির্বাহক বা প্রধান আইন প্রণেতার ভূমিকা পরিগ্রহ করা রাষ্ট্রপতির অসাধ্য। রাষ্ট্রপতিকে বাজেট প্রস্তুতি সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে এ, সরকারী কার্যে দক্ষতাবৃদ্ধি ও ব্যয়সঙ্কোচ করার জন্য নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই প্রতিষ্ঠান ক'রে থাকে। রাষ্ট্রপতিকে কার্যনির্বাহক অনুজ্ঞা (executive order) ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুতিতে এ সাহায্য করে এবং প্রস্তাবিত আইনের খসড়া ও তালিকাবদ্ধ খসড়ার আদান-প্রদানের কেন্দ্র (clearing house) হিসেবেও কাজ করে। রাষ্ট্রপতিত্বের দায়িত্বের পটভূমিকায় এর স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে এর Legislative Reference সংক্রান্ত সংস্থা চূড়ান্ত হাঁ বা না বলা ছাড়া ভেটো সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেই পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। ৪২০ জন কর্মচারী এই ব্যুরোতে কাজ করেন এবং অস্থিরমতি ছাড়া আর কেউ কখনো বলেন নি যে এর কমে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

চারটি মুখ্য এজেন্সির মধ্যে, বিশেষ করে হোয়াইটহাউস কার্যালয়ে একদল

সচিব, অধঃস্তন সচিব, বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন কমিশন কাজ করে যাচ্ছেন যাদের কেউ কেউ তাঁদের সময়ের কিছু অংশ কেউ বা সবটাই প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতির কাজে ব্যয় করেন। হোয়াইটহাউস কার্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সব রকম কাজে মানিয়ে চলার ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতি তাঁর সহকারীদের মধ্যে ইচ্ছামত কাজ ভাগ করে দিতে পারেন, আন্তর্বিভাগীয় কমিটি বা সংস্থা স্থাপন বা বিলোপ করতে পারেন, কার্যনির্বাহক বিভাগের যে কোন লোককে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে আদেশ করতে পারেন এবং পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতিদের মতো সাধারণ নাগরিকদের পরামর্শ নিতে পারেন। শ্রীআইজেনহাওয়ার নিজের ইচ্ছামত শেরম্যান এডাম্‌সকে মুখ্য কার্যাধ্যক্ষ করেছিলেন, উপরাষ্ট্রপতিকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ক্যাবিনেটকে একটি সমন্বয় সাধক সংস্থায় পরিণত করেছিলেন। রবার্ট মণ্টগোমারির কাছ থেকে টেলিভিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ নিতেন, উইলি মেইস-এর সঙ্গে আলোচনা করতেন অপরাধপ্রবণ নাবালকদের সমস্যা নিয়ে ও প্রয়োজনবোধে হোয়াইটহাউসে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্মেলন আহ্বান করতেন। তিনি একরকম ভাবে কাজ করে গেছেন, তাঁর পূর্ববর্তীরা অন্যভাবে এবং পরবর্তীরা নিশ্চয়ই আরো স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে যাবেন।

তবু এই যন্ত্রের মূল অংশগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা ভাল, বিশেষ করে বাজেট ব্যুরোর সঙ্গে যা এখন জাতীয় প্রশাসনের এক স্থায়ী অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও তাঁর একান্ত অনুগামীদের তিনিই নিয়োগ করেন, অধিকাংশ কর্মচারীই স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশেই কার্যনির্বাহক কার্যালয় সক্রিয় হয়ে উঠে, তবু কিছু সময় এ নিজের গতিবেগেই চলতে পারে। রাষ্ট্রপতিত্ব যে একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই—এ অবস্থা আমাদের অস্বস্তির কারণ নিশ্চয়ই এবং এ সম্বন্ধে শেষ অধ্যায়ে কিছু আলোচনা ক'রব—তবু এ অবস্থা অপরিবর্তনীয়ও। রাষ্ট্রপতি এখনও একজন মানুষ মাত্র, কিন্তু যেমন হাজার লোকের সাহায্যপুষ্ট মানুষের হয়ে থাকে, তিনি একটি প্রতিষ্ঠানও। এই যন্ত্রের অধিকাংশ চাকাই আপন গতিবেগে ঘোরে, রাষ্ট্রপতি অংশ গ্রহণ করুন বা নাই করুন। আইজেনহাওয়ারের অসুস্থতার সময় আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। হোয়াইটহাউস থেকে সময়

সময় যে সব অনুজ্ঞা, পরামর্শ বা খবর ফাঁস হয়ে যাবার দৃষ্টান্ত আমরা দেখে থাকি তার অধিকাংশ সম্বন্ধেই রাষ্ট্রপতি কিছুই জানেন না। আজকাল তিনি কি বলছেন. তাঁর হয়ে তাঁর সহকারীরা কি বলছেন ও তাঁর সহকারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত মত বলে কি চালাচ্ছেন সংবাদপত্র থেকে তা সতর্কভাবে অনুধাবন করতে হয়। এই পার্থক্য যদি ধরা সহজ না হয় তবেই বুঝতে হবে রাষ্ট্রপতি, হোয়াইটহাউস ও কার্যনির্বাহক কার্যালয় কী রকম একতাসূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে।

অধ্যাপক হোয়াইটের সহায়তায় আমি আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্বের যুগান্তকারী প্রশাসনিক এই বিবর্তনের মর্মার্থ আগেই আলোচনা করেছি। এর সাংবিধানিক তাৎপর্য আমার মতে আরো বেশী যুগান্তকারী। রাষ্ট্রপতিত্বকে এ বিংশশতাব্দীর প্রশাসনের এক যন্ত্র করে ফেলেছে। আমাদের তিন প্রধান বিভাগে বিভক্ত সরকারে রাষ্ট্রপতি এক একক অংশ। এর উপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্বের চাপ হাসিমুখে সহ্য করার ক্ষমতার উপরই এর উপযুক্ততা নির্ভর করে। এখন পর্যন্ত যৌথরাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে প্রবল বাকবিতণ্ডা এ স্তব্ধ করে দিয়েছে। সক্রিয় রাষ্ট্র রূপায়ণে এর অস্তিত্ব অটুট থাকবে এ ভরসা আমরা এর কাছ থেকে পেয়েছি।

৮২৪৮ নং কার্যনির্বাহক অনুজ্ঞা রাষ্ট্রপতিত্বকে সম্ভাব্য পঙ্গুত্বথেকে রক্ষা করেছে, সংবিধানকে রক্ষা করেছে আমূল পরিবর্তন থেকে। ৮,০০০,০০০ ডলারের (চারটি মুখ্য এজেন্সির জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ) রাষ্ট্রপতির কার্যনির্বাহক কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেটের সবচেয়ে মিতব্যয়ী অংশ।

রাষ্ট্রপতিত্বের উপর প্রায় তিনশ পাতার বই-এর পাতা সাতেক উপ-রাষ্ট্রপতির জন্য রেখে দেওয়া ভাল—যদিও এঁদের দুজনের ক্ষমতার যে বিরাট পার্থক্য আছে তা ৪০ : ১ অনুপাতে ভাগ করা যায় না। রাষ্ট্রপতিত্ব পৃথিবীর সর্বোত্তম নিয়মতান্ত্রিক কার্যালয় এক মহান নেতৃত্ব যার অধিকারী হবার জন্যে দেশের প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা লুব্ধ, দ্বিতীয় শ্রেণীদের কথা নাই বললাম। উপ-রাষ্ট্রপতিত্ব এক শূন্যকুম্ভ বিশেষ, রাষ্ট্রপতিত্বের উপর যাদের নজর নিবদ্ধ তাঁরা এই অস্বস্তিকর পদাধিকারকে বর্জন করে চলেন। ১৯৪৮ সন থেকে এর ক্ষমতা দৃশ্যতঃ কিছু বেড়েছে কিন্তু মূলতঃ আমেরিকার শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে এ এক নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক পদাধিকার।

উপরাষ্ট্রপতিত্ব আমাদের অন্যতম পুরাতন সমস্যা বিশেষ। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের কনভেনশনের তীক্ষ্ণধী কিছু সভ্য এর যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এবং হ্যামিল্টন ফেডারেলিস্ট-এ এর বিরুদ্ধে উচ্চারিত বহু সমালোচনার জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উপরাষ্ট্রপতিত্ব সৃষ্টির পেছনে তিনটি যুক্তিযুক্ত কাজ করেছিল বলে মনে হয়ঃ রাষ্ট্রপতির এক নিয়মতান্ত্রিক উত্তরাধিকারীর বন্দোবস্ত করা, প্রথম নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে "Continental characters" সৃষ্টি করার প্রয়াস পাওয়া এবং অঙ্গরাষ্ট্রীয় স্বার্থের উর্ধ্বে সেনেটের এক সভাপতির পদ সৃষ্টি করা। শাসনতন্ত্র রচয়িতৃবৃন্দ সেনেটে একজন আপোষকামী সভ্যের (যিনি; সমানভাগে সেনেট কোন ব্যাপারে ভাগ হয়ে গেলে তাঁর ভোটে কোন সিদ্ধান্তকে আইনানুগ করে তুলতে পারবেন) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁরা সাধারণভাবে আশা করেছিলেন যে জাতির দুই নম্বর রাজনৈতিক নেতাই এই পদ পূরণ করবেন যিনি রাষ্ট্রপতিত্ব নির্বাচনীতে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পাবেন। তাঁদের যুক্তি যতই প্রবল থাকুক না কেন, প্রত্যাশা যতই উঁচু হোক না কেন উপরাষ্ট্রপতিত্ব কিন্তু প্রথম থেকেই যে এক মূর্তিমান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তা কারো নজর এড়ায় নি। প্রথম উপরাষ্ট্রপতি জন এডাম্‌স্ দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমাদের দেশ নিজবিচারবুদ্ধি অনুসারে আমার জন্য পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট এক পদ সৃষ্টি করেছে"। এঁর উত্তরাধিকারী টমাস জেফারসন অনেকটা না বুঝেই এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেনঃ "সরকারের দ্বিতীয় পদাধিকার অনায়াসসাধ্য কিন্তু সম্মানিত, প্রথম এক গৌরবান্বিত দুর্দশা।" জাতির প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অনেকে উপ-রাষ্ট্রপতিকে "His Superfluous Excellency" (ফালতু শাসক) বলে অভিহিত করেছেন। ফেডারেলিষ্ট ও রিপাবলিকান পার্টির অভ্যুদয়, ১৮০০-১৮০১ জেফারসন-বার নির্বাচন জনিত দুর্ঘটনা ও তার ফলে শাসনতন্ত্রের দ্বাদশতম সংশোধনী এবং "Virginia Succession"-এর স্থাপনা ইত্যাদি নানা কারণে এই পদাধিকারের গৌরবচ্যুতি ঘটেছিল। যদিও প্রথম দুই উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন খ্যাতনামা এডাম্‌স্ ও জেফারসন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কিন্তু ছিলেন এল্‌ব্রিজ জেরি ও ডানিয়েল টম্‌কিন্‌স্, সপ্তম পদাধিকারী জন কালহাউন পদত্যাগ

করে সেনেটে যোগদান করেছিলেন। এরই মধ্যে কোথাও আবার থ্রটলবটম্ নামে ভাল এক উপরাষ্ট্রপতিও ছিলেন। সন্দেহ নেই এখনকার মত তখনো জনসাধারণ দুর্বল হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার চেয়ে সবল হয়ে দুর্দশার অধিকারী হতেই পছন্দ করতো।

উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিশ্লেষণ এবার করা যাক। সংবিধান থেকে তিনি দুটি ক্ষমতা সোজাসুজি পেয়েছেন—সেনেটের অধিবেশনের পৌরোহিত্য করা এবং কোন ব্যাপারে সেনেটের ভোট দুই সমানভাগে ভাগ হয়ে গেলে, কোন এক পক্ষে ভোট দান করা। কংগ্রেসীয় আইনের ফলে তাঁর ছ'দফা ক্ষমতা আমরা দেখতে পাই (১) নৌ বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করা (midshipmen), (২) চার জন সেনেটরকে এর "Board of Visitors" এ মনোনীত করা, (৩) সামরিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্যে ২ জন প্রার্থীর নাম রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো, (৪) আইনের তালিকাবদ্ধ খসড়া ও যুগ্ম প্রস্তাবাবলীতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পূর্বে স্বাক্ষর করা, (৫) Smithmotion Institution এবং এর Board of Regents এর সভ্য হওয়া, (৬) জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থার সভ্যপদ গ্রহণ করা। কখনো কখনো বিশেষ ধরণের কমিশনের সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর বেতন: বাৎসরিক ৩৫,০০০ ডলার ও নানাবিধ খরচের জন্য ১০,০০০ ডলার।

স্পষ্টতঃই এ সব অক্ষমতার পরিচায়ক, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পদাধিকারের ক্ষমতা কী ই বা থাকবে। উপরাষ্ট্রপতিত্ব কার্যনির্বাহক বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে এক সাংবিধানিক বাহুল্য এবং যশ ও অগৌরবের মধ্যে এক রাজনৈতিক বাহুল্য বিশেষ—সরকারী শাসনযন্ত্রে এর কোন বিশিষ্ট স্থান নেই। উড্রুউইলসন দুঃখের সঙ্গে ঠিকই লিখেছিলেন—"উপরাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে যখন কেউ বলে যে এ পদাধিকারের কোন ক্ষমতা নেই তখন এক বর্ণ মিথ্যা বলে না"। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে পনেরোবার এবং ছত্রিশ বছর আমাদের কোন উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন না এবং তাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি।

আমাদের শাসনতন্ত্রে উপরাষ্ট্রপতির কোন ক্ষমতা নেই বলে কোন সাংবিধানিক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। তাঁর ক্ষমতার পর্যালোচনা

যখন করি তখন ভুললে চলবে না যে তাঁর রাষ্টপতি হবার সম্ভাবনা সব সময়েই আছে। জন এডাম্‌স সার্থক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে প্রথমেই বলেছিলেন—"আমার দুটি ক্ষমতা আছে, একটি বাহ্য আর একটি উহ্য। উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার কাণাকড়ি মূল্য নেই, কিন্তু আমি সবই হতে পারি"। জাতির রাজনৈতিক চেতনায় রাষ্ট্রপতিত্বের সম্ভাব্য উত্তরাধিকার অপেক্ষা উপরাষ্ট্রপতির বাস্তব অক্ষমতাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে: পদাধিকারের বাহ্য রূপ উহ্য রূপকে বেশীর ভাগ সময়েই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উপরাষ্ট্রপতিত্বের অক্ষমতার বিপদ হচ্ছে এই যে এর পদাধিকারী এমন একজন কেউ কখনোই হবেন না যাঁকে দেশের বহুলতম সংখ্যক অধিবাসী রাষ্ট্রপতিত্বে বরণ করতে পারত।

গত ১৭০ বছরে ৭ জন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তবু এই সম্ভাবনা যোগ্য রাজনৈতিক নেতাদের উপরাষ্ট্রপতিত্ব বরণে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। রিচার্ড নিক্সন যদিও খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন তবু অধিকাংশ যোগ্য ও উচ্চাশাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বরং খ্যাতনামা সেনেটর বা রাষ্ট্রসচিব হতে চাইবেন কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি হতে চাইবেন না। এর সমালোচকেরা একে যে একটা রাজনৈতিক খামার বলে আখ্যা দিয়েছেন, এটা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি, তবু এডাম্‌স্ ও জেফারসনের পরে খুব কম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষই এই পদ অলংকৃত করেছেন এবং যাঁরাই করেছেন তাঁদের উপর বলতে গেলে জোর করেই দলের মনোনয়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রথিতযশা উপরাষ্ট্রপতি পেয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু ভন ব্যুরেন এর পর এমন কারো নাম কি করতে পারি রাজনৈতিক নেতৃত্বে যার স্থান ঠিক রাষ্ট্রপতির পরে, এমন কি তাঁর নিজের দলে? বেশী সংখ্যক উপরাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে আমাদের মতামতের সমর্থন পাই শ্রীডুলের (Mr. Dooley) স্রষ্টার বক্তব্যে। পাছে চার্লস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেন সেই আশংকায় তিনি থিয়োডর রুজভেল্টকে সানুনয় অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি যেন সাবমেরিণে কোথায়ও না যান এবং এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই এ রকম কিছু করতে যাচ্ছেন না, আর যদি যাবেন বলে মনঃস্থির করে ফেলে থাকেন, দোহাই আপনার, উপরাষ্ট্রপতিকে সঙ্গে নিয়ে যান"। উপরাষ্ট্রপতিত্বের উপসংহারে রুজভেল্ট নিজে এটুকু যোগ করেছিলেন, "আমি বরং ইতিহাসের অধ্যাপক হ'ব

কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি হ'ব না।" উইলসনের সময়কার চুরুটপ্রিয় উপরাষ্ট্রপতি টমাস মার্শাল রুজভেল্টের মন্তব্যের উপর আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে নিজেকে তাঁর এক মূর্চ্ছাগ্রস্ত মৃগীরোগীর মত মনে হয় যার জ্ঞান ঠিকই আছে কিন্তু কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। তিনি আরো বলেছিলেন যে Smithsonian Institution-এর সভ্য হবার ফলে তিনি নিজের জীবনের ফসিলের সঙ্গে সব রকম বয়সের ফসিলের তুলনামূলক বিচারের সুযোগ পেয়েছিলেন।

যদি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উপরাষ্ট্রপতি হন তবে তাঁর ক্ষমতাও হবে সবই উহ্য—কিছুই বাহ্য নয়। অনেক দলীয় অপদার্থ চার বছর সেনেটের সভাপতিত্ব করে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছেন, আবার অনেক দলীয় অপদার্থ রাষ্ট্রপতিত্বে পদারূঢ় হয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। যে সব কারণ উল্লেখ করে উপরাষ্ট্রপতিত্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে একটা মাত্র আজও প্রযোজ্য—সে হচ্ছে রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক উত্তরাধিকারিত্বের আবশ্যকতা এবং এই ক্ষেত্রেই উপরাষ্ট্রপতিত্বের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। এই ভুল সংশোধনের দুটো উপায় আছে, হয় এই পদাধিকারকে বিলোপ করতে হবে, নয় তো একে আকর্ষণীয়ভাবে ক্ষমতা ও সম্মানের কেন্দ্র করে তুলতে হবে। যদি উপরাষ্ট্রপতিত্বের বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকে তবে ব'লব প্রথমটা অচিন্ত্যনীয়, দ্বিতীয় অপ্রত্যাশিত।

টু্ম্যান ও আইজেনহাওয়ারের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক উপরাষ্ট্রপতিত্বের নবযুগের সূচনা হয়েছে। আলবেন বার্কলে সম্ভবতঃ জন কালহাউনের পর সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মনোনীত পদাধিকারী। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে টু্ম্যানকে খুবই সাহায্য করছিলেন। রিচার্ড নিক্সনকে কিন্তু (এ কথা আমি অশ্রদ্ধাবশতঃ বলছি না) মই-এর নীচে থেকে জোর করে দ্বিতীয় সারিতে তুলে ধরা হয়েছিল। যে কারণে তা করা হয়েছিল তার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রপতিপদে সমারূঢ় হবার যোগ্যতা আছে কিনা সে প্রশ্নের কোন সম্পর্ক ছিল না। রাষ্ট্রপতির বুদ্ধি ও বিবেককে ধন্যবাদ, শ্রীনিক্সন স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ ও যোগ্য উপরাষ্ট্রপতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু রাষ্ট্রসচিব ডালেস বা স্পীকার রেবার্ন অথবা জনা বারো সেনেটরদের তুলনায় তাঁর প্রভাব ও মর্যাদা বেশ কম ছিল এবং আজও

উপরাষ্ট্রপতিত্বকে দেশের দ্বিতীয় পদাধিকারের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। আইজেনহাওয়ারের হৃদ্‌রোগের সময়কার উদ্বিগ্ন সপ্তাহগুলোতে আমরা একটা শিক্ষালাভ করেছিলাম যে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির প্রকাশ্য আনুকূল্য লাভ করলেও জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গ্রহণ করতে অসমর্থ যদি না রাষ্ট্রপতির অসুস্থতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়। সেই সংকটপূর্ণ সপ্তাহগুলোতে শেরম্যান এডামস্‌, জর্জ হামফ্রে, জন ফস্টার ডালেস বা জেমস্‌ হ্যাগারটি রাষ্ট্রপতিত্বের ভূমিকায় নিক্সনের চেয়ে বেশী ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতি উপরাষ্ট্রপতির কাছে শক্তি ও নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছিল সেই সময় ঐ পদাধিকারের দুর্বলতা নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হ'ল। আইন, প্রচলিত রীতিনীতি বা রাজনৈতিক অবস্থা কিছুই উপরাষ্ট্রপতিকে এই দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে নি যদিও অনেক নাগরিক সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁর উপর এই দায়িত্বভার অর্পণে প্রয়াসী হয়েছিলেন— রাষ্ট্রপতি আবার যখন পর পর দু'বার অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁদের চেষ্টাও আবার প্রবল হয়ে উঠেছিল।

শ্রীযুত নিক্সন এই অক্ষম পদাধিকারকে একটা মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা সফল করে তুলেছিলেন। আমন্ত্রণক্রমে তিনি কেবিনেটে অংশ গ্রহণ করতেন ও রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করতেন, জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থায় স্বীয় অধিকারবলে যোগদান করতেন. ও বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতেন, রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্যে যে সব ভাষণ দিতে দ্বিধা করতেন, সেই জাতীয় বিবৃতি প্রকাশ করতেন, প্রখ্যাতনামা অতিথিদের বিমানপোতে অভ্যর্থনা করে রাষ্ট্রপতির ভার লাঘব করতেন, Committee on Government Contracts ও cabinet Committee on Price stability for Economic Growth-এর সভাপতির আসন অলংকৃত করতেন, ঝুড়ি ঝুড়ি দেশে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসাবে ভ্রমণে যেতেন, ১৯৫৮ সনের নির্বাচনের আগে মুখ্য প্রচারকের ভূমিকা পরিগ্রহ করেছিলেন এবং কার্যনির্বাহক বিভাগ ও আইনবিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কে সৌহার্দ্য স্থাপনে সহায়তা করতেন। সবচেয়ে বড়ো কথা দু'বার তিনি যথেষ্ট সংযম ও গাম্ভীর্য সহকারে রাষ্ট্রপতিত্বের দ্বারদেশে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনিই ইতিহাসের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি যিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তিনি কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরবার পথে হোয়াইট-

হাউসের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, উদ্দেশ্য : যদি কিছু জোড়াতালি দেবার প্রয়োজন ঘটে তো তিনি করবেন। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালেও তাঁর ক্ষমতা উহ্যই ছিল বাহ্য ছিল না।

উপরাষ্ট্রপতিত্বের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা বাদ দিলে বলা যায় উপরাষ্ট্রপতিত্ব রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার-এর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা থেকে একে বেশী প্রতিপত্তিশালী করতে চেয়েছিলেন এবং উপরাষ্ট্রপতি নিক্সন তাঁর পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে হৃষ্টচিত্তে এই নতুন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান আবিষ্কৃত হয় নি—হওয়া সম্ভবও নয়। কখনো কখনো বলা হয় উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির শীর্ষ কার্যনির্বাহক সহকারী করা হোক (আমি নিজেই এক সময় এ রকম কথা বলেছিলাম, কিন্তু এখন আর বলছি না) কিন্তু এই বিপ্লবের পথ বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল। যে পদাধিকারীকে সরানো যাবে না এমন কোন কার্যাধ্যক্ষ যদি রাষ্ট্রপতির নামে আইন প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন তবে আমাদের শাসনপদ্ধতির এক সুস্থ নীতির অপমৃত্যু হবে। উপরাষ্ট্রপতিত্ব কার্যনির্বাহকবিভাগের ঐক্যকে ধূলিসাৎ করার জন্য ছুরি উঁচু করে থাকবে সর্বদা এবং সে অবস্থা আমরা সহ্য করতে পারব না। স্বরাষ্ট্রবিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন নিক্সনের operations co-ordinating Boards-এর সভাপতিত্বের মনোনয়নের সার্থক বিরুদ্ধতা করেছিলেন তখন এ রকম কিছু চিন্তা করেই করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। আমরা তাঁদের দোষ দিতে পারি না কারণ তাঁরা আশংকা করেছিলেন হয়তো এর ফলে রাষ্ট্রপতি ও তাঁদের মধ্যে এক অচিন্ত্যনীয় গোঁড়ামির প্রাচীর গড়ে উঠবে।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো আশা এই হতে পারে যে কংগ্রেস উপ-রাষ্ট্রপতির পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেবে, এক সরকারী আবাসস্থল স্থাপন করবে, তাঁর কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াবে, একদল রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সম্প্রতি কালের এই অভিনবত্বকে প্রথায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবেন এবং রাজনৈতিক প্রথায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবেন এবং রাজনৈতিক দলগুলো সচেষ্টভাবে যোগ্যতা, চরিত্রগুণ ও মর্যাদার নিরিখে বিচার করে যোগ্যতম প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতিত্বের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন দেবে। যদি দুই দলই এই নিয়ম করে যে রাষ্ট্রপতি হবার যোগ্যতা যার নেই

তাকে উপরাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না তবে আশার আলো দেখতে পাব।

জনসাধারণ এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে অনেক বেশী যে ভাবে, তার প্রমাণ আছে এবং এই নেতাদের এই রূঢ় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে যে, যখন তাঁরা উপরাষ্ট্রপতিত্বের মনোনয়ন দেন তখন কার্যতঃ রাষ্ট্রপতিত্বেরই মনোনয়ন দেন। ১৯৫৫ সনে সাংবাদিক সম্মেলনে আইজেনহাওয়ারের বিবৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

প্রশ্ন (নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর রেস্টন)—রাষ্ট্রপতি কি বলবেন উপরাষ্ট্রপতি মনোনয়নের ব্যাপারে মনোনীত রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থীর কি ভূমিকা হওয়া উচিত বলে তাঁর ধারণা। তাঁর কি ধারণা কনভেনশন একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান; সুতরাং ইচ্ছামত প্রার্থী মনোনীত করতে সমর্থ, না তাঁর ধারণা কনভেনশনের এ ব্যাপারে মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর মনোনয়ন মেনে চলা উচিত ?

উত্তর—আমার মনে হয়, শ্রী রেস্টন, যে যদি সেই ভদ্রলোক মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর নিকট গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান না হন তবে মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। যদি এঁদের দু'জনের মধ্যে চিন্তার সমতা না থাকে তবে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে, আমি অন্ততঃ জিনিসটাকে এ ভাবেই দেখতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে উপরাষ্ট্রপতির আমেরিকার প্রশাসনে এক অস্তিত্ববিহীন পুরুষ হয়ে থাকা উচিত হবে না। আমার ধারণা তাঁকে কাজে লাগানো উচিত। আমার বিশ্বাস তাঁকে খুবই দরকারে লাগবে।

সুতরাং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতিরাই ঠিক করবেন—প্রথমে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে পরে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসাবে—এই হতাশ্বাস পদাধিকারকে কি ভাবে কাজে লাগাবেন।

রাষ্ট্রপতিত্বের এই আলোচনার পরিশেষে বক্তব্য : অনেক অভিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, এই পদাধিকার পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। যে সমস্ত তথ্যের ভিত্তি করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন সে সমস্ত তথ্য উপরে বিশ্লেষিত হয়েছে। অন্যান্য পরিবর্তনের দিকে আমি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতাম—যেমন মুখ্য কূটনীতিক ও প্রধান সমরাধিনায়কের ভূমিকার সমন্বয় ও আইন সম্মত জরুরী ক্ষমতার পরিধির ব্যাপ্তি—কিন্তু যে পাঁচটি ক্ষমতার

বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাতেই রাষ্ট্রপতিত্বের এই বিবর্তনের প্রামাণ্য স্বাক্ষর নিহিত আছে।

আইন প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, জনমত প্রভাবান্বিত করার তাঁর নতুন নতুন পন্থা, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সচ্ছলতার জন্য তাঁর ক্রমবর্ধমান কর্ম-তৎপরতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি ব্যক্তি হতে তাঁর এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া—এ সমস্তই রাষ্ট্রপতিত্বের নতুন রূপায়ণের প্রমাণ। এই পদাধিকারের ভিত আগের মতোই মজবুত আছে কিন্তু কাঠামোর কিছু আকর্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

"আধুনিক রাষ্ট্রপতিগণ"

রাষ্ট্রপতিত্বের এই চিত্রণে যাঁরা এর মধ্যে ও এর চারপাশে গত পঁচিশ বছর ধরে ঘোরাফেরা করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে একে সজীব করে তুলবার দুর্বার ইচ্ছা দমন করা সহজ হয় নি ; কিন্তু এবার আমি এঁদের কথাই বলব। হোয়াইটহাউসের মানুষটির সম্বন্ধে খোসগল্প করার দুর্বলতাই আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে না। আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্বের প্রতিষ্ঠানগত বৈশিষ্ট্য বা ইতিহাসে এর স্থান নির্ণয় করা সহজ হবে না যদি না আমরা একান্ত ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা এতে পদারূঢ় হয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা না করি। উড্রু উইলসন এক সময় বলেছিলেন সরকার রাজনৈতিক নেতাদেরই সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রপতিত্ব অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে আলোচনা অনেক বেশী সহজসাধ্য। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যিনি আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্বের জনক, হ্যারি ট্রুম্যান যিনি এর ধারক ও ডোয়াইট্ আইজেনহাওয়ার যিনি এর উত্তরাধিকারী ও আমেরিকার জনসাধারণের কাছে একে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন এঁদের কৃতকার্যতার মূল্যায়নের কঠিন অথচ প্রীতিপ্রদ দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাই। আসুন, আমরা নিজেদের ভবিষ্যতের সিংহাসনে বসাই এবং ঐ শান্ত সমাহৃত কোণ থেকে আমাদের প্রপৌত্ররা যেমন করবে বলে মনে করি তেমনি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁদের প্রত্যেকের সাফল্যের পরিমাপ করি।

ইতিহাসমনা আমেরিকাবাসীদের অনেক দিনের প্রিয় ঘরোয়া খেলা হচ্ছে রাষ্ট্রপতিদের পর পর সাজিয়ে দেওয়া এবং জ্যাকসন ক্লিভল্যাণ্ড ও হার্ডিঙ্গকে নিয়ে যেমন করে মজার খেলা খেলি রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারকে নিয়ে কেন তেম্নি করে খেলব না, তা বুঝতে পারছি না। আমাদের বংশধররা আমাদের গত তিন রাষ্ট্রপতির মহত্ত্ব সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করবে তা অনুমান করতে আমার বিশেষ কৌতূহল হয়। রুজভেল্টকে কী লিঙ্কন ও উইলসনের সঙ্গে এক সারিতে ফেলা হবে? ট্রুম্যানকে কী জনসনের সঙ্গে তুলনা করা হবে, না থিয়োডর রুজভেল্টের সঙ্গে? আইজেনহাওয়ার নাম্নী প্রবীণ যোদ্ধাকে কী ওয়াশিংটন নাম্নী প্রবীণ যোদ্ধার ঠিক নীচে বসান হবে, না গ্র্যান্ট নাম্নী প্রবীণ যোদ্ধার ঠিক উপরে? ঐতিহাসিকেরা মৃত রাষ্ট্রপতিদের সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন সাধারণতঃ করে থাকেন তাঁর মধ্যেই এই প্রশ্নগুলোর জবাব নিহিত আছে। আমি একশোর বেশী রাষ্ট্রপতি-জীবনী ধৈর্য সহকারে পড়ে দেখেছি যে একই মানদণ্ড বারম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতিদের সাফল্যের মূল্যায়নে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোই করা হয়ে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে আমি রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারের কৃতকার্যতা বিচার করব এবং এই ভাবে আমাদের বংশধরেরা আমাদের সময়ের রাষ্ট্রপতিদের সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করবে তা অনুমান করতে সচেষ্ট হব।

কী রকম সময়ে তিনি বেঁচে ছিলেন? যদি মহান যুগের সন্ধিক্ষণে তিনি পদাধিকারী না হয়ে থাকেন তবে কোন মানুষকেই সম্ভবতঃ বড় রাষ্ট্রপতি বলে অভিহিত করা যায় না। প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই ওয়াশিংটনের যশ, গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান জ্যাকসনকে দিয়েছে খ্যাতি, লিঙ্কনের প্রসিদ্ধি গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় ও উইলসন বড় হলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। কাউকে এই একান্তভাবে বিশিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যপদভুক্ত করার কোন অধিকারই আমাদের নেই যদি না সেই মানুষ জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন সংকটাকুল দিনে। যে সব রাষ্ট্রপতি শান্তিতে ও সুখে সময় কাটিয়ে গেছেন এই মানদণ্ড স্বভাবতই তাঁদের ক্ষতি করবে কিন্তু ইতিহাস তো এ ভাবেই লেখা হয়।

সময় যদি সমস্যাসংকুল হয়ে থাকে তবে কতটা সাহস ও কল্পনা নিয়ে তিনি এই অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন? ইতিহাসের গতিকে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে না দেখে একজন সার্থকমনা রাষ্ট্রপতি আরো অনেক কিছুই করবেন:

তাঁকে হতে হবে কংগ্রেসের, প্রশাসনের ও আমেরিকার জনসাধারণের শক্তিশালী নেতা ; তাঁকে অবর্জনীয় শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তা ঠিকভাবেই নিতে হবে ; রাষ্ট্রপতি হিসাবে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং দেখতে হবে তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর জীবনদর্শন কী ছিল ? বড় রাষ্ট্রপতি হতে গেলে বড়রাষ্ট্রপতির মত চিন্তা করতে হবে ; থিয়োডর রুজভেল্টের অনুকরণে তাঁকে "জ্যাকসন-লিঙ্কন" সদৃশ শক্তি ও তেজস্বিতার আকর হতে হবে, বুকাননের মত দুর্বলচিত্ত হুইগ হলে চলবে না। সত্যি কথা বলতে কি যদি তাঁর নিজের সময়ে তিনি ব্যাপকভাবে বার বার "শাসনতন্ত্রকে পদদলিত করছেন" এই অভিযোগে অভিযুক্ত না হন তবে ভবিষ্যতের চোখে যথার্থই খ্যাতনামা পুরুষ বলে প্রতিপন্ন হবার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হবে।

কী রকম দক্ষ কারিগর ছিলেন তিনি ? কতটা দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্মোদ্দীপনাকে চালিত করতেন, অনুচরদের আদেশ দিতেন এবং এই ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন ? লিঙ্কন শাসক হিসাবে খ্যাতনামা না হয়েও বড় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ; কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে একজন অদক্ষ রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর দায়িত্বের কণামাত্র সাফল্যের সঙ্গে পালন করা সম্ভব নয়।

কাদের সাহায্য তিনি কামনা করতেন ? ওয়াশিংটনের মত. তাঁরও কি জেফারসন বা হ্যামিল্টন ছিল ? বা লিঙ্কনের চেজ কিংবা সেয়ার্ড এর মত সহকারী ? তাঁর বড় বড় সহকারী ও দক্ষ প্রশাসক ছিল কি ? যদি আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্ব অপরিবর্তনীয়রূপে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে থাকে, তবে আধুনিক রাষ্ট্রপতিকে ওয়াশিংটন এবং লিঙ্কনের চেয়ে এ পর্যায়ে বেশী সাফল্য-লাভ করতে হবে কারণ দক্ষ কারিগর, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও খরবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিবৃত না হলে তাঁর পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়।

কার্যালয়ের শৃঙ্খলার বাইরে মানুষ হিসাবে তাঁর চেহারাটা কী রকম ছিল ? রাষ্ট্রপতি যেমন তাঁর নীতি ও কাজে তেমনি পরিহাস প্রিয়তায় স্মরণীয় হয়ে উঠেন। যদি তাঁকে কেন্দ্র করে উপগাথার সৃষ্টি না হয় তবে রাষ্ট্রপতির মহত্ত্বের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন এ কথা বলা যাবে না : তাঁকে আমেরিকার জনমানসে পুরাণের নায়ক হতে হবে।

রাষ্ট্রপতিত্বের উপর তাঁর প্রভাব কতটা ছিল? যদি ভীরুতা ও উদাসীনতায় তিনি তাঁর পদাধিকারকে পঙ্গু করে ফেলেন তবে আমরা তাঁকে বড় বলব না। সোপান শীর্ষে স্থান পাবার অধিকার কেবলমাত্র সেই রাষ্ট্রপতিদেরই থাকবে যাঁরা পরবর্তী রাষ্ট্রপতিদের অনুকরণের জন্যে নজির সৃষ্টি করে এই পদাধিকারকে শক্তিশালী করে যাবেন।

পরিশেষে, ইতিহাসের উপর তাঁর প্রভাবে কতটা ছিল? বিশেষ করে তিনি কি আমেরিকার সমাজজীবনের কোন ভূকম্পনকারী পরিবর্তনের প্রতিভূ ছিলেন, প্রেরণার উৎস ছিলেন বা ভাষায় কি তাকে রূপ দিয়েছিলেন? সমসাময়িক আমেরিকার গণতন্ত্রের অভিযাত্রার দিক নির্দেশ করে তাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন বলে একাধিক রাষ্ট্রপতি ইতিহাসে উঁচু স্থান পেয়েছেন—এমন কি থিয়োডর রুজভেল্টের মত যাঁরা কেবলমাত্র পরবর্তী রাষ্ট্রপতিদের জন্য নজির সৃষ্টি করে গেছেন তাঁরাও।

রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারের স্থান নির্ণয় করার আগে আমি পাঠকদের একটি জিনিষ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: আমেরিকার ইতিহাস লেখেন (কখনো কখনো সৃষ্টিও করেন) নরমপন্থী-মানুষেরা যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও বিচারবুদ্ধি বেশ কোমল। অধিকাংশ রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেই কাল অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, প্রতিকূল নয়। আমাদের প্রপৌত্রদের জন্যে যাঁরা পাঠ্য-পুস্তক লিখবেন তাঁরা আমাদের জন্য যাঁরা অতীতে লিখে গেছেন তাঁদের মত রাষ্ট্রপতির বড় বড় সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন, ছোটখাটো পদস্খলন, বদমেজাজ বা দলাদলি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে না। আশা করি এই আলোচনাতেও ছোটখাটো দুর্বলতা স্থান পাবে না।

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টর সময়ই ছিল প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সব চেয়ে উত্তেজক ও সমস্যাসঙ্কুল সময়—ওয়াশিংটনের প্রথম কয়েক বছরের মত অনিশ্চিত, লিঙ্কনের প্রথম কয়েক অন্ধকারাচ্ছন্ন বছরের কাঠিন্যের মত। উইলসনকে বড়রাষ্ট্রপতি বলি। কারণ তিনি এক বিরাট সংকটে জাতিকে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন, রুজভেল্ট দুটো বড় সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন; সুতরাং বড় হবার যে ইচ্ছা তিনি পোষণ করতেন, সে ইচ্ছা পূরণের যোগ্যতা তাঁর অবশ্যই ছিল। ভবিষ্যতের পাতায় তাঁর নাম মুদ্রিত হবার পক্ষে সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ "একশত দিনে" তাঁর নেতৃত্ব ও নব বিধান (New

Deal)-ই যথেষ্ট ছিল। ইতিহাসের প্রায় বৃহত্তম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আমাদের উত্তরণ ও রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা যাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে—সেই রাষ্ট্রপতিকে ইতিহাস গৌরবের আসন না দিয়ে কি করবে? আমেরিকার জনসাধারণ যে তাঁকে তৃতীয় এবং চতুর্থ বার নির্বাচিত করতে চেয়েছে—এই কি তার মহত্বের বাঙ্ময় প্রমাণ নয়?

রুজভেল্টের রাষ্ট্রপতিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হত যুগের দাবি পূরণে তাঁর ঐকান্তিকতায়। নাট্যানুরাগ থাকায় ফলে তিনি এমনভাব প্রকাশ করতেন যেন ইতিহাসে আমাদের সময়ের মত সময় আর কখনো আসে নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে তিনি নতুন নতুন দায়িত্ব নিতে কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না। সেই প্রথম "শত দিনে" তিনি এমন নেতৃত্ব কংগ্রেসকে দিয়েছিলেন যা ছিল অভূতপূর্ব, ভবিষ্যতে এ ধরণের নেতৃত্ব কতটা বাঞ্ছিত হবে তা সন্দেহজনক। নববিধানের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে তিনি গোটা বারো কার্যসূচী গ্রহণ করে সুস্থ সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। পার্ল হারবারের আগেকার শ্বাসরোধকারী দিনগুলিতে তিনি ধীরে ধীরে আমাদের প্রত্যাশিত যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার পরের অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু সুকঠোর সময়ে তাঁর প্রধান সমরাধিনায়ক হিসাবে তাঁর নেতৃত্ব লিঙ্কনের চেয়ে কম দুর্বার ছিল না।

তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতির কথা সর্বজন বিদিত; ১৯৩৩ সনের অবিবেচক মুদ্রা নীতি, ১৯৩৭ সনে বিচারালয়ের উপর অপরিণামদর্শী আক্রমণ, ১৯৩৮-এর প্রাথমিক নির্বাচনে ব্যর্থ হস্তক্ষেপ, স্পেনীয় গৃহ যুদ্ধে অপরিচ্ছন্ন অব্যবস্থিতচিত্ততা, ১৯৪২ সনের প্রশান্তমহাসাগরের তীরভূমি হতে জাপানী বংশোদ্ভূত আমেরিকাবাসীদের অপসারণ, স্ট্যালিনকে বশীভূত করার অবাস্তব স্বপ্ন, ১৯৪৫ এ উপরাষ্ট্রপতির শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে শোচনীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ ও সর্বোপরি আর্থিক সংকট মোচনে নববিধানের ব্যর্থতা—এ সবই তাঁর ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করছে। তবু আমার ধারণা এই সব ত্রুটিবিচ্যুতির কথা ভবিষ্যৎ ভুলে যাবে, মনে রাখবে তাঁর Tennessee Valley Authority স্থাপনের কৃতিত্ব, লোককল্যাণমূলক কার্যবিধি, Lend-Lease Programme ও Destroyer Deal, যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি, এ্যাটম বোমা তৈরী করার সিদ্ধান্ত এবং আমেরিকাকে আমেরিকা ছাড়া আরো পঞ্চাশ দেশের লক্ষীর ভাণ্ডার করে

তোলার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। তাঁর যোগ্যতা ও নেতৃত্বের প্রমাণ কেবল এই স্মরণীয় ঘটনাগুলোতেই নিবদ্ধ নেই। লোকে যখন তাঁর প্রধান সমরাধিনায়কের ভূমিকা ভুলে যাবে তখন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে যে তিনি থিয়োডর রুজভেল্টের মত রক্ষণশীল ছিলেন, জেফারসনের মতো সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন এবং অন্য যে কোন রাষ্ট্রপতির মতো অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য মন্তব্য আমরা শুনি কিন্তু এ কথা বলতে শুনি না যে তিনি নেতৃত্বের পরিবর্তে নিষ্ক্রিয়তা পছন্দ করতেন। সামার ওয়েল্‌স্‌ লিখেছিলেন যে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ জরুরী অবস্থাকেও সংযত করে তার উপর চূড়ান্ত প্রাধান্য বিস্তার করার ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছিলেন, রাজনীতিক নেতার পক্ষে এই হচ্ছে সুদুর্লভ অমূল্য সম্পদ।

কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোক ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে বুকানন সদৃশ রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে তুলনা করবে না। তিনি নিশ্চয়ই নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন কিন্তু তাঁর নিয়মতান্ত্রিকতা জ্যাকসন, থিয়োডর রুজভেল্ট, লিঙ্কন ও উইলসনের মত ছিল। প্রথমোক্ত জনের মত তিনি পদাধিকারের স্বাধীনতাকে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করতেন, দ্বিতীয় জনের মত নিজেকে জনসাধারণের সেবক বলে ভাবতেন। তৃতীয় জনের মত তীব্র জাতীয় সংকট মুহূর্তে নিজেকে একটি নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ কংগ্রেসে প্রদত্ত এক উল্লেখযোগ্য ভাষণে তিনি রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত উপস্থাপিত করেছিলেন। ১৯৪২ সনের মূল্য নিরোধ আইনের মুদ্রাস্ফীতিসূচক ধারার পরিবর্তন দাবি করে তিনি সোজাসুজি বলেছিলেন :

"কংগ্রেসকে এই কাজ আমি অক্টোবরের এক তারিখের মধ্যে সমাধা করতে বলি। ঐ তারিখের মধ্যে আপনারা যদি সক্রিয় না হন তবে আর্থিক বিশৃঙ্খলায়, যুদ্ধ প্রস্তুতি যাতে ব্যাহত না হয়, তা দেখা আমার অপ্রতিরোধ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। যদি কংগ্রেস সন্তোষজনকভাবে সক্রিয় না হন বা নিষ্ক্রিয় থাকেন তবে দায়িত্বগ্রহণ করে আমিই সক্রিয় হয়ে উঠব। সংবিধানের ধারা অনুসারে ও কংগ্রেসের বিধান বলে রাষ্ট্রপতির যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে যুদ্ধ জয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ দুর্ঘটনা রোধ করার ক্ষমতা আছে।... আমেরিকার জনসাধারণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমি সংবিধান ও দেশের প্রতি কর্তব্যের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করব। আমেরিকার

জনসাধারণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় শত্রুকে পর্যুদস্ত করার জন্য সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা ক'রব না। যুদ্ধ জয়ের পরে জরুরী ক্ষমতা আপনা থেকেই জনসাধারণের হাতে প্রত্যর্পিত হবে যে জনসাধারণ সকল ক্ষমতার উৎস।"

পরিশেষে উইলসনের মতো তিনি নিজেকে জনসাধারণের কাছে এক প্রচারক বলে মনে করতেন। নির্বাচনের কিছুদিন পরে তিনি বলেছিলেন—

"রাষ্ট্রপতিত্বের প্রশাসনিক দিক এর এক নগণ্য অংশ মাত্র। এ হচ্ছে বিশেষ করে নৈতিক নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল। জাতির জীবনে যখন নতুন ভাবধারার উদয় হয়েছে তখন আমাদের সব খ্যাতনামা রাষ্ট্রপতিরাই সেই সব মহান চিন্তার ধারক ও বাহক হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন ওয়াশিংটন; হ্যামিল্টনের প্রজাতন্ত্রী মতাবাদের বিরুদ্ধতা করে জেফারসন বস্তুতঃ পক্ষে গণতন্ত্রের অনুকূলে রাজনৈতিক দল প্রথা সৃষ্টি করে গেছেন; জ্যাকসন এই নীতিকে সমর্থন করেছিলেন।

লিঙ্কন সন্দেহাতীত ভাবে সর্বযুগের জন্য আমাদের শাসনপদ্ধতির দুটো মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। রাজনৈতিক দুর্নীতির পঙ্কিলতার মধ্যে পদারূঢ় হয়ে ক্লীভল্যাণ্ড কঠোর সততার পরিচয় দিয়ে গেছেন। থিয়োডর রুজভেল্ট ও উইলসন নিজের নিজের সময়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে রাষ্ট্রপতিত্বকে নৈতিক নেতৃত্বের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

এই হচ্ছে এই পদাধিকারের স্বরূপ—

যে আমাদের শ্রেয় ও প্রেয় সেই মানুষের সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষাকে নতুন নতুন পরিবেশ নতুনভাবে রূপায়িত করার এক পরম সুযোগ এই পদাধিকার আমাদের দিয়েছে। সজাগ ও পরিবর্তনশীল নেতৃত্ব ছাড়া আমরা প্রতিহত হব, পথ হারিয়ে ফেলব।"

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের মত এমন ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রপতিত্বের সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্বের কথা দুই একজন ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রপতি বলেন নি।

এমন কি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুরা পর্যন্ত স্বীকার করেন যে রুজভেল্ট শাসনকর্তা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি। তাঁর কাজ করার ধারা ছিল অগোছাল, ঘরোয়া ও সুবিধাবাদ দুষ্ট; সক্রিয় প্রশাসনের অপ্রতিরোধ্য

বিবাদকে জ্বলে উঠতে ও দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখেও তিনি নিশ্চুপ থাকতেন; দুর্বিনীতকে সংযত করতে, অক্ষমকে সরিয়ে দিতে তিনি অবিশ্বাস্য রকমের অনিচ্ছুক ছিলেন; তিনি নতুন নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন অথচ নেতার যা প্রধান গুণ-দোষ স্বীকার করা ও পূর্ণোদ্যমে আবার আরম্ভ করা—তা তাঁর ছিল না। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সমালোচনা বড় বেশী মেনে নিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুরা। উন্নয়নে উৎসর্গীকৃত সরকার অর্থ ও সময়ের অপচয় করতে বাধ্য; যে সমস্ত রাষ্ট্রপতি এই জাতীয় সরকারের নেতৃত্ব করেন তাদের প্রশাসনের খুঁটিনাটি অপেক্ষা অনেক বড় জিনিষ ভাবতে হয়। রুজভেল্ট নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সজ্ঞান ছিলেন তাই চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রশাসনিক ৮২৪৮ সংখ্যক অনুজ্ঞার মতো এক বলিষ্ঠ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর বেশী তিনি যেতে চান নি, কারণ আমেরিকার জনসাধারণের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি শক্তি সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন। সফল রাষ্ট্রপতি দক্ষ প্রশাসক অপেক্ষা আরো কিছু বেশী; মনে হয় রজভেল্ট সচেতনভাবেই হুভারের অনুসৃত নীতি পাল্টে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রপতি কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসক হতে চেয়েছিলেন; পরিণামে শাসক হিসাবে তাঁর দোষত্রুটি প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিল—নীতি রূপায়ণে দলীয় রাজনীতিকে প্রবর্তিত করার দক্ষতায়। তিনি ছিলেন উঁচু শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, তাই তিনি কখনো ভুলতেন না যে বড় এবং মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত না হলে রাজনীতি এক নোংরা খেলা মাত্র। কংগ্রেসের উপর তাঁর সকল নেতৃত্ব এই নীতির তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি মাত্র।

বারো বছরে দুটো বড় ধরণের সংকটে রুজভেল্ট শত শত দক্ষ লোকের সাহায্য নিয়েছিলেন তাঁর কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্যে। তিনি কিছু দুশ্চরিত্রলোকের সাহায্যও নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার পাঁচজনের হোয়াইট-হাউসের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আসা উচিত্ ছিল না—কিন্তু সাধারণতঃ ঠিক লোককে ঠিক জায়গায় বসাবার যোগ্যতা তাঁর বিশেষভাবেই ছিল।

রাষ্ট্রসচিব হিসাবে (Secretary of the Interior) হ্যারল্ড ইক্স্-এর নিয়োগ, জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থার সভাপতি হিসাবে জেমস্ ফারলের নিয়োগ টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসাবে ডেভিড্ লিলিয়েন্থেল-এর নিয়োগ, এ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে রবার্ট জ্যাকসনের মনোনয়ন, বাজেট ডিরেক্টর হিসাবে হ্যারল্ড স্মিথের নিয়োগ, অধঃস্তন সচিবরূপে সামনার ওয়েল্স-

এর নিয়োগ, রবার্ট শেরউড্ ও স্যামুয়েল রোজেনম্যান-এর ভাষণ লেখক হিসাবে নিয়োগ এবং সংবাদ সচিব হিসাবে স্টিফেন আর্লির নিয়োগ প্রমাণ করে যথার্থ স্থানে যোগ্য লোক বলতে কি বোঝায়।

যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের দলের মধ্য থেকেই সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করতে বাধ্য ছিলেন না। সেই সময়ে রুজভেল্টের যোগ্য লোক নির্বাচনের ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। লিহি, মার্শাল, কিঙ্গ, আর্নল্ড আইজেনহাওয়ার, স্টিমস্ন, ভিন্‌সন্, প্যাটারসন, ল্যাণ্ড, ম্যাক্লয়, সুদসেন, ফরেস্টাল, উইনাণ্ট, নেলসন, বার্নস, হ্যারিম্যান, দোনোভান প্রভৃতি সকলেই তাঁর নির্বাচিত লোক এ কথা আজ আমরা ভুলে গেছি। এ কথাও ভুলে গেছি যে সুপ্রীম কোর্টের বেশ কিছু সংখ্যক বিচারপতি নির্বাচন খুবই ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল, বিশেষ করে হারলান ফিস্কে স্টোনকে মুখ্য বিচারপতি পদে নির্বাচন খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পঞ্চাশজন বিরুদ্ধবাদীর অস্তিত্ব (যাঁরা একান্তভাবে না হলেও অন্ততঃ বিশ্বস্ত ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন) এবং তাঁদের উপর রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব। এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন সম্বন্ধে নাথানিয়েল হথর্ন যা বলেছিলেন আমার তা মনে পড়ছে। (জ্যাকসনের সহযোগীরা তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন বলে লোকে মনে করত): তিনি নিঃসন্দেহে এক মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা বুদ্ধি ও চরিত্রবল প্রত্যেককে তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হতে বাধ্য করত—বুদ্ধি যত বেশী তত বেশী বশম্বদ ছিলেন তাঁরা।

জনমানসে পুরা-নায়কের ভূমিকায় উত্তোলনের পথে এখন রুজভেল্ট যদিও পুরাণের শয়তান বলে তাঁকে আগামী পঁচিশ বছর ধরে অনেকেই ভাববে। জনসংখ্যার যে বহুলতম অংশ তাঁকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে তাঁদের মনে রাখা উচিত যে ক্যাম্পোবেলোতে সূর্যোদয় সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি লিখবে অনেক সখের কোম্পানী; তাঁদের পৌত্র—প্রপৌত্ররা সযত্ন মনোযোগের সঙ্গে হাডসনের প্রার্থীদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির বিচরণের গল্প, ডক্টর পিবডির মানুষোচিত শিক্ষাদানের বিবরণী ও কষ্টদায়ক বেদনাকে দূর করার তাঁর যে ক্ষমতা ছিল সে সব কথা পড়বে। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় রুজভেল্টের দোষত্রুটির সম্যক আলোচনা সম্ভব নয় কিন্তু স্মরণীয় পুরুষ হিসাবে তাঁর কয়েকটি গুণের আমি বিশ্লেষণ করতে চাই। প্রাণবন্ত স্বভাবের জন্যে তাঁর পক্ষে প্রথম রুজভেল্টের মত এই

পদাধিকারকে ভালবাসা সম্ভব হয়েছিল ; শিল্প সম্রাটদের চেয়েও পরিষ্কার ভাবে তিনি যুদ্ধকালে আমেরিকার উৎপাদন সামর্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছিলেন তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতার জন্য। বিপদে আনন্দ পেতেন তাই স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন সে সময়ের নেতা। তাঁর সময় সম্বন্ধে এক সমালোচক লিখেছেন : একের পর এক সংকট এসে যাচ্ছে, আর ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট হচ্ছেন সবচেয়ে বড সংকট। ইতিহাসমনা রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতিত্বে সমারূঢ় হবার আগেই স্মরণীয় রাষ্ট্রপতি হয়ে গিয়েছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনৈতিক মতবাদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রক্ষণশীলতা তাকে আমেরিকার জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব করে তুলেছিল (যাঁরা তাঁর রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন তাঁদের আমি হাইড্ পার্কের পুরণো বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসতে বলি)। ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের সমপর্যায়ে তাঁকে কখনো ফেলা হবে না, কারণ তাঁর চরিত্রের যে দুর্বলতা ও ম্রিয়মাণতা ছিল তা ঋষি জনোচিত নয়। তিনি খরগোসের মত ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন ও বাঘের মত লাফিয়ে বেডাতেন সত্যি, আবার পেঁচার মত অনেক সময়েই ধাপ্পা দিতেন।

রাষ্ট্রপতিত্বের উপর রুজভেল্টের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই পদাধিকার শক্তি মর্যাদা ও স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে মণ্ডিত করেছেন তাঁর চেয়ে বেশী মাত্র দুজন রাষ্ট্রপতিত্বের স্থাপয়িতা ওয়াশিংটন, পুনর্গঠনকর্তা জ্যাকসন। আমার ভাবতে ইচ্ছা হয় শ্রীআইজেনহাওয়ার তার শিক্ষানবিশীর সময় কখনো ভেবেছিলেন কিনা যে তিনি যে ক্ষমতা জাহির করেছিলেন, সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন, শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন বা আনুগত্য পেয়েছিলেন তার অনেক-টাই ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের প্রত্যক্ষ দান। সাংবাদিক সম্মেলন, কার্যনির্বাহক সংস্থা প্রশাসন পুনর্গঠনের ক্ষমতা ও শিল্পবাণিজ্য এবং আর্থিক ব্যাপারে শান্তি রক্ষা ইত্যাদি।

সবই আধুনিক রাষ্ট্রপতির প্রতি রুজভেল্টের দান। যদি রুজভেল্ট এত শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি না হতেন তবে আজকের রাষ্ট্রপতি সেনাধ্যক্ষদের কাছ থেকে যে আনুগত্য পান, কংগ্রেসের কাছ থেকে যে সম্মান পান এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের নেতাদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা পান তা পেতেন কিনা সন্দেহ। এ রকম অন্যান্য রাষ্ট্রপতিদের মতই তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য এক উত্তপ্ত আসন রেখে গিয়েছেন এবং বিশেষ করে ২২তম সংশোধনীর সময় তাঁর উদ্ধত

কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই পদাধিকার স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবু ইতিহাস নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তিনি রাষ্ট্রপতিত্বকে গণতন্ত্রের এক মহান ধারক করে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

আমাদের বংশধরগণ স্থির করবেন ইতিহাসে তাঁর অবদান কী। আমরা দূর থেকে অনুমান করতে পারি মাত্র কিন্তু তারা প্রত্যক্ষভাবেই বুঝতে পারবে দুটো বিপ্লবের গোড়াপত্তন তিনি যে ভাবে করে গিয়েছিলেন তা আমেরিকার জনসাধারণের কাছে আশীর্বাদ না অভিশাপ হয়ে দেখা যাচ্ছে। নববিধান হচ্ছে প্রথম বিপ্লব যা আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় সরকারের সহায়তায় দেশের আথিক প্রগতিকে রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছিল। জনগণের নেতা রুজভেল্ট আমাদের জীবনযাত্রার এই বিরাট পরিবর্তনকে ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। কেউ হয়ত ঘৃণা করবেন, কেউ করবেন শ্রদ্ধা কিন্তু সবাই তাঁকে স্মরণে রাখবেন আমেরিকার স্বাধীনতার সংজ্ঞার ভেতরে নিরাপত্তার বীজ ঢুকিয়ে দেবার জন্য।

দ্বিতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হ'লো যুদ্ধরত জাতিগুলির জোটভুক্তিতে ও রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সম্পর্কিত নীতি বিষয়ক দ্বন্দ্বে। এ দুটোর ফলেই আমেরিকাকে তার স্বার্থেই বিশ্ব-রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হলো পর পর কয়েকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ব্যাপারেও রুজভেল্টের বাক্‌চাতুর্যের জয় হলো ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে তাঁর বাণীর উদ্ধৃতি করবে। আমরা ভুলতে পারব না যে যুদ্ধে এবং কূটনীতিতে এই সাফল্যই তাঁকে আমেরিকার ইতিহাসে ও বিশ্বে এক মহাপুরুষে পরিণত করেছে। আমরা যদি তাঁকে সম্মান না দেখাই বিশ্বের লোক দেখাবে, যেমন তাঁকে দেখিয়েছিলেন উইন্‌স্টন চার্চিল হাউস অফ কমন্স এ:

"রুজভেল্ট যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তখন যদি না হতেন, যেমন ভঙ্গীতে হলেন তা যদি না হতেন, যদি স্বাধীনতার আহ্বানে উদ্বেল না হতেন, যদি বৃটেনকে ও ইউরোপকে সংকটে সাহায্যের কোন প্রেরণা অনুভব না করতেন তা হলে মানব-সমাজের উপর এক চরম দুর্দিন নেমে আসত এবং এর ভবিষ্যৎ শতাব্দীর লজ্জা ও ধ্বংসে ডুবে যেত। যে মানুষকে আজ আমরা সম্মান দেখাচ্ছি তিনি শুধু ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি ইতিহাসের গতি এমনভাবে পরিবর্তিত করেছেন যার ফলে স্বাধীনতা রক্ষা পেয়েছে, মনুষ্য জাতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গেছে।"

এই জটিল চরিত্রের ও সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সময়ের এ এক শিথিল রকমের ভাষ্য, তবু আমি যদি এ কথা না বলি যে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট মহান রাষ্ট্রপতিদের ক্রমপঙ্ক্তীতে জ্যাকসন ও উইলসনের একটু উপরে এবং ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের বেশ একটু নীচে (সময়ের সঙ্গে ব্যবধানও কমবে) স্থায়ী আসন সংগ্রহ করেছেন তাহলে হিংসুক অপবাদ আমার উপর বর্তাবে। ইতিহাসে তাঁর স্থান গৌরবদীপ্ত।

রুজভেল্টের চেয়ে ট্রুম্যানের অপক্ষপাত মূল্যায়ন অনেক বেশী কঠিন। কখনো তিনি মহৎ, কখনো আবার সঙ্কীর্ণতার পঙ্কে নিমগ্ন, তাঁর সম্বন্ধে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে বাজে মন্তব্য না করে আসুন আমরা রাষ্ট্রপতিত্বের যে আটটি সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছি তা তাঁর উপরে প্রয়োগ করি। আমার আগেকার সাবধান বাণী যা তাঁর উপর আশ্চর্যজনকভাবে খাটে—তা এ সময়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরা ইতিহাস তৈরী না করলেও ইতিহাস লিখে থাকেন।

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের মত তাঁর সময় এতটা ঘটনাবহুল ও বিপদসঙ্কুল ছিল না; কিন্তু আমেরিকার ভবিষ্যতের পক্ষে তা জেফারসন ও উইলসনের সময়ের মতই উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনিও যশের মুকুট মাথায় নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, এ কথাটা তার অত্যন্ত বড় সমালোচকও স্বীকার করেন। তাঁর দুই কার্যকালের মধ্যে আমরা বেশ কিছু সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। বারে বারে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে ধ্বংস আর পতন আমাদের সামনে সমাসন্ন। তবু ২০ জানুয়ারি ১৯৫৩ আমরা পৃথিবীর সামনে এক মুক্ত, সচ্ছল ও স্বাধীনতা প্রিয় জাতি হিসাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমাদের ভাগ্যে যতটা প্রাপ্য ছিল, তার চেয়ে বেশী আহত আমরা নিশ্চয়ই হই নি। এই আট বছর রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকাই ট্রুম্যানকে এ্যাডাম্‌স ও ম্যাক্‌কিন্‌লি এবং সম্ভবত পোল্ক ও ক্লিভল্যাণ্ড থেকে ইতিহাস বেশী স্মরণীয় করে রাখবে। আসল ব্যাপারটা এই যে রুজভেল্ট তাঁকে যে মর্যাদা দেন নি সেই মর্যাদায় মণ্ডিত হবার পর হ্যারি ট্রুম্যান কংগ্রেসে বার্তা প্রেরণ করা, বিদেশী রাজা ও ঈগল স্কাউটদের অভ্যর্থনা করা, রাজনৈতিক ঋণ স্বীকার করা ও সংবাদপত্রের কাছে "কোন মন্তব্য করব না" বলা ছাড়াও অনেক কিছু করেছিলেন। তিনি পড়াশুনা করতেন, সভাসমিতিতে যেতেন এবং দীর্ঘ নির্দেশ অন্য যে কোন রাষ্ট্রপতির মতোই পরিশ্রম করে দিতেন।

তাছাড়া গোটা বারো সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছিল যা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কাজে ক্রটি বিচ্যুতি তাঁরও ছিল, বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে। ১৯৪৬ সনের রেলরোড ধর্মঘটীদের সম্বন্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাও ১৯৫২ ইস্পাত শিল্প দখলীকরণ তাঁর ক্রটির উদাহরণ এবং উচ্চপদে দুর্নীতি, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং নোংরামি নিরসনে তাঁর চেষ্টার অভাব তাঁর বিচ্যুতির প্রমাণ। কিন্তু এই সমস্তই প্রথম ও দ্বিতীয় আণবিক বোমা জাপানের উপরে ফেলা, ব্যাপকভাবে পরমাণবিক ও গবেষণা ও উৎপাদন করা, ট্রুম্যান নীতি ও বার্লিনে এরোপ্লেনে মাল সরবরাহ করা, মার্শাল পরিকল্পনা, উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা এবং কোরিয়ায় আক্রমণ প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে। সামরিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর কোন বড় সিদ্ধান্ত, এমন কি অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করার মত সুদূরপ্রসারী বিতর্কিত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত, ভ্রান্ত বা বুদ্ধিহীন বা আমেরিকার জনস্বার্থ-বিরোধী বলে প্রমাণিত হয় নি। দেশের লোক রাষ্ট্রপতির কাছে যে রকম প্রত্যাশা করে তিনি সে ভাবেই ঐ সব সম্ভাবনাপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন: অবিচলভাবে যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারে ও আশা নিয়ে। রুজভেল্টের মতো নেতৃত্বের আত্মপ্রত্যয় ট্রুম্যানের ছিল না, সম্ভবতঃ ক্ষমতা শীর্ষে আরোহণের গতিবেগ তাঁকে নিঝুম করে ফেলেছিল; কিন্তু তাঁর স্তাবক বা শত্রুরা কেউ তাঁর কার্যের জন্য অন্য কাউকে দোষী করতে চেষ্টা করে নি।

ট্রুম্যান পরে রুজভেল্টের চেয়েও রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে স্ফীত ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই পদাধিকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর সুদৃঢ় ধারণা তাঁর শালীনতাবোধের অভাবকে ছাপিয়ে ভবিষ্যৎকে বেশী প্রভাবান্বিত করবে: আর কোন রাষ্ট্রপতিই তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে এত বিনীত অথচ মর্যাদাব্যঞ্জক উক্তি করেন নি। আর কোন রাষ্ট্রপতিই তাঁর কর্তব্যের এ রকম কল্পনাশ্রয়ী অথচ সঠিক চিত্র আঁকেন নি।

লোকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অর্থাৎ প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে তাঁর সমস্ত ক্ষমতার কথা ও তিনি কতদূর যেতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনা করে। আমি আপনাদের আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু ব'লব।

সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে হয়ত অনেক ক্ষমতাই দিয়েছে, আমেরিকার কংগ্রেস ও হয়ত কিছু আইন করে তাঁকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছে; কিন্তু রাষ্ট্রপতির

প্রধান কাজ হচ্ছে লোককে জড়ো করে যে সমস্ত কাজ তাঁদের স্বতঃ প্রণোদিত-ভাবে করা উচিত সেই সমস্ত কর্তব্য করতে তাঁদের প্রবুদ্ধ করা। আমি আমার সময়ের বেশীর ভাগই এ ভাবে কাটাই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলতে এই বোঝায়।

তিনি হয়ত তাঁর পদাধিকারের সীমা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না; কিন্তু তাঁর চেয়ে কম অস্থির রাষ্ট্রপতিরাও, যেমন লিঙ্কন, উইলসন ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রভৃতি, হয়ত ১৯৫২ সনের মত ইস্পাত-শিল্প রাষ্ট্র করায়ত্ত করার প্রয়াস পেতেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, বড় চিন্তা করতে পারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উইলসন ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার এ রকম পরিচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন নি। ১৯৫১ সালের ইউরোপে সৈন্য রাখবার ক্ষমতা নিয়ে কংগ্রেসে যে তীক্ষ্ণ বিতর্ক হয়েছিল সে ব্যাপারে কংগ্রেসের ক্ষমতা ও মতিগতি সম্বন্ধে তাঁর হাল্কা মনোভাব রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর সবচেয়ে বড় ত্রুটি বলে আমি মনে করি।

কোরিয়ার যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের সক্রিয় ও দ্রুত সহযোগিতা অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন নি, ইস্পাত কারখানাগুলো দলীয় মনোভাব নিয়ে দখল করে তিনি নিন্দনীয় কাজই করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি পদের দীর্ঘ ইতিহাসে ট্রুম্যানের জোরা দক্ষ কারিগরের নজির নেই। রাষ্ট্র প্রশাসনের তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা স্বীকার করেন যে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা করে খেটে তিনি যে সময় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, যে ধ্রুপদী কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা—পেশাদারী কর্মীর পক্ষেই সম্ভব। তবু তিনি ঠিক পেশাদার ছিলেন না অর্থাৎ তিনি ক্ষমতায় আসীন হবার পরেই পদাধিকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে আরম্ভ করেছিলেন এবং এত আশ্চর্যজনকভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। অনেক ব্যাপারেই তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা যায়: কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অক্ষমনীয়ভাবে বিরক্তিকর ছিল; দলীয়তা যেখানে নিন্দনীয় সেখানে তিনি নোংরা রাজনীতির প্রশ্রয় দিতেন, তাঁর প্রশাসনের নিচু নীতিবোধ তাঁর অতি বড় স্তাবককেও অস্থির করে তুলেছিল। হোয়াইট হাউসে কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও দক্ষতার এক সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্বকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করায় সাহায্য করেছিল ঠাণ্ডাযুদ্ধ (যার ফলে কর্মভারে অবনত ঐ পদাধিকারে আরো শত শত নতুন

দায়িত্ব এসে পড়লো) ও শ্রীট্রুম্যানের যোগসাজস (ট্রুম্যান অন্য যে কোন রাষ্ট্রপতির মতোই কর্তব্য বণ্টন করতে পারতেন)।

তাঁর আশেপাশের লোকের কাছে তিনি ছিলেন আধুনিক কার্য নির্বাহকের আদর্শ প্রতিমূর্তি।

একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত তাঁর দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের স্বাক্ষর বহন করে। যখন তাঁর ব্যক্তিত্ব খুবই ম্লান হয়ে গিয়েছিল—যখন অনেক আমেরিকাবাসীই মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন যে তিনি মর্যাদাবোধ ও কর্তৃত্ব বিসর্জন দিচ্ছেন—তখন শ্রীট্রুম্যান এমন একটা কাজ করেছিলেন যা রাষ্ট্রপতি পদের ইতিহাসে কেউ কখনো করেন নি, তিনি নিপুণ অথচ অনায়াসভঙ্গীতে ক্ষমতা ও তথ্যাবলী বিরুদ্ধ দলের প্রত্যাসন্ন প্রশাসনকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এর পর থেকে সব বিদায়ী রাষ্ট্রপতিরা ট্রুম্যান যেমন আইজেনহাওয়ারকে করেছিলেন তেমি করে প্রত্যাসন্ন রাষ্ট্রপতিদের সাহায্য করে যাবেন এটা ধরে নেওয়া যায়।

ট্রুম্যান যাদের নিয়োগ করেছিলেন ও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা নিঃস্বার্থ মহত্ব থেকে স্বার্থ দুষ্ট অযোগ্যতা পর্যন্ত সবরকম দোষগুণেরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিছু কিছু লোকের মতের সঙ্গে আমি একমত যে ট্রুম্যান নিজে নিজেই ঠিক করে ফেলেছিলেন সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দলাদলির উর্ধ্বে যোগ্যতার উপর জোর দেবেন আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দলীয় সামান্যতা সহ্য করবেন। মার্শাল, লভেট, ফরেস্টাল, এ্যাকিসন, বেডেল স্মিথ, হফম্যান, বহ্লেন, সিমিঙ্গটন, ফষ্টার, ব্র্যাড্লে, ক্লে, লুই ডগলাস, কেন্নান, ড্রেপার, জেসাপ, হ্যারিমান, ফিন্লেটার, প্যাটারসন, ম্যাক্লয়, আইজেনহাওয়ার ও ডালেস—এই সব নাম প্রমাণ করে যে ট্রুম্যান জাতির নিরাপত্তার জন্য রুজভেল্টের চেয়েও বেশী পরিমাণে বুদ্ধিমান লোকদের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। ম্যাক্গ্রাথ, ম্যাক্গ্রানারি, স্নাইডার, কড্ল ও সয়ার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে জাতির অন্যান্য কাজ অত্যন্ত সাধারণভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। একটা গ্রুপ ছবিতে দেখা গিয়েছিল ট্রুম্যানের একপাশে বসে আছেন জেনারেল মার্শাল, অন্যপাশে জেনারেল ভহন্ অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে সুপ্রিম কোর্টে ট্রুম্যানের মনোনয়ন গুলি ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট মনোনয়ন।

ইতিহাস ট্রুম্যানকে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করবে। যে সব আশাহীন কার্যকলাপ তাঁকে লক্ষ লক্ষ প্রজাতন্ত্রীর কাছে উপহাসাস্পদ করে তুলেছিল

(ক্রুদ্ধ চিঠি পত্র, যাচাই করার উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন, অব্যবহার্য স্পোর্ট সার্ট, গুচ্ছের আমেরিকান সহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রাতঃকালীন সম্মেলন) তাই তাঁকে অমর করে রাখবে। একশ বছর আগে যিনি মারা গেছেন তাঁকে উপহাস করার সাহস যিনি রাখেন তিনি এক দুর্লভ আমেরিকাবাসী, এক সুদুর্লভ প্রজাতন্ত্রী। আমাদের বংশধরেরা তাঁর "মিশৌরী" জাত বিজ্ঞতা ও পরিহাসপ্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বহুযুগ আগে মৃত ও বিস্মৃত একশ'য়ে পাঁচজনেদের ("five fercenters") নিয়ে রসিকতায় খুবই পুলকিত বোধ করবেন। তাঁরা গর্বের সঙ্গে ১৯৪৮ সনে তাঁর অবলম্বিত ব্যবস্থার কথা পড়বেন, জেনারেল মেকার্থারকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত রুদ্ধনিশ্বাসে অনুধাবন করবেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ মানুষের মত তাঁর আচরণ অন্য যে কোন রাষ্ট্রপতির চেয়ে তাঁকে তাঁদের আত্মীয় করে তুলবে। তাঁর নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি তাঁদের উদ্বেলিত করবে: "দেশে সম্ভবতঃ দশ লক্ষ লোক আমার চেয়ে ভাল ভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ চালাতে পারেন, কিন্তু আমিই রাষ্ট্রপতি এবং আমার সাধ্যানুসারে আমি কাজ করে যাচ্ছি"। অনেক সময়েই তাঁর আচরণ প্রশংসনীয় ছিল না তবু তাঁকে অনুসরণ করা ও তাঁর সম্বন্ধে পড়া এক চিত্ত-বিনোদক অভিজ্ঞতা। ঐতিহাসিকরা তাঁকে ইতিহাসে স্থায়ী স্থান দেবেন নিশ্চয়ই, কারণ সময়-সময় রাষ্ট্রপতি যে পদাধিকারের মধ্য দিয়েই গৌরবমণ্ডিত হয়ে ওঠেন ঐতিহাসিকদের এই অন্যতম লালিত ধারণার তিনি এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রপতিত্বের উপর টু্ম্যানের প্রভাব সম্বন্ধে সহজ ভাষায় বলা যায় যে তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত কৃতকার্য এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন বিশেষ। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সময় রাষ্ট্রপতিত্বের যে শক্তিশালী রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে তা অধিকাংশ আমেরিকাবাসীদের অন্ততঃ একযুগ পরিতৃপ্ত রাখবে, তাঁর—উত্তরাধিকারীর উপরেই কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব যাতে প্রতিক্রিয়াশীলতার পাথরে ব্যাহত বা খর্ব না হয় তা দেখার মহৎ দায়িত্ব এসে পড়েছিল। এই দায়িত্ব শ্রীটু্ম্যান উৎসাহ ও সফলতা সহকারে পালন করেছিলেন। ম্যাকআর্থার ও ম্যাকার্থির চ্যালেঞ্জ ও প্রতিঘাত থেকে রাষ্ট্রপতিত্বকে দৃঢ়হস্তে রক্ষা করেছেন তিনি, এমন কি অবসর গ্রহণের পরেও নিম্ন পরিষদের সদস্য ভেল্‌দের স্থূল আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ভেল্‌দে ১৯৫৩

সনে House committee on the American Activities-এ সামনে সাক্ষ্য দেবার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন ট্রুম্যান তা দৃঢ়ভাবে বানচাল করে দিয়েছিলেন। শ্রমবিরোধে একপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কংগ্রেসকে অনাবশ্যকভাবে অপমান করে বা অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর প্রভাব নষ্ট করে তিনি এই পদাধিকারের যে ক্ষতি সাধন করেছিলেন তার ফল খুবই অস্থায়ী হয়েছিল। রুজভেল্টের হাত থেকে যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন তার তুলনায় আইজেনহাওয়ারের হাতে যে পদাধিকার তিনি তুলে দিয়েছিলেন তা কোন অংশেই কম মহিমামণ্ডিত ছিল না। মহান রাষ্ট্রপতিদের বিদায়ের পর পদাধিকারের কি অবস্থা হয় (যেমন হয়েছিল জন এডামস, ম্যাডিসন, ভন ব্যুরেন, জনসন, ট্যাফ্‌ট্‌ ও হার্ডিঙের-এর বেলায়) তার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রুম্যানের কার্যকাল বিচার করলে এই সিদ্ধান্তই করতে হবে যে তা উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছিল।

তাঁর আটবৎসরের কার্যকালের দুটো ঘটনা যে কোন ম্যাডিসন, ট্যাফট, গ্র্যাণ্ট বা হুভার এর চেয়ে তাঁকে বেশী স্মরণীয় করে রেখেছে। একটা আভ্যন্তরীণ: আমেরিকার জনজীবন থেকে বৈষম্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকতার অভিশাপ দূর করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ, আর একটা আন্তর্জাতিক: বিশ্বশান্তি ও সচ্ছলতার অভিযানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতায় আমেরিকার অপরিবর্তনীয় দায়িত্ব গ্রহণ। এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনায় শ্রীট্রুম্যান খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু দুটো ব্যাপারেই পরে রাষ্ট্রপতিত্বের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এদের ফলপ্রসূ করেছিলেন। সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠন করার জন্য ও তৎসূত্রে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮-এ কংগ্রেসে বার্তা প্রেরণ করার জন্য তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। সাম্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যও তিনি সমভাবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। আমেরিকার ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্রের শান্তির সময়ে প্রথম সামরিক গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া (N.A.F.O.), আমাদের জাতীয় স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও গ্রীস ও তুরস্ক এলাকা রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, ১৯৫০ সনে কোরিয়ায় নিজেদের সৈন্য দিয়ে সাম্যবাদী সৈন্যদের মোকাবিলা করা ও Point Four-এর মাধ্যমে বিশ্বশান্তির দিকে গঠনমূলক ও দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ করা এক

সুমহান সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু ছিল না। মার্শাল পরিকল্পনার জন্মদাতাও ছিলেন তিনি।

ট্রুম্যান প্রায়ই বলতেন যে আমেরিকাবাসীদের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির জন্য স্থায়ী শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা তাঁর প্রশাসনের প্রধান দুটি লক্ষ্য। যদি এই দুই প্রত্যাশা আমরা পূর্ণ করতে পারি (ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেলেই তা সম্ভব) তবে তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতি ঘটবে। তাঁর নিষ্করুণ শত্রুরা অবশ্য বলেন যে, সামাজিক অধিকার ও আন্তর্জাতিকতার ধুয়া দুইই আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। ট্রুম্যান প্রায়ই আমাদের মনে করিয়ে দিতেন যে সমানাধিকারের প্রশ্নে তাঁর এবং গভর্ণর বার্ণসের দ্বন্দ্বে কোন্ পক্ষ ন্যায়নীতির বাহক তা ইতিহাসই ঠিক করে দেবে; আবার সেনেটর ব্রিকারের সঙ্গে স্বাধীনতার সঙ্গে স্থায়ী শান্তির প্রশ্নের দ্বন্দ্বের বিচারকও হবে ইতিহাস।

এই দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আমি অনেক বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে হ্যারি ট্রুম্যান শেষ পর্যন্ত জেফারসন ও থিয়োডর রুজভেল্টের পাশেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্থান পাবেন। অন্ততঃ ছ'জন রাষ্ট্রপতির নাম আমরা করতে পারি যাঁরা তাঁর নিচে স্থান পেলেও তাঁর চেয়ে দক্ষ ও উদারমনা ছিলেন; কিন্তু তিনি রাষ্ট্রপতি পদ পেয়েছিলেন উদ্বেগাকুল সময়ে এবং সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য বিপুল কৃতিত্ব তাঁকেই দেওয়া হবে। ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, উইলসন ও জ্যাকসনের কৃতিত্ব আমি তাঁকে খোলা মনে দিতে পারি না নিশ্চয়ই। বুদ্ধির কিছু জড়তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অসচ্ছতা তাঁকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার পথে অন্তরায়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসে তাঁর অদম্য কৌতূহল ছিল। তিনি জানতেন যে রাষ্ট্রপতিদের পর পর সাজিয়ে দেবার একটা খেলা আছে; তিনি বারে বারে তাঁর শ্রোতাদের অস্বস্তি সত্ত্বেও জোরের সঙ্গে বলতেন যে শীর্ষে স্থান পাবার উপযুক্ত তিনি নন—তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে সমারূঢ় হওয়া ইতিহাসে এক দুর্ঘটনা বিশেষ। এই নিষ্করুণ আত্ম-বিশ্লেষণই তাঁকে অদম্য উৎসাহে উপরে উঠার প্রচেষ্টায় অতীতের স্মরণীয় রাষ্ট্রপতিদের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণা জাগিয়েছে, বলা বাহুল্য, ক্ষমতার অতিরিক্ত চেষ্টা তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন—আমি

খ্যাতনামা রাষ্ট্রপতিদের একজন ছিলাম না; কিন্তু হতে চেষ্টার ত্রুটি রাখি নি।

হ্যারী ট্রুম্যান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন কারণ তিনি দেখিয়ে গেছেন যে সততা ও উচ্চ আদর্শ থাকলে একজন সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বিশ্বের সব চাইতে অসাধারণ পদাধিকার যোগ্যতার সঙ্গে পূর্ণ করতে পারেন। গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করতে পারে ও সাধারণ মানুষ নিজেদের শাসন করার যোগ্যতা রাখে—আমেরিকার এই মহান আদর্শকে শক্তিশালী করে সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতীক হিসাবে তিনি চিরস্থায়ী আসন পাবেন। তাঁর স্মৃতিচারণে লেখা থাকবে: ছোট তুচ্ছ ব্যাপারে তিনি নিন্দনীয়রূপে তুচ্ছ ছিলেন, বড় ব্যাপারে তিনি বীরের মত বড় ছিলেন।

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে ডোয়াইট আইজেন-হাওয়ারের স্থান যে ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তার চেয়ে নিচে তাঁকে স্থান দিচ্ছি এই স্বীকৃতি আমাকে করতে হচ্ছে। আমি এখন নিরানন্দ চিত্তে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬ সালে আমি যা ভেবেছিলাম আমাদের তৃতীয় আধুনিক রাষ্ট্রপতির স্থান তার চেয়ে নিচেই। তখন আমি লিখেছিলাম: "আইজেনহাওয়া এখুনি পোল্ক ও ক্লীভল্যাণ্ডের চেয়ে উঁচু আসনে আছেন এবং তাঁর জেফারসন ও থিয়োডর রুজভেল্টের সমকক্ষ হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এই রাষ্ট্রপতিকে গ্র্যাণ্টের সমপর্যায়ভুক্ত করা বাতুলতামাত্র। আইজেনহাওয়ারের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা অর্থহীন কথা আমরা বলে যাব যতদিন না এই ঢক্কা নিনাদ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হচ্ছে। কিন্তু জেনারেল গ্র্যাণ্টকে নিয়ে টানাটানি করার সত্যি কোন অর্থ নেই।

জেনারেল গ্র্যাণ্ট শান্তিতেই থাকুন, আমাদের বংশধরেরা জেনারেল আইজেন-হাওয়াকে নিশ্চয়ই তাঁর বেশ উপরে স্থান দেবেন। কতটা উপরে দেবেন তা আমি এই পংক্তির পরে লিখব, এখন শুধু এটুকু বলছি যে তিনি নিজেই সেই সমূহ সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করেছেন তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের প্রথম দিকে অব্যবস্থিত চিত্ততা দেখিয়ে। আমি এখন মনে করি তিনি মহৎ রাষ্ট্রপতিত্বের যাদুবৃত্তের পরিধির বাইরেই থাকবেন। যাঁর সঙ্গে প্রাত্যহিক অন্তরঙ্গতায় দিন কাটিয়েছি তাঁর সম্বন্ধে পক্ষপাতহীন বিচার করার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক না হলেও দুঃসাহসিক তো বটেই তবু কালো আকাশের নীচে কাদা মাঠে

এ খেলায় আনন্দ আছে। তাই আসুন ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার সম্বন্ধে (যে আইজেনহাওয়া রাষ্ট্রপতি, সমরাধিনায়ক নন) সেই আটটি প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করি।

রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের তুলনায় তাঁর সময় ততটা বিক্ষুব্ধ ছিল না। সময় কঠিন ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু দুর্যোগগ্রস্ত ছিল না এবং বিংশ-শতাব্দীতে দুর্যোগের মধ্য দিয়েই মানুষ মহান রাষ্ট্রপতিত্বের গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এই বিশ্লেষণে অনেক জায়গাতেই আমি আইজেনহাওয়ারের প্রথম কার্যকাল ও দ্বিতীয় কার্যকালের মধ্যে একটা পার্থক্য করব। প্রথম কার্যকালে একজন রাষ্ট্রপতি কৃতজ্ঞতাই অর্জন করতে পারেন, অমরতা নয়। ১৯৫২ সনে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে তিনি অবশ্য ধর্মযুদ্ধের কথাবার্তা বলেছিলেন; কিন্তু আমরা জানতাম যে (১৯৫২ তে না হলেও ১৯৫৩ তে তো বটেই) তাঁর ঈপ্সিত কর্মসূচী হচ্ছে যে কোন মূল্যে ঘরে ও বাইরে শান্তি ফিরিয়ে আনা। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রাবল্য ও বিশ্বে দুঃসাহসিকতার আতিশয্য আমাদের ক্লান্ত করে তুলেছিল এবং আমরা এমন এক রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেছিলাম যিনি পুরাণো কাসুন্দি না ঘেঁটে আমাদের এই দুই পর্যায়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সাহায্য করবেন বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা স্বস্তি ঠিকই পেয়েছিলাম। ইতিহাসের পাতায় এর ফলে তাঁর খ্যাতির খাতায় শূন্য জুটতে পারে; কিন্তু আইজেনহাওয়া তাঁর জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করার লোক নন। তিনি যে কেবল নিস্তরঙ্গ সময়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁকে নির্বাচিত করাই হয়েছিল তাঁর রক্ষণশীলতার জন্য। আমার সন্দেহ হয় তিনি জানতেন না যে এ রকম সময়ে এরকম রাষ্ট্রপতির জন্য ইতিহাস দুর্বার প্রশংসায় ফেটে পড়ে না। হয়ত তাতে তার কিছু এসেও যেত না।

তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের সময় ঘটনার গতিবেগ বেড়েছিল; কিন্তু আমাদের যুগের সংকট এখন পর্যন্ত আপাত প্রতীয়মান মাত্র, দুর্ঘটনা এখনো ঘটে নি। ঘরে এবং বাইরে অনেক ক্ষতিকর ঘটনা আগে ঘটবে, তার পরে হয়তো ভাল দিনের মুখ দেখতে পাব। কিন্তু এ কথাটা অনেক আমেরিকাবাসীদের, এমন কি রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়াকেও বোঝান যাবে না। আমরা এখন পর্যন্ত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি মাত্র। সবচেয়ে দৃঢ়চেতা ও দুঃসাহসী রাষ্ট্রপতিও এই ভারসাম্যের বাইরে আমাদের কিছু করতে প্রবুদ্ধ

করতে হিমসিম খেয়ে যাবেন এবং আইজেনহাওয়া নিশ্চয়ই সে ধরণের রাষ্ট্রপতি ছিলেন না। সংক্ষেপে বলা যায় তাঁর সময় বা আরব্ধ কর্মসূচী এমন ছিল না যে তিনি মহত্ত্ব অর্জন করতে সক্ষম হতেন না; কিন্তু থিয়োডর রুজভেল্টের মতো তাঁকেও এই গৌরব অর্জনের জন্য তীব্র তৎপরতা দেখাতে হতো। ধীরে সুস্থে কাজ করতেন তিনি, সময়টাও ছিল সুস্থির; ভূকম্পন-কারীর ভূমিকা তাঁর ছিল না—তিনি ছিলেন আপোষকামী তাই তিনি ও চেষ্টাই করেন নি। ইতিহাসমনা ছিলেন না তিনি যদি ট্রুম্যানের মত তাঁর ইতিহাসজ্ঞান থাকতও তবু জ্যাকসন ও লিঙ্কনের অনুকরণ করার মত দুর্বিনয় তিনি দেখাতে পারতেন না। আইজেনহাওয়ারের সময়কে অতি সাধারণ জনতার এক সাধারণ নেতার সময় বলে আখ্যাত করা স্থূলতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক হবে; কিন্তু একজন যোদ্ধা এ সময়ে এক ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব করেছেন এ কথাটাও বাগাড়ম্বর মাত্র।

তিনি নিজেকে বারে বারেই নরমপন্থী ও রক্ষণশীল বলে অভিহিত করেছেন, ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালনে তিনি সেই পরিচয়ই দিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য হিসাবে আছে—১৯৫৪ সনের মন্দার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ, প্রতিরক্ষা বাজেটের উন্নততর প্রশাসনব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণকল্পে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ, সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে মৃদু কর্মপ্রচেষ্টা, ১৯৫৬ সনে ন্যাচরাল গ্যাস বিলে ভেটো দান এবং তাঁর কেবিনেটকে পুনর্গঠিত করার কংগ্রেসীয় চেষ্টার প্রতিরোধ করা। তাঁব অসাফল্যের প্রমাণ হয়ে আছে—ডিক্সন ইয়েট্ সম্পর্কিত ভুল, আনুগত্য প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচীর বৈষম্য ও নীতিহীনতা, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সঠিক রূপ নির্ণয়ে অসামর্থ্য, পোলিও-টিকার ব্যাপারে (Polio vaccine) সরকারের অপরিচ্ছন্ন দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ১৯৫৭ তে নিজস্ব বাজেট সমর্থন না করার মত অভূতপূর্ব ঘটনা এবং খামার সমস্যাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রতিশ্রুত সংকল্প পূরণে ভ্রমাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ। উচ্চপদে দুর্নীতি প্রতিরোধে আইজেনহাওয়া খুব বড় আদর্শের আশ্রয় নিতেন ও কর্মচারীদের তা অনুসরণ করতে বলতেন এবং তারপর যখন সামলাতে পারতেন না তখন অগোছালভাবে ছেড়ে দিতেন। এডমণ্ড ম্যানুস্তর, হ্যারল্ড টালবট, শেরম্যান এডামস্-এর অখ্যাতি তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও প্রশাসনিক অযোগ্যতার

বড় প্রমাণ। আইজেনহাওয়ার সেনেটর ম্যাকার্থির চ্যালেঞ্জের রাষ্ট্রপতি-জনোচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন কিনা সে বিচারের ভার আমি পাঠকদের উপরই ছেড়ে দেব, আমি খালি দ্ব্যর্থক এই মন্তব্য করতে চাই যে ১৯৫৭ তে মরবার অনেক আগেই সেনেটর ভীষণভাবে মার খেয়ে গিয়েছিলেন এবং আইজেনহাওয়ার (তাঁর স্বনির্দিষ্ট শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে)—হয়তো তাতে সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন।

আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে তাঁর অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করার যে দুটি দৃষ্টান্ত আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত পর্যালোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। দক্ষিণের আনুগত্য সম্পর্কিত সংকটে তিনি নৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষাসংস্কারেও তিনি দৃঢ়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর কার্যকালে ক্রমবর্দ্ধমান এই দুটি সংকটেই তিনি প্রথমে দীর্ঘকাল যাবত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পরিগ্রহ করে পরে হঠাৎ রাগে ফেটে পড়েছেন—লিট্‌ল রকের ও প্রতিনিধি পরিষদের গোঁয়াড়েরা এতে অনিবার্য ভবিষ্যতের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিতে প্ররোচিত নিশ্চয়ই হয় নি! সময়, জনমানস ও জাতির কিছু স্থিত-স্বার্থ-বিশিষ্ট জনসংখ্যা দক্ষিণের বিদ্যালয়ে শান্তি ও সর্বত্র পর্যাপ্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁর আবেদনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তবু ক্ষমতার ন্যূনতম প্রয়োগে তিনি এদের বাধাদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন (যখন বাধা দিতে মনস্থ করেছিলেন তখনই)। তার চেয়েও খারাপ কথা তিনি কাজের বড় গলায় কথা বলতেন বেশী। জেমস্ রেষ্টনের ভাষায়—"গল্‌ফ ও রাজনীতি এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর পিছু হটা এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। ইতিহাস অনেক রাষ্ট্রপতির এবম্বিধ ত্রুটি ক্ষমা করেছে; কিন্তু আমরা আশা রাখি যে অনাগত ভবিষ্যৎ আমাদের আশা আকাঙ্খার পূরণ হবে—সেই ভবিষ্যৎ এই রাষ্ট্রপতিকে বোধ হয় ক্ষমা করবে না। তিনি যে ভবিষ্যতের সঠিক চিত্র অনুধাবন করতে পারেন নি তা নয়—তিনি তাঁর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যে রাষ্ট্রপতি তাঁর অতুলনীয় শক্তি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তাঁকে মহৎ বলতে দ্বিধা করবেন। অন্যভাবে বলা যায় ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রপতিই মানুষের মনকে

অনিবার্য সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত করার জন্য এত অধিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না এবং আর কেউই এমন শোচনীয়ভাবে সে ক্ষমতার অব্যবহার করেন নি।

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সাহস ও আনুগত্যে ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক স্বরাষ্ট্র-সচিবের সহযোগিতায় শ্রীআইজেনহাওয়ার স্বীয় নির্দিষ্ট ভূমিকায় সাফল্যলাভ করেছিলেন। দীর্ঘকাল কূটনীতির পাঠ নেওয়া সত্ত্বেও আইজেনহাওয়ার আরম্ভ করেছিলেন এক শ্লথগতি আনাড়ীর মতো। কিন্তু বিশেষ করে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির পর তিনি উদ্যম ফিরে পেয়েছিলেন এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে কোহন্ ও শাইন্ (Cohn Schine) যখন ইউরোপ চষে বেড়িয়ে আমাদের সবচেয়ে ক্ষমাশীল ও অন্তরঙ্গ সুহৃদদের চোখেও স্বাধীন আমেরিকার ছবিকে নিতান্ত মলিন করে ফেলেছিলেন তখনকার সময় থেকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছিলাম। কোরিয়ায় আমরা যতটা প্রত্যাশা করেছিলাম রাষ্ট্রপতি আমাদের সে রকম একটা সন্ধিচুক্তিই দিয়েছেন; তিনি ফরাসী উপনিবেশবাদের পঙ্কিলআবর্তের উর্ধ্বে আমেরিকাকে স্থাপন করেছিলেন এবং খুব সাহসিকতাপূর্ণ না হলেও এক বিবেচক নেতৃত্বে পরমাণুকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। জেনেভার শীর্ষ সম্মেলনে সম্মানের সঙ্গে শান্তির দাবি নিয়ে কথা বলতে একবার আমাদের রাষ্ট্রপতিকে দেখেছিলাম, কিময় এর দেয়ালে (Quemoy) তুবার অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম নিছক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করব না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

১৯৫৮ সনে নিয়মতান্ত্রিক লেবানন সরকারকে আত্মঘাতী আঘাত থেকে রক্ষা করার তাঁর সকল প্রচেষ্টা যে বুদ্ধিমানোচিত ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কায়রো, ক্যারাকাস ও কংগ্রেসে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু এখন থেকে সবচেয়ে সজাগ ও সক্রিয় রাষ্ট্রপতিকেও ব্যর্থতার স্বাদ মাঝে মাঝে গ্রহণ করতে হবে। কূটনীতির সাফল্য বিচার করার জন্য দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দরকার এবং এটা খুবই সম্ভব যে আইজেনহাওয়ার এবং তাঁকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দু'টা বছর দান করেছেন যে—যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রসচিব তিনি, দু'জনেই সাফল্যলাভ করেছিলেন বলে প্রশংসিত হবেন। (আমার অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে তাঁর সাফল্যের কোন বড় অংশ ১৯৫৯ সনের ভ্রমণের

প্রত্যক্ষ ফল কি না। আমাদের রাষ্ট্রপতিদের সাড়ম্বর দেশভ্রমণ দেখতে বেশ ভালই কিন্তু চল্লিশ বছর আগে উড্রু উইলসন দেখিয়ে গেছেন যে কড়া কূটনীতির এটা কোন বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না)।

তবু তাঁর স্বনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি সাফল্যলাভ করেছিলেন তা খুব বড় একটা কিছু হোক চাই না হোক। তাঁর কূটনীতির জন্য ইতিহাস যদি তাঁকে স্মরণ করে তবে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সাধারণ নেতৃত্বের অনুসরণে হ্যারি ট্রুম্যান যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেই স্থিতাবস্থার দৃষ্টান্ত বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ করার জন্যই করবে। ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা, পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি, পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রাম, উত্তর অতলান্তিক চুক্তিসংস্থা এবং জাতিপুঞ্জ আমাদের দায়িত্বে যে নতুন কূটনীতি প্রতিফলিত আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বকালে তার চেয়ে নতুন কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় নি—চিকাগো ট্রিবিউন বা নেশন পত্রিকা পর্যন্ত নতুন কিছু দেখতে পায় নি। ইতিহাসের বিচারে যদি এই স্থিতাবস্থার অনুসরণই যথার্থ নীতি বলে স্বীকৃত হয় তবে অবশ্য আইজেনহাওয়ার এই নীতি বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন বলে প্রশংসিত হবেন। আর যদি ইতিহাসের বিচারে এ নীতি ভ্রান্তি ব'লে প্রমাণিত হয় তবে যাঁরা আমাদের এর মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছেন তাঁদের চেয়ে বেশী নিন্দার্হ হবেন আইজেনহাওয়ার। ১৯৪৮ সনের তুলনায় ১৯৫৮ সনে আমরা অনেক ভালভাবে জানি সোভিয়েত চক্রান্তের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষায় আমাদের কত দাম দিতে হবে।

সব দিক বিবেচনা করলে বলতে হয় যে আইজেনহাওয়ারের রাষ্ট্রপতিত্ব এমন কিছু ছিল না যার জন্য ভবিষ্যৎ দুহাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করবে। বস্তুতঃ পূর্বে উল্লিখিত নেতৃত্বের তিনটি মানদণ্ড যদি তাঁর উপর প্রয়োগ করি তবে বলতে বাধ্য হব আমেরিকার মানুষের প্রত্যাশার কাছাকাছি তিনি যেতে পারেন নি—অবশ্য এটা তাঁর দুর্ভাগ্য যে জনতার প্রত্যাশা কোন রাষ্ট্র-পতিই পূর্ণ করতে পারেন না। আমরা তাঁর কাছে কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছিলাম; কিন্তু কংগ্রেসে তাঁর মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষকে যথাক্রমে অনুপ্রেরণা ও সতর্কীকরণ দ্বারা যে ভাবে বশে আনা সম্ভব হ'ত আইজেন-হাওয়ার তা করতে পারেন নি। বলা বাহুল্য এক হাজার বক্তৃতার চেয়ে এবম্বিধ প্রণালী অনেক বেশী কার্যকরী হ'ত। ১৯৫৯ সনে শ্রমসংস্কার আইনের

স্বপক্ষে যে ভাবে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন, রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় আর কখনো সে রকম করেন নি। তাঁর স্বপক্ষে এ কথা বলা যায় যে তাঁর কার্যকালের তিনচতুর্থাংশ সময় তিনি কংগ্রেসে গণতন্ত্রী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্মুখীন ছিলেন; কিন্তু যখন আমরা ভাবি যে তিনি সেনেটর জনসন, রাসেল, জর্জ, ব্রিকার ও ম্যাকার্থির কাছ থেকেই আনুগত্য বেশী পেয়েছেন, আবার যখন ভাবি সে তাঁর কার্যসূচী নিজদল ও বিরোধীদলকে সমভাবেই অনুপ্রাণিত করত তখন এ যুক্তি ধোপে টেকে না।

প্রশাসনের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতাও তিনি খুব কিছু একটা ছিলেন না। যদি নৈতিক অনুশাসন কংগ্রেসকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে (আইজেনহাওয়ার এ ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন) তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নীতি নির্ধারক ও প্রয়োগকারীদের উপর রাষ্ট্রপতির নৈতিক নেতৃত্ব ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা আরো কম। এ ক্ষেত্রেও যাঁরা তাঁকে আর একজন জ্যাকসন ভেবেছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। আর কোন রাষ্ট্রপতিই এ রকম একটি আগ্রহী ও অনুগত দল পান নি (স্কট ম্যাক্লাওডের মত জলন্ত দৃষ্টান্ত বাদে) এবং কোন দলই নেতার মতিগতি সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞ আর কখনো ছিল না। শ্রীডালেস জানতেন রাষ্ট্রপতি শান্তি চান, কিন্তু জানতেন না পৃথিবীর প্রত্যেক সমস্যাসঙ্কুল কেন্দ্রে কী মূল্যে তিনি শান্তি কিনতে প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীরোজার্স জানতেন রাষ্ট্রপতি ভ্রাতৃত্বে আস্থাশীল ছিলেন কিন্তু লিট্‌ল্ রক, আটলাণ্টা ও মণ্টগোমারিতে যতটা সমর্থন তাঁর প্রাপ্য ততটা কোন সময়েই তিনি পান নি। শ্রীব্রানডেজ ১৯৫৭ সনে রাষ্ট্রপতিকে এক আধুনিক প্রজাতন্ত্রী বাজেট উপহার দিয়েছিলেন কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে শ্রীহামফ্রে অন্য রকম এক বাজেটের কথা ভাবছেন তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন (সত্যিই কি অবাক হয়েছিলেন?)। মোদ্দা কথা এই যে শ্রীআইজেনহাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের লক্ষ্য বা পন্থা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না—অথচ পিরামিডের শীর্ষে অধিষ্ঠিত এক সার্থক প্রশাসকের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিচে কি ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে স্বতোৎসারিত কৌতূহল পোষণ করা।

পরিশেষে বক্তব্য, ইতিহাস নিশ্চয়ই আমেরিকার জনসাধারণের নেতা হিসাবে আইজেনহাওয়ারকে ব্যর্থকাম মনে করবে। ১৯৫২ সনে ৬,৫০০০০০ ও ১৯৫৬ তে ৯৫০০০০০ জন তাঁকে ভোট দিয়েছিল—আর কোন রাষ্ট্রপতিই

এত ভোট পান নি। অথচ হার্ডিঞ্জকে বাদ দিলে আর কেউই এতটা জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এত কম প্রভাব বিস্তার করেন নি। ১৯৫৬ সনের নির্বাচনে তিনি তাঁর দল অপেক্ষা ৭০ লক্ষ বেশী ভোট পেয়ে যে ঐতিহাসিক নজির আমেরিকার ইতিহাসে সৃষ্টি করেন তার সুবিধা গ্রহণ করতে তিনি পারেন নি।

একশো বছরে এই প্রথম এক রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হলেন যাঁর দলে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হয় নি। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা ভেবে পাবেন না কি করে একজন রাষ্ট্রপতি এত অধিক সংখ্যক আমেরিকাবাসীকে তাঁর স্বপক্ষে ভোটদানে প্রবুদ্ধ করলেন অথচ তাঁর দলের স্বপক্ষে ভোট দিতে প্ররোচিত করতে পারলেন না। তাঁরা নিশ্চয়ই জনচিত্তে দৃঢ়চেতা নেতার যে ছবি আইজেনহাওয়ার মলিন করে দিয়েছেন তার কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট হবেন তবে এ কথা সম্ভবতঃ তাঁরা স্বীকার করবেন যে নেতৃত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলেই আইজেনহাওয়ার নেতৃত্ব দিতে পারেন নি।

এই দিনে জ্যাকসন সুলভ নেতৃত্বের বিপক্ষে অন্ততঃ গোটা বারো প্রতিবন্ধক ছিল; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে; যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল আইজেনহাওয়ারের রাষ্ট্রপতি হিসাবে কঠিন পরিশ্রম করার অসামর্থ্য বা অনিচ্ছা (এ দুটো একই জিনিস)। আমি অন্ততঃ ২০টা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি যে আইজেনহাওয়ার তাঁর কর্তব্যে অবিচল ছিলেন না, আন্তরিকতা দেখান নি কিন্তু একটা উদাহরণই যথেষ্ট : ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের কোন সদস্যের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎকার হ'ত না। এটা লিখতে অবাক লাগে যে তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতেন। ক্লিফোর্ড কেজ যে কতদিন হোয়াইটহাউসের দড়জায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠাণ্ডা করে ফেলেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সেনেটর কেজের মত অনুগত ও ক্ষমাশীল তো সবাই নয়, তাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণে অসাফল্যের বেশ বড় রকমের একটা কারণ হচ্ছে এই যে আইজেনহাওয়ার সদস্যদের বন্ধুত্ব অর্জনে সচেষ্ট হন নি, এ কথা অবশ্য সত্য যে মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার একটা সীমা রাষ্ট্রপতির আছে; কিন্তু শ্রীআইজেনহাওয়ার দৃশ্যতঃ ১৯৫৪ ও ১৯৫৯ সনে কার্যারম্ভের কয়েকটা দিন ছাড়া আর কোন সময়েই এই সীমারেখার কাছাকাছি যান নি। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত অধিকাংশ সাংবাদিক ও প্রজাতন্ত্রী রাজনৈতিক নেতারা নেতৃত্বের সামান্যতম

ইঙ্গিত পেলেই "নতুন আইক" বলে উল্লসিত হয়ে উঠতেন ; কিন্তু এটাই সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে তিনি পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কর্ম উদ্বুদ্ধ হন নি। উইলসন ও রুজভেল্ট তাঁদের কার্যকালের সর্বসময়ে যে ধরণের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তার খণ্ড অভিব্যক্তিতেই আইজেনহাওয়ার মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রশংসিত হতে আরম্ভ করেছিলেন এটা ১৯৫৯ সনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব নম্র ধারণা তিনি পোষণ করতেন, তার ফলেই তিনি প্রতিনিয়ত এক প্রবল নায়কের ভূমিকা পরিগ্রহ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে এ পদের ক্ষমতা বা লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আর তা'ছাড়া তিনি ছিলেন একজন প্রজাতন্ত্রী অর্থাৎ এই হুইস মতে বিশ্বাসী যে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের যৌথ কর্ম-প্রচেষ্টায় জাতির লক্ষ্য নিরূপণ করার রাষ্ট্রপতি-নিরপেক্ষ দায়িত্ব হচ্ছে কংগ্রেসেরই। রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের উপর বর্ষিত সমালোচনার বহুল অংশ তিনি গলাধঃকরণ করেছিলেন বলে কার্যকালের প্রথম বছরে উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফ্ট-এর ঘোষিত নীতিই অনুসরণ করে গিয়েছিলেন। ১৯৫৩-এর গ্রীষ্মে অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটতে আরম্ভ করল। রাষ্ট্রপতিপদ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত টাফ্ট্ বা হুভারের মতের সঙ্গে তুলনীয় নয় কারণ বেশ কয়েকবারই কার্যনির্বাহক বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষণে তিনি দৃঢ়চিত্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে লিঙ্কন বা ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনাও ঠিক হবে না যদিও তাঁরাই ছিলেন তাঁর আদর্শ কারণ গর্বের বা লজ্জার মুহূর্তে কোন সময়েই তিনি নিজেকে আমেরিকার শাসন পদ্ধতির স্থির কেন্দ্র বলে মনে করতেন না। ১৯৫৫ সনে ফরমোজা ও পেসকডোরসকে রক্ষা করার জন্য বা ১৯৫৭ সনে মধ্য এশিয়াকে অনুরূপ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রার্থী হয়ে তিনি কংগ্রেসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁর বিনম্র দৃষ্টিভঙ্গীর এর চেয়ে বড় প্রমাণ কী থাকতে পারে? এটা পরিষ্কার যে ট্রুম্যানের মতে সায় না দিয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রপতির সুকঠোর নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে যেখানে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করা নেই সেখানে কংগ্রেসের অনুমতি প্রার্থনা করা, অন্ততঃ যখন এ রকম প্রার্থনার সময় হাতে থাকবে তখন। এ রকম সময়ে সুকঠোর নীতিবোধ ও ভাল রাজনীতিবোধের মিল হওয়া অসম্ভব নয়। যারা প্রকাশ্যেই এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন স্পীকার রেবোর্ন তাঁদের নেতৃত্ব দিয়ে সন্দেহ

প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এ রকম দুটো অনুমতি ভিক্ষা হঠাৎ সংকটে রাষ্ট্রপতিত্বকে পঙ্গু করে দিতে পারে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার এই সমলোচনায় কর্ণপাত করেন নি। যাই হোক না কেন তাঁর পূর্ববর্তী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রপতিদের তুলনায় রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অনেক নিচু ছিল এবং এর ফলে যদি মহান রাষ্ট্রপতি হবার যোগ্যতা তিনি হারিয়ে থাকেন তবে দুঃখ প্রকাশ করার লোক তিনি নন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতিপদকে নিরাপদ করায় ভবিষ্যৎ তাঁকে ধন্যবাদ দেবে।

কুশলী প্রশাসক হিসাবে তাঁর কতটা যোগ্যতা ছিল সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। তাঁর সমর্থকরা 'অবশ্য বলেন যে একদল পরিশ্রমী ও অনুগত কর্মচারীদের মধ্যে নিপুণভাবে রাষ্ট্রপতিত্বের দায়িত্ব বণ্টনে তিনি রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের চেয়ে বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর সমালোচকরা আবার বলেন যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর মজ্জায় মজ্জায় ছিল তাই তিনি যে কেবলমাত্র তাঁর ভাগ করে দিয়েছিলেন তাই নয়, ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও একদল স্ফীত স্বাধীন কর্মীবৃন্দের হাতে এমনভাবে সমর্পণ করেছিলেন যার ফলে নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করার ক্ষমতা আর তার ছিল না। তাঁরা বলেন প্রথম থেকেই তিনি রাজত্ব করেছেন কিন্তু শাসন করেন নি, বাস্তবিকই আইজেনহাওয়ারের আমল ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫-এর অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

আমার মনে হয় তাঁর বন্ধু ও সমালোচকদের তীব্র মতামতের মাঝামাঝি জায়গায় সত্য ভাষণ লুকিয়ে আছে। হ্যারি ট্রুম্যানের আমলের রাষ্ট্রপতিত্ব থেকে আইজেনহাওয়ারের রাষ্ট্রপতিত্ব কম নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল না, কল্পনায় আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যাপকভাবে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়ে রাষ্ট্রপতি তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে নিজের কাজের জন্যে বেশী সময় সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। তাঁর কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি ও সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা সৌভাগ্য তিনবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে রাষ্ট্রপতিত্বকে সচল রেখেছিল এমন এক সময়ে যখন রাষ্ট্রপতি অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন—এটা কম ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার্য যে আর দুজন আধুনিক রাষ্ট্রপতির তুলনায় আইজেনহাওয়ার নিজেরই অত্যন্ত স্ফীতোদের এক কার্যালয়ের বন্দী হয়ে গিয়েছিলেন—এমন একটা কার্যালয় যেখানে তাঁর বার্তা সচিব 'রাষ্ট্রপতি' না বলে বলতেন "আমরা" যেখানে শেরম্যান এডামস্ বছর বছর ধরে একজন স্বৈরাচারীর মত ক্ষমতা

ভোগ করে গেছেন ও এই ধারণা দিয়ে গেছেন যে রাষ্ট্রপতির চেয়ে তিনিই রাষ্ট্রপতিত্বের কর্মধারা ভাল বোঝেন, যেখানে হোয়াইটহাউস এক অন্য নিরপেক্ষ ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল যার অভিব্যক্তি জোসেফ মার্টিনকে ১৯৫৯ সনে সংখ্যালঘুদলের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। শেষ অধ্যায়ে শিল্প সভ্যতায় ক্রমবিকাশের ফলে রাষ্ট্রপতিত্বের বিপদ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আমি করব তবে স্বীকার করছি যে পূর্বে যে সতর্কবাণী আমি অন্য জায়গায় উচ্চারণ করেছি তা আইজেনহাওয়ারকে মনে করেই করেছি। রাষ্ট্রপতিত্বের অনেক স্কুলছাত্র মনে করেন যে আইজেনহাওয়ার কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের যশ ও অপযশের ক্লেশকর অভিজ্ঞতা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তাঁর সমালোচকদের পরিশ্রম ব্যয়িত হওয়া উচিত গভর্ণর এডাম্‌স ও জেনারেল পার্সনস্‌ তাঁকে যে বাড়তি সময়টুকু দিয়েছিলেন তা কি ভাবে তিনি ব্যয় করেছিলেন সেই পর্যালোচনায়, যদিও তাঁর সহকর্মীদের উপর খবরাখবর নেওয়া ও পরামর্শ দেওয়ার যে ব্যাপক দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাও সমালোচনার যোগ্য। নিজের বাছাই করা কিছু লোককে এরই ভিতর আর একটু কাছে আসতে দেবার চেষ্টা করলে তিনি ভাল করতেন, আর সেই আনন্দ স্নিগ্ধ সন্ধ্যার কিছু অংশ যদি তিনি তাঁর সমালোচনা মুখর খবরের কাগজ পড়ে কাটাতেন তবে ভাল হত। যাই হোক না কেন, টু্ম্যানের থেকে অন্ততঃ দেড়পা তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতিত্বের আঙ্গিকের উন্নয়ন করে—রাষ্ট্রপতিপদ এতে লাভবানই হয়েছে। যদি ক্ষমতার কিছু অংশ তিনি সমর্পণই করে থাকেন, পরবর্তী রাষ্ট্রপতির পক্ষে তা ফিরে পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

রুজভেল্ট এবং টু্ম্যানের মতোই আইজেনহাওয়ারের চারপাশের লোকেরা-দোষে গুণে মিলিয়ে যৌথ চিত্র গড়ে তুলেছিলেন। এই ঢিমে ক্রমবিবর্তমান দিনগুলিতে যাঁরা দেশকে চালনা করেছিলেন স্পষ্টতই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, সাহস ও পরিহাসবোধ কিছু নিম্ন মানের ছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা, মিতব্যয়িতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার প্রমাণও আমরা এঁদের কাছে পেয়েছি। আমেরিকার "সবচেয়ে ভাল ভাল মাথাকে" একত্র করে কাজে লাগানো—সে অঙ্গীকার তিনি ১৯৫২ সনে নির্বাচনের আগে করেছিলেন অনেক নিশ্চল রাতে বিনিদ্র মানসনেত্রে নিশ্চয়ই তা ভয়ে ভয়ে স্মরণ করতেন, কারণ এ প্রতিশ্রুতি তিনি

স্বীয় ধারণা অনুযায়ী ও পূরণ করতে পারেন নি। প্রজাতন্ত্রী, রাজনীতি ও আমেরিকার জনমানস যে তাঁর কর্মের স্বাধীনতাকে এমন প্রবলভাবে খর্ব করে দেবে তা কি তিনি জানতেন? যেখানে কাজের জন্য যোগ্য লোক চাই বলে দাবি তোলা যুক্তিসঙ্গত হত সেখানে তিনি লোকের জন্য কাজ চাই বলে না বুঝে ধ্বনি তুলেছিলেন আর তা'ছাড়া তাঁর প্রশাসন ছিল এক ব্যবসায়ীদের প্রশাসন এবং ব্যবসায়ীরা সঙ্গত কারণেই অধ্যাপনার মত হাতের কাজ ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতির ডাকে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক ছিল না। এটা খুবই স্পষ্ট যে আইজেনহাওয়ার তাঁর চারপাশে জড়ো করা প্রতিভাবান পুরুষদের জন্য খ্যাতি অর্জন করবেন না। তাঁর নিজের বিভাগের কাজের জন্য নিপুণ সহযোগী নির্বাচনে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন; কিন্তু জাতির প্রধান প্রধান পদাধিকারে তাঁর মনোনয়ন সাফল্য লাভ করে নি। জেমস্ হ্যাগার্টি, আর্থার বার্নস্, গ্যাব্রিয়েল হজ, জেরাল্ড মরগ্যান, রবার্ট মেরিয়াম, বার্নার্ড শ্যান্‌লে, জেনারেল গুডপেষ্টার, জেনারেল পার্সনস্, রোজার জোনস্, রবার্ট কাটলার এবং অনুতপ্ত শেরম্যান এডাম্‌স যৌথ প্রচেষ্টায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের চেয়ে যোগ্যতর ছিলেন। যে উনিশজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা কার্যনির্বাহক বিভাগের নানা প্রশাখার অধিকর্তা ছিলেন তাঁদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশ কিছু কম ছিলেন প্রথম শ্রেণীর পরিচালক যেমন—ফষ্টার ডালেস, মেরিয়ন ফল্‌সম্, জেমস্ মিচেল, উইলিয়াম রোজার্স, এবং অনুরূপ সংখ্যক, বিশেষ করে চার্লস উইলসন ও শ্রীমতী হবি ছিলেন একেবারেই অনুপযুক্ত। প্রধান প্রধান কার্যালয়ে—যেমন রাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও রাজস্ব সচিব পদে, যুগ্ম সমরাধিনায়কপদে, আণবিক শক্তি সংস্থার পরিচালনায়ও বড় বড় দূতাবাসে—শ্রীআইজেনহাওয়ার এমন একদল সহযোগী নিয়োগ করে পরিতৃপ্ত ছিলেন যাঁদের নাম লিঙ্কন যাঁদের সাহায্যে কীর্তিমান হয়েছিলেন (সেওয়ার্ড, চেজ, স্টানটন, ওয়েলস, চার্লস ফ্রান্সিস এডামস্, শেরম্যান ও গ্র্যাণ্ট) তাঁদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হবে না। কেবলমাত্র জন ফষ্টার ডালেস এই শ্রেণীতে হয়তো পাত পেতে পারেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎই যথার্থ রায় দিতে পারবে। কারণ ভবিষ্যৎ কেবল বলতে পারে যে তাঁর গোঁড়া সাম্যবাদ বিরোধিতা আমাদের সময়ের যথার্থ নীতি ছিল কিনা, সুতরাং তাঁকে কীর্তিমান বলা যায় কিনা। যদি তাই ইতিহাসের রায় হয় তবে রাষ্ট্রসচিব হিসাবে তিনি যাঁর মুখপাত্র ছিলেন সেই রাষ্ট্রপতির খ্যাতির বিনিময়েই

ডালেস প্রথিতযশা হবেন। বলা বাহুল্য কীর্তিলাভেচ্ছু কোন রাষ্ট্রপতির কোন রাষ্ট্রসচিবই অতীতে এমনভাবে কাজ করে যান নি। আইজেনহাওয়ার ও ডালেসের মধ্যে যে আশ্চর্যরকম সম্পর্কসূত্র বর্তমান ছিল তার ফলে নেতার চেয়ে সহযোগীরই মর্যাদা বেড়েছে এবং এই সম্পর্কই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের হাতে চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে দেবে যে আইজেনহাওয়ার ইতিহাসে স্থান পাবার স্বপ্ন দেখতেন না। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এক মূল্যবান নজির হচ্ছে ডালেসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূলে আমাদের মনোভাবের আপাত প্রতীয়মান পরিবর্তন। ডালেস জীবিত এবং সুস্থ থাকলে ক্রুশ্চেভের আমেরিকা পরিক্রমা সম্ভব হ'ত কিনা সে প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং অনিবার্য উত্তর হচ্ছে যে সে সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। সুতরাং ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ পযন্ত আমাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা কার ছিল এ প্রশ্ন আমরা নিশ্চয়ই করব।

শ্রীআইজেনহাওয়ারের পক্ষে একটি যুক্তি জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করা দরকার: সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে তিনি ট্রুম্যানের চেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ তাকে আমেরিকার ইতিহাসে এক মহান বিচারালয় স্থাপন করার প্রচেষ্টায় খুব সচেতনভাবে না হলেও নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রশংসা করবে। শ্রীআইজেনহাওয়ার তাঁর কাজ করে গেছেন—বাদ বাকিটা অবশ্য মুখ্য বিচারপতি ওয়ারেণ ও তাঁর সহযোগীদের কর্তব্য।

মানুষটি সম্বন্ধে সহস্রবার উচ্চারিত মন্তব্যেরই পুনরুক্তি করতে হয়, ব্যতিক্রম শুধু এই যে জনচিত্তের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলেই হয়তো তিনি রুজভেল্টের মত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। যে রাষ্ট্রপতিকে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রদ্ধা করে ও অপর অংশ ঘৃণা করে তাঁর অমরত্বের সম্ভাবনা যে রাষ্ট্রপতি সর্বজননন্দিত (মাত্র জনকয়েক ছাড়া) অর্থাৎ আমেরিকার বহুলতম জনসাধারণ কর্তৃক নন্দিত তাঁর চেয়ে বেশী। ভদ্রতা ও নম্রতার যে বহিঃপ্রকাশ তাঁকে আমেরিকার অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়ে জনচিত্তে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছিল তাই কালের প্রলেপে উদাসীনতার রূপ নিয়ে ভবিষ্যতে মহান রাষ্ট্রপতিদের থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন,

কিন্তু ক্রোধের পাত্র হন নি। আমি তো ওয়াশিংটনের পরে কোন স্মরণীয় রাষ্ট্রপতির নামই করতে পারি না যিনি দুটোই সমানভাবে উদ্রেক করান নি। (ওয়াশিংটন উদ্রেক করিয়েছেন নিছক ভীতি, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রপতিরা তা করান না)।

রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের সামাজিক আচরণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। যে যুগে বুদ্ধিবাদই আমাদের সর্বাত্মক ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে সেই যুগে তিনি ছিলেন এক গোঁড়া ও অনতিবোদ্ধা পুরুষ। ভুল সময়ে এবং ভুল কারণে এই মাথা গরম লোকটি রাগে ফেটে পড়তেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগ অনুধাবন করার যে যোগ্যতা থাকা উচিত তা তার ছিল না। এমন কি তাঁর সপ্রশংস বন্ধুরাও সময় সময় বুঝতেন না তাঁর কথায় ও কাজে কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা। শুল্ক হ্রাসে, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে, অনমুগত বলে নিন্দিত ব্যক্তিদের প্রতি সৌজন্যের প্রশ্নে বা দক্ষিণের শ্বেতভদ্রলোকদের সহনশীলতায় দীক্ষিত করার ব্যাপারে তিনি যা বলতেন আর যা করতেন তার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল।

তবু এ কথা বলতেই হবে—তাঁর জীবনে ও চরিত্রে আমেরিকার জনমানসে যে আদর্শপুরুষ বিরাজমান তাঁর সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল। ছোট শহরের এক দুগ্ধব্যবসায়ীর বালক কর্মচারী, ওয়েষ্ট পয়েণ্ট-এ এক ফুটবল হাফব্যাক যার ক্রীড়া-চাতুর্য বিপক্ষের মনে ধাঁধা সৃষ্টি করত, মার্শাল ও ম্যাক্ আর্থারের খুব সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক সেনানী, এক সেনাপতি যিনি বহুমনকে একত্রিত করে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়েছিলেন ও এক পিতামহ যাঁকে ছোট অথচ সক্রিয় একদল সুবিনয়ী বংশধরের দলে ঘিরে রেখেছে—এই ছিল আইজেন-হাওয়ারের ভূমিকা। সবল পুরুষকার, সাহস, সততা, দক্ষতা, বন্ধুত্ব, যুক্তিবাদিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন তিনি—যথার্থ মহত্ত্ব এ ছাড়া আর কিসে প্রতিভাত হয়?

রাষ্ট্রপতিত্বের উপর আইজেনহাওয়ারের প্রভাব তিন স্তরে বিভক্ত। তাঁর কার্যকালের প্রথম বছরে মনে হয়েছিল তিনি পদাধিকারের যোগ্য নন। রাষ্ট্রপতিত্বের ছাত্ররা তিনি যে তাঁর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করছিলেন না—তাতে খুব বিচলিত বোধ করেন নি। তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন এ দেখে যে এক অবাধ্য কংগ্রেসকে যে ২০ বছরের কার্যনির্বাহক বিভাগের 'হস্তক্ষেপের'

উপর যবনিকা পড়ল বলে শুধু উল্লসিত হয়েই ক্ষান্ত ছিল না উপরন্তু নিজেই কার্যনির্বাহক বিভাগের উপর খবরদারি করতে উদ্যত হয়েছিল, নিয়ন্ত্রিত করতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৯৫৩ সনের কোন এক সময়ের পর থেকে শ্রীআইজেনহাওয়ার আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করলেন এবং পরবর্তী দু'বছর শক্ত না হলেও বেশ দৃঢ় রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করে-ছিলেন। তাঁর উদ্যমদীপ্ত কার্যকালের অধিকাংশ সময়েই এমনভাবে কাজ করে গেছেন যার ফলে ঐ পদাধিকার মর্যাদা বেড়েছে কারণ নিজস্ব সংযত পদ্ধতিতে তিনি ট্রুম্যান ও রুজভেল্টের অনেক নজির (যার মধ্যে সংকটের অথবা গোষ্ঠী-প্রীতির ছাপ স্পষ্টতঃই দেখা যেত) রাষ্ট্রপতিত্বের স্বাভাবিক কর্মধারায় নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় ১৯৫২ সনে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপতির বিশেষ দরকার ছিল, কারণ যতদিন না নিজ অভিজ্ঞতায় প্রজাতন্ত্রীরা বুঝতে পারছিল যে হুইগ নীতি একেবারে অচল ততদিন প্রজাতন্ত্রীদলের আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যেত না। তাঁর পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করার মতো শক্তি তাঁর ছিল কিন্তু এতটা ছিল না যার ফলে তাঁর দলের হুইগদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারতেন, এর ফলেই হুইগদের শিক্ষিত করে তোলার এক ভাল সুযোগ তিনি নষ্ট করেছিলেন। এই সাধারণ পর্যালোচনার পর আমরা তাঁকে নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য প্রশংসা করতে পারি: ব্রিকারের সংশোধনীর সফল প্রতিরোধ করা, ক্যাবিনেটকে ক্রমবর্ধমান হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা, জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা, সাংবাদিক সম্মেলনকে আরো মার্জিত করা, অসামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সমাধান এবং উপরাষ্ট্রপতিকে দিয়ে কিছু করান যায় কিনা সে বিষয়ে তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ চেষ্টা। মোটামুটিভাবে ১৯৫৩ সনে যখন তিনি অর্থহীন সৌজন্যে সেনেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখনকার সময়ের তুলনায় ১৯৫৫ সনে, যখন তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে আইন সংবিধানসম্মত নয় বলে তিনি সই করা সত্ত্বেও সে আইন চালু করবেন না, তিনি অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় আইজেনহাওয়ারের রাষ্ট্রপতিত্বের তৃতীয় স্তরের সূচনা হ'ল। ১৯৫৩ সনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তিনি ভুলতে পারেন নি তাই কংগ্রেস ও দেশের যে অংশ রাষ্ট্রপতিকে মাপ মত ছেটে ফেলতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে পদাধিকারের

ক্ষমতা ও সম্মান রক্ষার যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের হাতে মাত্রাতিরিক্তভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, তার ফলেই রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। আমি আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি, হোয়াইটহাউস শ্রীআইজেনহাওয়ারের দ্বিতীয় কার্যকালে রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা অনেকটাই আত্মসাৎ করেছিল। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই ভারসাম্যহীনতা তাঁর উত্তরাধিকারীরা অতি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

রবার্ট দোনোভান বলেছেন একবার এক ক্যাবিনেট বৈঠকে আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতিত্বকে খর্ব করে গেছেন এই অপবাদ মাথায় নেবার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি হন নি এবং নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তাঁর কোন আশঙ্কার কারণ নেই। ১৯৫৯ সনে শক্তিমত্তার যে পরিচয় তিনি রেখেছিলেন তা হেন্‌রি লুস ও আর্থার ক্রুক-এর সচেষ্ট কল্পনা মাত্র ছিল না এবং এর ফলেই রাষ্ট্রপতিত্ব নতুনভাবে সতেজ ও সবল হয়ে উঠেছিল। একটু সন্দেহ থাকলেও আমার মনে হয় ইতিহাস তাঁর কার্যকালের শেষ দু'বছরকে, যখন হামফ্রে, ডালেস ও এডাম্‌স তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন না, চতুর্থ এবং তুলনামূলক ভাবে রাষ্ট্রপতির সফলতার কার্যকাল বলে মনে করবে।

ইতিহাসের উপর আইজেনহাওয়ারের প্রভাবের কথা বলা মানে কল্পনার জাল বুনে যাওয়া। যে ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে অভ্যস্থ ইতিহাস বিশেষ করে তাঁদের সঙ্গে নির্দয় খেলা করে। আমি জানি আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবার আগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সবটাই হয়ত প্রত্যাহার করতে হতে পারে। কিন্তু এতদূর এসে তো ফিরে যেতে পারি না, তাই বলছি যে শ্রীআইজেনহাওয়ার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে বিবেচিত না হলেও তাঁর যুগের এক বিশ্বস্ত সন্তান বলে চূডান্তভাবে অভিহিত হবেন--আগেই বলেছি সে যুগ অমরতার যুগ নয়, সে যুগ বড় জোর কৃতজ্ঞতার যুগ।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর সামগ্রিক অবদান দুই দিক থেকে খতিয়ে দেখা হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং এই দুই দিক মোটামুটিভাবে তাঁর দুই কার্যকালের সঙ্গে সমান্তরাল। প্রথমদিকে অর্থাৎ তাঁর প্রথম কার্যকালে রদারফোর্ড হেইস (জন কুইন্সি এডাম্‌স্ নন্ তো ?) এর প্রশাসনের আমল থেকে যে রক্ষণশীলতায় আমরা অভ্যস্ত তা পর্যাপ্ত পরিমাণে তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। তিনি যে

স্থিতাবস্থা চালু রেখেছিলেন তাই নয়, তিনি পিছু হটেও গিয়েছিলেন। আমাদের বিশ্রামের সুযোগ করে শুধু দেন নি, বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি এই "প্রাণকেন্দ্রের" দরজা এমনভাবে খুলে দিয়েছিলেন যে ফলে আমেরিকার জনসাধারণ গত তিরিশ বছরে যে ঐক্য অনুভব করে নি তা ফিরে পেয়েছিল। শ্রীআইজেনহাওয়ার এ কাজ সমাধা করেছিলেন সংখ্যালঘু প্রজাতন্ত্রীদলের সুকঠিন কিন্তু আবশ্যিক নেতৃত্ব পরিগ্রহ করে। তাঁর নিজের ধারণানুযায়ী নম্র রক্ষণশীলতায় একে মণ্ডিত করতে তিনি সমর্থ হন নি সত্যি, কিন্তু এর অধিকাংশ নেতাকেই এই বিংশশতাব্দীতে তাঁকে অনুসরণ করতে প্রবুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অত্যন্ত আঁকাবাঁকা রাস্তায় কিন্তু নিজস্ব গতিবেগে তিনি প্রজাতন্ত্রী দল এবং তার সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নতুন অর্থনীতি এবং নতুনতর আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্যে পরিচালিত করেছিলেন। কাজটা খুব উত্তেজক না হলেও জনসাধারণ এবং ইতিহাস তার পূর্ণতা দেখতে চেয়েছিল এবং ইতিহাসের বিশেষ করে এইজন্য তাঁকে স্মরণ করা উচিত। এ কথা জোরের সঙ্গে বলতে হবে ইতিহাস যে রাষ্ট্রপতি প্রগতির কথা না বলে শান্তির বাণী শোনান তাঁকে অবজ্ঞাই করে। তবু ট্যাফ্‌ট্, কুলিজ বা ম্যাক্‌কিন্‌লের রক্ষণশীলতার চেয়ে আইজেনহাওয়ারের রক্ষণশীলতা নতুনতর ও উঁচুস্তরের ছিল এবং এ সম্ভব যে এর জন্যে ভূয়সী প্রশংসা তিনি পাবেন। এও সম্ভব আগামী দিনে মহান রাষ্ট্রপতিত্বের মানদণ্ড এমনভাবে ঠিক করা হবে যার ফলে এক একজন স্থিতাবস্থার সমর্থকও ভূকম্পনকারীদের সঙ্গে তুল্যভাবে বরণীয় হবেন। ইতিহাস, ঐতিহাসিক এবং আমেরিকার জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র থাকার ফলে আমি বলতে পারি শ্রীআইজেন-হাওয়ারের মত ভালভাবে কাজ করায় যে পরিতৃপ্তি অমরতার প্রতিশ্রুতির মূল্য তার চেয়ে বেশী নয়।

১৯৫৭ সনে আমরা নম্র রক্ষণশীলতার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছিলাম। আমাদের অনেকে যখন শান্তির আমেজে প্রায় স্তিমিত তখন অসংখ্য উষ্ণ নিশ্বাস আমাদের উপর পড়তে আরম্ভ করল—সোবিয়েত বৈজ্ঞানিক, চীনা ইস্পাতকর্মী, ক্রুদ্ধ ল্যাটিন, ক্রুদ্ধতর ভার্জিনিয়াবাসী ও আর্থিক সচ্ছলতার দিনে জীবিকাহীন আমেরিকাবাসীদের আমাদের কল্পনা ও শক্তিকে পেছনে ফেলে দিন এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল এবং এ সময়ে এমন একজন নেতার দরকার

ছিল যিনি আমাদের স্থূল সচ্ছলতার মদিরতা থেকে জাগ্রত করে কঠিন ভবিষ্যতের বন্ধুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে পারতেন। আবার বলছি শ্রীআইজেন-হাওয়ার এ ধরণের নেতা ছিলেন না। সময় তাঁর অনুকুল ছিল না, পরিবেশও তাঁকে সাহায্য করে নি—তাঁর নির্বাচনী কর্মসূচী, স্বীয় দলে ভাঙ্গন, বিপুলভাবে পুনর্নির্বাচিত হবার সময়ের নতুন সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ যা তাঁকে পঙ্গু করে ফেলেছিল, উপর্যুপরি তিনবার অসুস্থ হয়ে পড়া এবং সাধারণ শক্তিহীনতা, এ সমস্তই তাঁর প্রতিকূলে কাজ করেছে। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক অসাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁর জীবনদর্শন—তাঁর চরিত্র, অনুসৃত পদ্ধতি ও মনের গতি। তাঁর ছিল শান্তিকামীর ভূমিকা, এমন এক ধরণের মানুষ যিনি সবাইকে ভালবাসতে ও সবার ভালবাসা পেতে চাইতেন। জেমস্ রেষ্টন লিখেছিলেন, "আইজেনহাওয়ারের প্রবণতা ছিল সবসময়েই কথা বলার ও আপোষ করার। বক্তা এবং আপোষকামী আইজেনহাওয়ারই আমেরিকার জনচিত্তে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন"। যদি তিনি হার্বার্ট বেয়ার্ড সোপ এর স্মরণীয় উপদেশ মেনে চলতেন তবে আমরা সম্পূর্ণ নতুন এক আইজেনহাওয়ারকে দেখতে পেতাম। সে উপদেশ হলো : "সাফল্যের কোন সমাধান আমার জানা নেই, কিন্তু ব্যর্থতার নিশ্চিত পথ আমি জানি : সবাইকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা। আক্রমণাত্মক রাজনীতি ও প্রশাসনিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার প্রতি আইজেনহাওয়ারের প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল। ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান লিখেছিলেন, "ডিম ভাজার জন্য ডিম ভেঙে নিতে তিনি বিশেষ অনিচ্ছুক ছিলেন"। তাঁর মনের প্রবণতা ছিল যথার্থ সংরক্ষণশীলতার দিকে। আসন্ন সংকট সম্বন্ধে তাঁকে সম্ভবতঃ অবহিত করা হয়েছিল; কিন্তু সময়ে সময়ে বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও তিনি ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে থাকতেই পছন্দ করতেন। তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি এমন এক যুগে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন যখন অধিকাংশ আমেরিকাবাসী বুঝতে আরম্ভ করেছিল যে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা জটিলতর ও ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ।

থিয়োডর রুজভেল্টের শেষের দু'বছরের মত তিনি যদি ঋজু ভঙ্গীতে সে সবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন, এমন কি যদি অসময়োচিত চেষ্টায় উড্র উইলসনের মত প্রশংসনীয় ব্যর্থতা ডেকে আনতেন তবু সান্ত্বনার কথা ছিল; কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল তিনি এমন সময়ে কুলিজের মত বাজেট সমতা ও কর-হ্রাসের কথা বলছেন যখন আমরা নভোমণ্ডলে গিয়ে রাশিয়ানদের আমাদের

জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম। আমরা যদি কোনদিন শান্তির নতুন পথ খুঁজে পাই, যদি কোনদিন আমাদের কবর দেবার যে বাসনা ক্রুশ্চেভ পোষণ করেন তাকে বিদ্রূপ করতে পারি, যদি নিগ্রোদের নতুন সুযোগ ও মর্যাদা দিতে পারি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, যদি নভোমণ্ডলে সস্তা বাজিমাৎ করা ছাড়া বাস্তব কোন ফল লাভ করতে পারি তবে তা তাঁর জন্য হবে না। আমার আশঙ্কা নতুন উত্তেজনার যুগে এক নিরুত্তেজ রাষ্ট্রপতি (যিনি দ্বিতীয়বারে অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রতায় গদি আঁকড়ে ছিলেন) হিসাবেই তিনি পরিচিত হবেন। ওয়াশিংটনের মত পদারূঢ় হবার আগেই তিনি লোকগাথায় স্থান পেয়েছিলেন এবং আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতির সময় থেকে আজ পর্যন্ত তিনিই হচ্ছেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-প্রধান (Chief of the State)। তিনি অবশ্য ওয়াশিংটনের মত রাষ্ট্রপতি হিসাবে নতুন কোন গৌরব অর্জন করেন নি। আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে অনাগত দিনের ঐতিহাসিকেরা ও তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন যে জনসাধারণ তাঁরা তাঁকে প্রথম আটজন রাষ্ট্রপতি, এমন কি তাঁর ঠিক আগের প্রথম দশজন রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও এক পংক্তিতে ফেলবেন না। তিনি একজন মোটামুটিভাবে দক্ষ রাষ্ট্রপতি ছিলেন কিন্তু নিশ্চয়ই মহৎ রাষ্ট্রপতি ছিলেন না। যদি আমাদের বংশধরেরা তাঁকে যথার্থ ই বড় বলে মানে তবে তা করবে তার সেনাপতিত্বের জন্যে, রাষ্ট্রপতিত্বের জন্য নয়।

আমার পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো মনে করছেন আমি আইজেন-হাওয়ারের উপর অনাবশ্যকভাবে রূঢ় হয়েছি ও ট্রুম্যান সম্বন্ধে দুর্বলতা দেখিয়েছি। এই মন্তব্যের উত্তরে আমার দুটি বক্তব্য আছে: আইজেন-হাওয়ার সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে নেতিবাচক ও ট্রুম্যান সম্বন্ধে আশাবাদীর ভূমিকা পরিগ্রহ করার প্রথম কারণ এই যে জনমত আমার অনুমানের ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করে। দ্বিতীয় কারণ আমি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভবিষ্যতের রায়কে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। এতে নিজেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছি এবং আশা করছি পাঠকেরা আমি যে আমার রাজনৈতিক মতামতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেশ কিছু উপরে উঠে গেছি সে জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেবেন। আমি এই সরল সত্য ভাষণ ক'রব যে একযুগের জনপ্রিয়তা অন্য যুগের যশে রূপান্তরিত হয় না। ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারের

দৃষ্টান্ত হয়ত প্রমাণ করবে যে আক্রমণাত্মক ও জনপ্রিয়তা বিমুক্ত রাষ্ট্রপতিই যশের দাবী রাখেন। আমার কেমন একরকম সন্দেহ হয় যে ইতিহাস মানুষের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ।

কয়েকটি নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য করে এই ব্যক্তিবিশ্লেষণ শেষ করতে চাই। আমি ন্যূনতম শব্দের সাহায্যে সক্রিয় এবং আধুনিক রাষ্ট্রপতির কয়েকটা গুণের কথা অথবা যে গুণ তাঁকে অর্জন করতে হবে তার কথা বলতে চাই। এ ক্ষেত্রে আমি মহত্ত্বের কথা না বলে সাফল্যের কথা বলব, সমসাময়িক কালের প্রয়োজনের কথা বলব, বংশধরদের বিচারের কথা নয়। আমাদের রাষ্ট্রপতির মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী ও চরিত্র মাধুর্য দেখতে চাই এ তার বিস্তৃত সূচীপত্র নয়। অধিকাংশ আমেরিকাবাসীর মত আমিও আনন্দিত হব। যদি তিনি বিশ্বস্ত-ভাবে, আত্মঅহমিকায় নয়, আজকের দিনের বাইবেলে নিউ টেস্টামেন্টে The Compleat Gentlemen, the Way to Wealth নয় সব গুণাবলীর কথা বলা আছে এবং আমেরিকার বয়স্কাউটদের Hand Book নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিতে যে-সব গুণ প্রকট সে সব আত্মস্থ করেন তাহলে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য আমরা আমাদের রাষ্ট্রপতিকে সাহসী, পরিচ্ছন্ন, দয়ালু, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সৎ দেখতে চাই। আমার দাবির তালিকা বিস্তৃত নয়, কিন্তু এর প্রত্যেকটিই প্রভূত ফললাভে সক্ষম:

তৎপরতা—রাষ্ট্রপতিকে শুধু রোগমুক্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে চলবে না, তাঁকে খুব কম লোকেরই যা থাকে অর্থাৎ সেই বাড়তি উদ্যম যা এই পৃথিবীর কঠিন দায়িত্বের গুরুভারে শুকিয়ে যাবে না তা তাঁর থাকতে হবে।

এই গুণ কেবল সেই সব রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে থাকা সম্ভব যাঁরা হোয়াইট-হাউসের আনুগত্য পরিপূর্ণভাবে পান, যাঁরা এই পদাধিকারের সুযোগ সুবিধা ও এর চ্যালেঞ্জকে সমান তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট নিজজীবনের অভিজ্ঞতায় এই তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ছোট ছেলে রুজভেল্ট গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ডকে প্রার্থনা করতে শুনেছে যে বড় হয়ে তাঁর যেন রাষ্ট্রপতি হবার দুর্ভাগ্য না পোহাতে হয়। যৌবনে তাঁর কাকা থিয়োডর রুজভেল্টকে হোয়াইটহাউসে তাঁর জীবন কেমন কাটছে এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুনেছেন—"লাফাচ্ছি কেবলই লাফাচ্ছি"। আমি

পাঠকদেরই অনুমান করতে বলি এ থেকে কি ধরণের নৈতিক প্রেরণা দ্বিতীয় রুজভেল্টের পাওয়া সম্ভব।

সৌজন্যবোধ—হৃদয়ের সবলতা এবং উষ্ণতা দুই রাষ্ট্রপতির থাকা দরকার। রক্তের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে হবে, কুকুর থেকে ঠাকুর পর্যন্ত সবার ব্যাপারে সমান আগ্রহী কৌতূহল দেখাতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে জনসাধারণের সাম্নে খুলে দেবার যোগ্যতা তাঁর রাখতে হবে ও গণতন্ত্রে অবিচল নিষ্ঠা তাঁর থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতিত্ব আজ এক গণতান্ত্রিক পদাধিকার, রক্ত যাদের ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এ রকম লোকের জায়গা এখানে হবে না।

রাজনৈতিক দক্ষতা :—অতীতে আমরা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবুদ্ধ কোলাহলে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক কিন্তু নির্বাচিত হলে আদর্শ রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন এ রকম অনেক উন্নতমনা লোকের কথা আলোচিত হতে শুনতে পেতাম। অতীতে যদি এ কথা সত্যিই হয়ে আসে আজ এ অসত্য। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার খাটো যোগ্যতা যদি তাঁর না থেকে থাকে, রাষ্ট্রপতির মত খাটো পদে বসবার যোগ্যতাও তাঁর নেই। যদি জনসাধারণকে নিজেকে নির্বাচিত করতে প্রবুদ্ধ করতে নাই পারেন তবে কি করে তিনি তাঁদের বিনা নির্দেশে নিজ নিজ কর্তব্যে প্রবুদ্ধ করতে পারবেন?

চতুরালি—এই গুণের প্রকাশ্য স্বীকৃতি নেই, বহুল ব্যবহারে উৎসর্গীকৃত মনকে এ নষ্ট করে দিতে পারে। তবু রাষ্ট্রপতিকে যদি তাঁর চারপাশের জন্য জনা বারো প্রতিভাবান ব্যক্তির কাছ থেকে নিরলস কাজ পেতে হয় বা তাঁদের বশে রাখতে হয় তবে তাঁকে মানুষকে বশ করবার এবং গলিয়ে নিয়ে যাবার সূক্ষ্ম কৌশল আয়ও করতে হবে।

ইতিহাস জ্ঞান :—

মনের এই প্রবণতা তাঁকে দশের উর্ধ্বে তুলে ধরবে, লিঙ্কনের পাশে বসিয়ে তাঁকে শান্ত অথচ মহিমান্বিত করে তুলবে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ কোন মানুষই ইতিহাসমনা রাষ্ট্রপতির সমকক্ষ হতে পারে না—এই বাস্তব জ্ঞান তাঁকে ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যখন তাঁকে একা রুখে দাঁড়াতে হবে তখনো এই বিজ্ঞতা তাঁকে দশের সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা দেবে। সঙ্কটমুহূর্তে ওয়াশিংটন, জ্যাকসন, লিঙ্কন, কখনো কখনো হার্ডিঙ্গ বা কুলিজ

অনুরূপ পরিস্থিতিতে যা করেছেন আজকের রাষ্ট্রপতিকে তাই করতে হবে—নতুন কিছু নয়।

সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস :

রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যেন ছিন্ন না হয়, তা তাঁকে দেখতে হবে। মানুষ কি ভাবছে ও তাঁর কার্যাবলীর কি ভাষ্য দিচ্ছে তা তাঁকে জানতেই হবে। যদি নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ থাকে তবে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিষ্কার যোগাযোগ তাঁকে রাখতে হবে এবং ন্যুইয়র্ক টাইমস্ বা চিকাগো টাইমস্-এর প্রথম পাতা, সেণ্ট লুই-এর পোষ্ট ডিসপ্যাচের এক সম্পাদকীয় বা ন্যুইয়র্ক ডেইলি নিউজের মন্তব্য বা হার্বলক অথবা ফিটজ প্যাট্রিক্-এর কার্টুন, পিয়ার্সন বা আস্‌লপের কোন মন্তব্য বা লিপম্যান অথবা ক্রকের সংবিধানেব উপর কোন রাজোচিত ভাষণ তাঁকে পড়তে হবে—তাঁর সচিবদের সংবাদ ও মন্তব্যের এক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্তসার পড়লে চলবে না।

কৌতুকবোধ :

যদি "রেকর্ড" এবং ট্রিবিউন তিনি ভালভাবে পড়তে মনস্থ করেন তবে তাঁর চামড়া মোটা ও মন লঘু হতে হবে। অন্ততঃ দুজন রাষ্ট্রপতি প্রামাণ্য-ভাবে স্বীকার করেছেন যে পদাধিকারে টিকে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না যদি এই পৃথিবীকে ও নিজেদের নিজেরাই ব্যঙ্গ করতে না পারতেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে ব্যর্থ অনেকেরই অসাফল্যের একটা কারণ ছিল এই যে তাঁরা বিদ্রূপ কার্টুন সহ্য করতে পারতেন না, অনেক সফল রাষ্ট্রপতি আবার ওগুলো তাঁদের পড়ার ঘরে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন।

এ সমস্ত গুণের প্রত্যেকটাই বহুল ব্যবহারে রাষ্ট্রপতির ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু আমেরিকাবাসীদের সমস্ত গুণ সম্বন্ধেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা আশা করব অতীতের সকল রাষ্ট্রপতিদের মত তিনি আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযমের সার্থক সমন্বয় করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হয়তো অভিনয়ই করতে হবে। উড্রু উইলসনের শঙ্কান্বিত মন্তব্যে এক গভীর সত্য লুকিয়ে ছিল—"এই পদাধিকার একজন কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে এত ভয়াবহরূপে বড যে তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও গাম্ভীর্য রক্ষা করে কাজ ক'রে যাওয়ার ভাণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি বিনিয়োগ

যে আত্মসন্তুষ্ট ভঙ্গীতে অধিকাংশ আমেরিকাবাসী—রাষ্ট্রপতিপদের দিকে তাকান তা অতি দ্রুতই শীতল হয়ে যায় যখন তাঁরা রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন ও নির্বাচনের ভাঙ্গাচোরা বন্দোবস্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যে রাষ্ট্রপতি শাসন করার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করার জন্য কোন বন্দোবস্তই নেই দেখে তাঁরা আরো বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ১৭৯৬ সনের নির্বাচনের পর থেকে আজ পর্যন্ত একজন দক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যথার্থ পদ্ধতির জন্য আমরা বিরামবিহীন অনুসন্ধান চালাচ্ছি, একজন অশক্ত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা বা তাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা হয়ত মাঝে মাঝে উত্তপ্ত আলোচনা করি তখনই করি যখন কোন রাষ্ট্রপতি দৃশ্যতঃ অসুস্থ বলে প্রতীয়মান হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও কার্যকালের সামগ্রিক প্রশ্নে জনচিত্ত বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু বা পীড়িত রাষ্ট্রপতি বা একেবারে অকেজো রাষ্ট্রপতির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রস্তাব আনেন।

পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আমি এই অস্থিরতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য করতে চাই। বিশেষ করে বিবেচনা করতে চাই যে, আমেরিকার রাজনীতির যথার্থ ও সম্ভাব্য পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সমালোচনা কতটা যুক্তিসঙ্গত। আমার নিজের ধারণা অধিকাংশ সমালোচনাই অমূলক কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি জোরের সঙ্গে কিছু বলতে চাই না। সুতরাং এখন মনোনয়ন ও কার্যকাল সীমা সম্বন্ধে যে চারিটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি গত পনের বছর ধরে ব্যাপকভাবে আলোচিত (দুবার গৃহীত হয়েছিল) তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই অধ্যায়ে মনোনয়ন ও নির্বাচনের কথা বলব, পরবর্তী অধ্যায়ে অসামর্থ্য, উত্তরাধিকার ও পুনর্নির্বাচন সম্বন্ধে।

সংবিধান প্রণেতাগণ মনে করতেন সব মানুষ হয় নির্বোধ নয় ত জড় তাই একজন আইনানুগ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আদর্শ পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য তাঁরা অস্বাভাবিকভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। কনভেনশন গৃহে জেম্‌স্ উইলসন বলেছিলেন, এই বিষয় নিয়ে সভায় প্রবল বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল, বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন বিষয় যে ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সংবিধান প্রণেতাগণ তিরিশের বেশী ভোটে সিদ্ধান্ত করার পরেই এগার জনের কমিটি (committee of eleven) দ্বিতীয় ধারা, এক উপধারা, ২-৪ অনুচ্ছেদ (Article II, Section 1, clauses 2-4) সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন এবং তা পরে সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল।

আমি আমার পাঠকদের এপেণ্ডিক্স দুই এ এই ধারাগুলো পড়তে অনুরোধ করব। বিশেষ করে নির্বাচনী পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতা তাঁরা লক্ষ্য করুন (যেমন অঙ্গরাষ্ট্রগুলির আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের সীমাহীন ক্ষমতা); জাতীয় আইনসভার ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচনী কলেজ (Electoral college)-এর কার্যে অংশগ্রহণে অক্ষমতার কথা তাঁরা অনুধাবন করুন, প্রতিনিধি পরিষদের সর্তসাপেক্ষ ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হন, প্রত্যেক নির্বাচকের অভিনব নির্বাচনী ক্ষমতা পরীক্ষা করুন, যেমন একজন নির্বাচক দু'জন লোককে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দিতে পারেন যার মধ্যে অন্ততঃ একজন নির্বাচকের অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারবেন না।

এই দুই-ভোট প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল উপরাষ্ট্রপতিপদের মত দ্বিতীয়

শ্রেণীর পদাধিকারে একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে মনোনীত করার জন্য। কিন্তু তার চেয়ে আরো বড় কারণ ছিল, এই ব্যবস্থার ফলে নির্বাচক নিজ-রাষ্ট্রের সীমার বাইরে জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির খোঁজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই নতুন প্রজাতন্ত্রের রাজনীতিতে প্রাদেশিকতার অভিশাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেখে সংবিধান প্রণেতারা বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে জনসাধারণের নির্দেশ যাই হোক না কেন নির্বাচকেরা নিজ নিজ অঙ্গরাষ্ট্রের স্থানীয় প্রার্থীকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন। দুই ভোটের ব্যবস্থার ফলে আঞ্চলিক প্রার্থীদের জড় স্তূপের উপর নিশ্চিত প্রাধান্য বিস্তার করবে—জাতীয় প্রার্থী এ ধারণা তাঁদের হয়েছিল, আমি পাঠকদের মূল নির্বাচনী পদ্ধতির ধারাগুলো পড়ার সময় এ কথাটা মনে রাখতে বলি এবং অনুরোধ করি সংবিধান প্রণেতাগণের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী নেতার নিম্নলিখিত চারিটি প্রত্যাশার নির্দেশ ঐ ধারাগুলোর মধ্যে খুঁজে দেখতে—(১) হ্যামিল্টনের সোজা ভাষায় জন-সাধারণই নির্বাচকদের নির্বাচিত করবেন। (২) নিজের নিজের অঙ্গরাষ্ট্রে সমবেত হবার পর নির্বাচকরা বুদ্ধিমানের মত কিন্তু স্বাধীনভাবে নয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁদের দুটি ভোট দেবেন। (৩) শৃঙ্খলার ঋজুবন্ধনের বাইরে বিকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে এই ভোট গ্রহণ চলবে। (৪) সুতরাং তার ফলে প্রতিনিধি পরিষদেই অনেক নির্বাচন শেষ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হবে। সাধারণভাবে তারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সমস্ত স্তরগুলোই বিশেষ করে মূল স্তরটা, আইনসভার খবরদারির বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় জনইচ্ছা ও বিদগ্ধমনের আশার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তাঁরা এর উচ্চ প্রশংসা করতে আরম্ভও করেছিলেন। ফেডারেলিষ্টে অধিকাংশের মতামতের প্রতিধ্বনি তুলে হ্যামিল্টন বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি একেবারে আদর্শ না হলেও খুবই সন্তোষজনক।

যতদিন ওয়াশিংটনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল ততদিন মূল পদ্ধতি হ্যামিল্টনের ধারণামত সন্তোষজনক ভাবেই কাজ করে গিয়েছিল। কিন্তু এই যথার্থ জাতীয় চরিত্রের অবসর গ্রহণের ফলে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রজাতন্ত্রী দলের অভ্যুত্থানের ফলে ও রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের জন্য কংগ্রেসীয় উপদলের সৃষ্টি হবার ফলে এই পদ্ধতির অপমৃত্যু ঘটল। নির্বাচকরা অন্ততঃ

মনে মনে (ব্যালটে তাঁরা তা পারতেন না) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য দুজন আলাদা প্রার্থীর কথা ভাবতেন নিশ্চয়ই এবং তার ফলেই সংবিধান প্রণেতাদের মূল ইচ্ছা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। এরই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে এবং তার ফলেই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল—আমি পাঠকদের মনোযোগের সঙ্গে তা পড়তে বলি।

আমি বিশ্বাস করি নির্বাচনের মূল ধারার যে পরিবর্তন এতে সাধিত হয়েছে তা তাঁরা লক্ষ্য করবেন : এখন থেকে নির্বাচকরা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য আলাদাভাবে দুজনকে ভোট দেবেন।

দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হবার পর ১৫০ বছর গত হয়েছে, এখনও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতি অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু জাতীয় আচরণবিধি ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় আইন এই পদ্ধতিকে একটি কেন্দ্রীভূত, প্রত্যক্ষ, বিলম্বিত, উত্তেজিত, জনপ্রিয় ও গণ-নির্বাচনমূলক প্রথায় পরিণত করেছে—সংবিধান প্রণেতাগণ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এ রকম একটা ব্যাপার ঘটবে। আইন ও প্রচলিত আচরণবিধির প্রত্যেক মূল নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হ্যারিসন ও ভন ব্যুরেনের নির্বাচন দ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জনসাধারণ ও নির্বাচকদের বিবেচনার জন্য কি ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করা সম্ভব তা সংবিধান প্রণেতাগণ বিবেচনা করেন নি; কিন্তু এর সমাধান হয়ে গেছে কংগ্রেসীয় নির্বাচনী উপদলের অপমৃত্যুতে ও মনোনয়নমূলক কনভেনশনের অভ্যুত্থানে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উইলিয়াম রিটকে এ্যান্টি মেসোনিক টিকিটে (Anti-Masonic Ticket) নির্বাচনে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়ে কনভেনশনের প্রথম অধিবেশন বসেছিল বাল্টিমোরে এবং দুটি প্রধান দল (যারা তৃতীয় কোন দলকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেন নি) একবছরের মধ্যেই তাঁদের প্রথম মনোনয়নমূলক কনভেনশন ডেকেছিলেন। আমেরিকার গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে হ্যামিল্টনের প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রে নির্বাচক মনোনয়ন সম্পর্কিত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র সাউথ ক্যারলাইনা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের নির্বাচক মনোনয়নের বেলায়ও শ্বেতাঙ্গ বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষমাত্রেরই ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণ কিন্তু প্রথম থেকেই এগিয়ে যাচ্ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসন্ধানে (যথা নির্বাচকরা শুধু জনতার

ইচ্ছারই বাহক হবেন) এবং ১৮০৪ সনে যখন দুই ভোট প্রথা তুলে দেওয়া হল তখনই বোঝা গিয়েছিল যে নির্বাচকরা জনসাধারণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র বা ঠুঁটো জগন্নাথ ছাড়া আর কিছুই হতে পারবেন না।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে একজন নির্বাচক পেনসিলভেনিয়াতে এডাম্‌স্‌কে ভোট দেবার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে জেফারসনকে ভোট দিয়েছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রমনে এখনো এক ফেডারেলিস্ট ভোটারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ঃ আমি কি স্যামুয়েল মাইল্‌স্‌কে নির্বাচক হিসাবে ভোট দিই জন এডাম্‌স্‌ না টমাস জেফারসন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হবার যোগ্যতম প্রার্থী তা আমার হয়ে ঠিক করতে?— না, আমি তাঁকে মনোনীত করি আমার সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করার জন্য আমার হয়ে ভাবার জন্য নয়।

গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের বছরগুলোতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির এই তিনটি সংবিধানী বহির্ভূত পরিবর্তনের উপর আর একটি যুক্ত হয়েছিল: ১৮৪০ সনের মধ্যে সাউথ কেরোলিনা বাদে আর সব অঙ্গরাষ্ট্রই নির্বাচক মনোনয়নে অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্বাচনী ভোটদানের ব্যাপারে তথাকথিত "সাধারণ টিকিট" প্রথা অবলম্বন করেছিল। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রের সমস্ত ভোট যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশী ভোট পাবেন তাঁর প্রাপ্য হবে। কয়েকটা অঙ্গরাষ্ট্র এই ব্যবস্থা অবলম্বন করায় অন্যরাও করতে বাধ্য হ'ল এবং ১৮৯২ সন থেকে এই ব্যবস্থাই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে চালু আছে। নেভাদা ও আলাস্কার জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতারাও মনে হয় এখন বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁরা সমস্ত নির্বাচনী ভোট এক ভাগ্যবান প্রার্থীকে দেন বলে এই নির্বাচনে তাঁরা অনেক বেশী প্রভাব খাটাতে পারেন। ন্যুয়র্ক ও ক্যালিফোর্ণিয়াতে যাঁরা প্রার্থী মনোনয়ন করেন ও নির্বাচনী প্রচার চালান তাঁদের কার্যকারিতা বিশেষভাবে নির্ভর করে সাধারণ টিকিট পদ্ধতির উপর। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে এখন থেকে জনসাধারণের কাছে আবেদন করতে হবে এবং তার মানে শুধু তাঁদের বিচক্ষণতার কাছে নয়, তাঁদের ভয়ভাবনার কাছেও।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে পদ্ধতি গত একশো পঁচিশ বছর ধরে চলে আসছে তা এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি—নির্বাচক বছরের মার্চ মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত দুই প্রধান দল মনোনয়নমূলক কনভেনশনের জন্যে তাঁদের প্রতিনিধিদের

মনোনীত করেন। অঙ্গরাষ্ট্রসমূহের প্রায় একতৃতীয়াংশে প্রত্যেক দলের ভোটাররা এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, দুইতৃতীয়াংশ দলের কার্যনির্বাহক বিভাগই প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

(২) জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুলাই-এর শেষ পর্যন্ত (যদি কোন দল জনপ্রিয় কোন রাষ্ট্রপতিকে পুনর্নির্বাচিত করতে চায় তবে আগষ্ট পর্যন্ত) মনোনয়নমূলক কনভেনশনগুলি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে তাঁদের প্রার্থী মনোনয়ন করার জন্য সমবেত হয়। আমেরিকার জনসাধারণের কাছে টেলিভিশনের কল্যাণে ব্যাপারটা এতই পরিচিত যে ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি কেবল এই কথা বলব যে প্রতিনিধিরা সংবিধান প্রণেতা ও তাঁদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা যে শূন্যস্থান রেখে গিয়েছিলেন তা পূর্ণ করতে সাফল্যলাভ করেছেন।

(৩) নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরে যে প্রথম মঙ্গলবার (কংগ্রেস আইন করে এই দিন ঠিক করেছে) সেই দিন (১৯৬০ সনে ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৪ সনে ৩রা নভেম্বর) আমেরিকার জনসাধারণ ভোট দিতে যান কার্যতঃ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য; আইন ও সংবিধান মতে অবশ্য এই পদের নির্বাচকদের নির্বাচন করতেই তাঁরা যান। সানফ্রান্সিসকো-র মধ্যরাতে তাঁরা অবধারিতভাবে নির্বাচনের যে পর্যায়ে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তার ফলাফল জানতে পারেন এবং এটাই বস্তুতঃ চূড়ান্ত পর্যায়।

(৪) ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় বুধবারের পর প্রথম সোমবার (এই দিনও কংগ্রেস আইন করে ঠিক করেছে—১৯৬০ সনে ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪-তে ১৪ই ডিসেম্বর) প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রের জয়ী প্রার্থীর নির্বাচকেরা সমবেত হয়ে যাঁদের তাঁরা ভোট দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন তাঁদের অর্থহীনভাবে ভোট দেন। যাঁরা আরো বিস্তারিত খবর জানতে চান তাঁদের জন্য লিখছি যে কিছু কিছু অঙ্গরাষ্ট্রে দলের কনভেনশনে নির্বাচকরা মনোনীত হন, অন্যগুলোতে দলের প্রাইমারি দ্বারা তাঁরা মনোনীত হন, অন্যান্য ক্ষেত্রে দলীয় সংস্থাই মনোনয়ন করে এবং গোঁড়া পেনসিলভেনিয়াতে দলের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীই নির্বাচকদের মনোনীত করে। অর্দ্ধেকের বেশী অঙ্গরাষ্ট্রে নির্বাচকদের নাম ব্যালট কাগজে পর্যন্ত থাকে না, দুটোতে (কালিফোর্ণিয়া ও অরিগনে) আইন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে তাঁরা যেন দেশের প্রথাকে অনুসরণ করেন এবং যাঁরা তাঁদের

নির্বাচিত করেছেন সেই জনসাধারণকে দেয় প্রতিশ্রুতি তাঁরা যেন রক্ষা করেন।

(৫) পরের বছর ৬ই জানুয়ারী সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ একত্রিত হয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নির্বাচনী ভোট গণনা করেন। অঙ্গরাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক বিভাগ অনুমোদন করলেই আইনের চক্ষে সেই রাষ্ট্রের ভোটগণনা চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটলে কংগ্রেস একটা হিসাবের খাতা হিসাবে কাজ করে মাত্র। ভোট গণনা শেষ হলে সেনেটের অধ্যক্ষ দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। জন এ্যাডাম্‌স্ নাম্নী—সেনেটের এক অধ্যক্ষ একবার এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছিলেন কারণ নিজেকেই রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত বলে তাঁকে ঘোষণা করতে হয়েছিল—এ্যাডাম্‌স্ বলেই খুব উৎফুল্ল না হয়েও সাহসের সঙ্গে সে কাজ সমাধা করতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসে দুইবার আমরা আরো একটি স্তর অতিক্রম করার পর নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম আমাদের রাষ্ট্রপতি কে সেই বিষয়ে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভোট সমানভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল জেফারসন ও বারের মধ্যে এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জ্যাকসন ও জন কুইন্সি এ্যাডাম্‌স্-এর কেউই নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেন নি। ফলে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা কার্যকরী হয়েছিল এবং প্রতিনিধি পরিষদকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে হয়েছিল। আরো সাম্প্রতিক কালে ৩রা নভেম্বর ১৯৪৮-এর সকালবেলায় আশঙ্কা হয়েছিল থারমণ্ড ও ওয়ালেসের প্রতিবন্ধকতায় ট্রুম্যান বা ডিউই কেউই সংবিধানসম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন না। যদি নভেম্বরের গণভোটের ফলাফল এ রকমই হত তবে প্রতিনিধি পরিষদ দেরী না করে ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯-এর অসমাপ্ত ভোটগণনার শেষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আত্মনিয়োগ করত। সংবিধানের দৃঢ় নির্দেশ অনুসরণে সদস্যরা তিনজনের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতেন—ট্রুম্যান, ডিউই ও থারমণ্ড এবং প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রের ভোটকে একটি ভোট বলে ধরা হত। ১৯৪৯ সনের নির্বাচনের বিশেষ যাদু সংখ্যাটি ছিল ২৫, এখন অবশ্য ২৬।

আমেরিকার জীবনযাত্রা প্রণালীর যে জনমত ও গণপ্রত্যাশা আমেরিকার জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রতিফলিত তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই এই

নির্বাচন পদ্ধতিতে। এর তিনটি ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আমেরিকার জনসাধারণের তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সামগ্রিক প্রস্তুতির উপর নিজেদের ছাপ রেখে দিয়েছে।

প্রথমতঃ—আমরা এক রাজনীতি সচেতন জাতি, সুতরাং এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াও একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। বৃহত্তম রাজনৈতিক দল থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম স্থিতস্বার্থবিশিষ্ট উপদল পর্যন্ত, বৃহত্তম সংখ্যালঘু জাতি থেকে আরম্ভ করে অন্যনিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠী পর্যন্ত সকলে জনসাধারণের এই সিদ্ধান্তে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এমন কি তাদের অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতিপদের গুরুত্ব অপরিসীম, সে তুলনায় রাষ্ট্রপতিত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন ও পরিচালনার উপর ততটা নির্ভরশীল নয়। আর্থার ম্যাকমোহন ঠিকই বলেছিলেন যে দুটো প্রধান দল রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা দখল করার জন্য এক শিথিল মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ! জাতীয় জীবনে তাদের অস্তিত্বের অবিচল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা।

দ্বিতীয়তঃ—আমরা ধনীর জাত। হোয়াইটহাউসে এক রাষ্ট্রপতিকে বসাবার জন্য যে পরিশ্রম, উল্লাস ও ফূর্তির হুল্লোড় চলে তার দাম দিতে হয় কোটি কোটি ডলারে। এই প্রাচুর্যের দেশে যদি অন্যের কাছ থেকে বিরাট টাকা খরচ করার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া যায় তবে রাষ্ট্রপতিপদের মনোনয়ন পাবার আশা ত্যাগ করাই ভাল; যদি প্রার্থীর মনোনীত ও নির্বাচিত হবার যোগ্যতা থেকে থাকে তবে টাকার জন্য তাঁর বেশী মাথাব্যথা না করলেও চলবে। বস্তুতঃ হোয়াইটহাউসে যাবার পথের একটা বড় অংশ গ্রীণব্যাক নোটে আবৃত।

তৃতীয়তঃ—আমরা একটি আধুনিক ও শিল্পসমৃদ্ধ জাতি, এক বিস্তৃত সমাজের নাগরিক এবং সেইজন্য নির্বাচন পদ্ধতিকে সক্রিয় রাখার জন্য জনসংযোগের অঙ্গ হিসাবে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, বই, চিঠিপত্র, জনমত, বিজ্ঞাপন, রেডিও ও সর্বোপরি টেলিভিশনের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বস্তুতঃই এক গণঅভিজ্ঞতা—ভোট দিন আর নাই দিন সমস্ত আমেরিকা-বাসীকেই এই জাতীয় অনুষ্ঠানে উল্লাসে বা অনুল্লাসে যোগদান করতেই হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলেই জাতীয় অনুষ্ঠানের এই বলিষ্ঠ

রূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছে এবং সমস্ত জাতীয় অনুষ্ঠানের মতই, এমন কি সমস্ত মানুষের মতই, এর মধ্যে গাম্ভীর্য ও প্রগলভতার এক অবিশ্বাস্য সমাহার ঘটেছে। তবু সত্যি কথা বলতে কি এই নির্বাচন গণঅভিজ্ঞতা রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে এমন কি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দেও এর সূচনা দেখা গিয়েছিল। ম্যাডিসন এ্যাভিন্যু বা টেলিভিসনের বিজয়বার্তা উন্নততর এক পদ্ধতিরই সূচক কিন্তু দ্বাদশ সংশোধনীর উপর নতুন কোন সংশোধনী এরা নয়।

এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের উপর যবনিকা টেনে দেবার সময় এসেছে। সমস্ত চিন্তাশীল আমেরিকাবাসীকে প্রতিনিয়ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন সেই চিন্তায় বিভোর রাখবার যে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিত্বের আছে তার তুলনায় তার অন্য সমস্ত ক্ষমতা নিষ্প্রভ। অধ্যাপক বিন্‌ক্লের মত উদ্ধৃত করে বলতে পারা যায় যে আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রজীবনের অস্তিত্ব সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে অন্য কোনভাবেই এমন তীব্রভাবে পরিস্ফুট হ'ত না। **ডেমোক্রাটিক ভিসটাসে** লিখিত ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতের প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই, নেই কোন উৎকৃষ্টতর অনুষ্ঠান বা সহনীয় কোন অভিজ্ঞতা, অতীতের কোন যথার্থ স্বীকৃতি বা মানুষের উপর আস্থার কোন সফলতর বহিঃপ্রকাশ। আমেরিকা-বাসীরা যথার্থই মনে করেন যে প্রতি চার বছর অন্তর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ সবচেয়ে বড় নাটকীয় অভিজ্ঞতা। যখন তিনি বলেছিলেন যে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন সেই জিজ্ঞাসার মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রত্যেক বড় প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে থাকবে তখন হ্যামিল্টন তাঁর দূরদৃষ্টির তীক্ষ্ণতার প্রমাণই দিয়েছিলেন। সেই অপ্রতিহত সময় আজ সমীপবর্তী। যে দিন এক রাষ্ট্রপতির নির্বাচন শেষ হয় সেইদিন থেকেই আগামী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনী প্রস্তুতি আরম্ভ হয়।

রাষ্ট্রপতিপদে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কিন নাগরিককে প্রতিষ্ঠিত করার যে চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ তার পরিপ্রেক্ষিতে যে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয় তার সম্বন্ধে আমাদের দুর্ভাবনায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়সাধ্য, শত শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন এই প্রস্তুতির ঐক্যসূত্র রচনা করেন অসংখ্য মানুষ। নতুন নির্বাচনী পদ্ধতি উদ্ভাবনায় সচেষ্ট কোন ব্যক্তি এর অনুকরণ অনুমোদন করবেন না। নির্বাচন

পদ্ধতি সম্বন্ধে হ্যামিল্টনের আত্মসন্তুষ্টি বহু বছর ধরেই নিন্দিত। কমিটির পর কমিটি, গবেষণার পর গবেষণা, সম্পাদকীয়ের পর সম্পাদকীয় এই পদ্ধতির স্থায়হীনতা ও বিপদ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে মনোনয়নমূলক কনভেশন ও নির্বাচনী কলেজ তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে অধিকাংশ আমেরিকান আজ মনে করেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ভুলের পাহাড়।

মনোনয়নমূলক কনভেশনের বিরুদ্ধে এত বেশী সমালোচনা হয়েছে যে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সংবেদনশীল প্রত্যক্ষদর্শীরা এর সংস্কৃতিহীনতা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেন তার পুনরুল্লেখের কোন আবশ্যকতা আছে কিনা সন্দেহ। এই বললেই যথেষ্ট যে এক বাত্যাবিক্ষুব্ধ অশ্লীল সার্কাস পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশীল পদাধিকারে প্রার্থী নির্বাচন প্রয়াসে সমবেত হয়। এতবড দায়িত্ব এর চেয়ে দুর্বলচরিত্র কোন জনতার হাতে দেওয়া সম্ভব নয় এবং হেনরি জেম্‌স যা বলেছেন এ প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়ঃ এ হচ্ছে স্থূলতা ও বাহ্যাড়ম্বরের জয়-ঘোষণা। স্বাধীন সরকারের যে মূর্তি আমাদের মনে আঁকা আছে, অর্থাৎ যে বুদ্ধিমান লোকের যুক্তিবাদী নেতৃত্ব আমরা এর মধ্যে দেখতে চেষ্টা করি তার (ব্যতিক্রম) ঘটেছে এই কনভেনশনে। অস্ত্রোগরস্কি নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ রকম এক কনভেনশন দেখে মন্তব্য করেছিলেন। যে (১) পনর হাজার লোক জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত সেণ্ট ভিটাস (Saint Vitus) নাচ নেচে যাচ্ছে গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এ রকম নয় এবং (২) ঈশ্বর তাঁর অপরিসীম বিজ্ঞতায় মদ্যপায়ী, শিশু ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে করুণাধারায় সিক্ত করে যাচ্ছেন।

তবু কনভেনশনের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিহীনতার যে অভিযোগ আনা হয় তা যথার্থ নয়। বস্তুতঃ দৃষ্টি বিভ্রমতার জন্য ভুল লক্ষ্যে এই সমালোচনা বর্ষিত হচ্ছে। আসল কথাটা হচ্ছে এই বাণিজ্য কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের হৈ হুল্লোড়-পানা বা চাষাড়ে অভিব্যক্তির বিরূপ সমালোচনা করাও যা, আমাদের বাণিজ্যকেন্দ্রিক সভ্যতার হৈ হুল্লোড়পানা বা চাষাড়ে অভিব্যক্তির সমালোচনা করাও তাই। কনভেনশনের দোষত্রুটির মধ্যেই জাতি হিসাবে আমাদের দোষত্রুটি নিহিত এবং আমরা যতদিন নিজেদের ত্রুটি সংশোধন না করি (আমি জানি আমরা তা করতে সাহসী হব না) ততদিন কনভেনশন যুক্তি-

বাদীদের অস্থির করে তুলবে, স্বজনব্যক্তিরা প্রথানুরাগীদের করবে আহত এবং আমাদের করবে চমৎকৃত। যাই হোক না কেন, যাঁরা পাত্রীজনোচিত গাম্ভীর্যে মণ্ডিত তাঁরা ভাঁড়ের মত যাঁদের আচরণ তাঁদের চেয়ে যোগ্যতার সঙ্গে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী মনোনয়নে সক্ষম এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। এ কথাও অবশ্য প্রমাণ সাপেক্ষ যে কনভেনশন যে ধরণের মনোনয়ন করে আমেরিকাবাসীদের জীবন-দর্শনের তার চেয়ে যোগ্যতর প্রতিফলন আর সম্ভব নয়।

মনোনয়নমূলক কনভেনশনের বিরুদ্ধে সূক্ষ্মতর যে যুক্তি উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে এই যে এ প্রথা অগণতান্ত্রিক, কারণ প্রার্থী মনোনীত করতে গিয়ে এ দলে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করে; এ প্রথা আস্থা অর্জনে সক্ষম নয় কারণ দলের যথার্থ ইচ্ছাকে মনোনয়ন কালে হয় এ অগ্রাহ্য করে নয়ত বিকৃত করে; এ প্রথা দুর্নীতিগ্রস্থ, কারণ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত নীতিবোধ জলাঞ্জলি না দিলে এ ধরণের অভিযানে সাফল্য লাভ অসম্ভব। আমাদের বলা হয় যে কনভেনশন আমাদের দুর্নীতি ও নৈরাশ্যের পঙ্কের মধ্য থেকে এমন একজন মানুষ উপহার দেয় যাঁকে আমরা চাই না, যিনি এ পদের যোগ্য নন। যাঁরা এ ধরণের যুক্তি উত্থাপন করেন তাঁরা সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতিপদের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে প্রাইমারি নির্বাচন দাবি করেন। সে ক্ষেত্রে হয় কনভেনশন একেবারে বিলুপ্ত হবে নয় ত গণ-মনোনয়নের স্বীকৃতিসূচক সমাবেশে পরিণত হবে।

আমার মনে হয় এ ধরণের সমালোচনায় বাস্তব অবস্থা যথার্থ প্রকাশ পায় নি। প্রথম ও তৃতীয় সমালোচনা সমান কার্যকারিতার সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বহুঘোষিত তৃতীয় সমালোচনাটি ইতিহাস সিদ্ধ নয়। ১৯১২ সনের প্রজাতন্ত্রী কনভেনশন বাদ দিলে বিংশ-শতাব্দীতে আর কবে দুই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক প্রার্থী পেয়েছেন যাঁকে তাঁরা চান নি? ১৯২০ সনের হার্ডিঙের মনোনয়ন বাদ দিলে কবে আর কোন কনভেনশন প্রথমশ্রেণীর নেতাদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয়শ্রেণীর নেতা নির্বাচিত করেছেন? পক্ষান্তরে কনভেনশনই দলের নির্বাচকদের বছর বছর ধরে এমন প্রার্থী দিয়ে আসছেন বলা যায় যাঁদের নির্বাচকরা প্রত্যক্ষভাবেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতেন যদি সে রকম সুযোগ পেতেন। কনভেনশন দলের সভ্যদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই সাহায্য করে, তাঁদের হতাশ

করে না। যদি তাঁরা অস্পষ্ট স্বরে কথা বলেন, যদি প্রার্থী সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কোন সিদ্ধান্তে না আসতে পারেন, কনভেনশন তাদের হয়ে প্রার্থী নির্বাচন করবেন, তার জন্যে একশো বার ভোটাভুটি করতে হলেও করবেন এবং কনভেনশন সে সিদ্ধান্তে আসবেন প্রায় একমতাবলম্বী হয়ে। প্রাইমারির বিপক্ষে এবং কনভেনশনের পক্ষে এক অনস্বীকার্য যুক্তি হচ্ছে এই যে এই যুগান্তকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আসার বন্ধুর পথে অনিবার্যভাবে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তা দূরীকরণে এ সাহায্য করে।

সেনেটর ডগ্‌লাস ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের "প্রেসিডেন্সিয়াল প্রেফারেন্স প্রাইমারি" স্থাপনায় উৎসাহের স্বপক্ষে কিছু বলা যায় বলে মনে করি। যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশের বেশী অঙ্গরাষ্ট্রে প্রত্যেক দলের ভোটদাতাদের তাঁদের কনভেনশনের প্রতিনিধিদের নির্বাচনে বা পরামর্শদানে কিছু সুযোগ দেওয়া হয়। কেউ-ই এ কথা আজ বলেন না যে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের এ ধরণের জনমত বা গণসিদ্ধান্তের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত। তবু জনমতের এই অভিব্যক্তিকে আরো বেশী নিয়ম মাফিক বা সক্রিয় করে তুললে ভুল হবে। সংস্কারবাদীদের মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস কনভেনশনের রাজনৈতিক নেতাদের রূঢ় দায়িত্ববোধ আর বাইরে ভোটদাতাদের অস্পষ্ট আশার মধ্যে যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে তা উল্টে দিলে চলবে না। রাষ্ট্রপতিত্বের প্রাইমারি সম্বন্ধে বড় কথা এই নয় যে কনভেনশনের মূল দায়িত্ব সবটা এর উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কি না। কারণ এ এক কেতাবি প্রশ্ন মাত্র, এর সম্বন্ধে বড় কথা হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে এজন্য যে প্রবল আলোড়নের সূত্রপাত হবার সম্ভাবনা থাকবে তা অপরিহার্য কিনা বা বিপুলভাবে আক্রান্ত প্রার্থীর স্নায়ুর উপর যে পীড়ন এ করবে তা বাঞ্ছনীয় কিনা।

এ ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রচারকার্য এক বিলম্বিত প্রয়াসে পরিণত হয়, প্রার্থীর আশা নিরাশার দিক নির্ণয়ে অর্থের গুরুত্ব বেশী হয়ে পড়ে। এর ফলে বেশ কিছু ভাল প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ পদ ও সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতিত্বের মোহের দ্বন্দ্বে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বর্তমানে চালু পদ্ধতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থীকেও খেয়ালপনা ও আকস্মিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, বিশেষ করে "প্রিয়সন্তানদের" খেয়ালের কাছে এবং প্রাইমারির সময়সূচীর আকস্মিকতার কাছে। সেখানে প্রথম প্রাইমারি সাধারণতঃ হয়ে থাকে সেই

নিউ হ্যাম্পশায়ারের গণতন্ত্রীরা চমৎকার সব মানুষ সন্দেহ নেই; কিন্তু এত বেশী বিজ্ঞ তাঁরা নন যে কোন রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থীকে নিজেরাই মনোনয়ন দিতে পারেন বা তাঁর প্রার্থীপদ খারিজ করতে পারেন। আড্‌লই স্টিভেন্‌সনের অকাট্য যুক্তির সঙ্গে আমি একমত যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'প্রাইমারি'র যৌক্তিকতা খুবই সন্দেহজনক। ফেব্রুয়ারী এবং জুলাই-র মধ্যে কতগুলো প্রাইমারি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে না দিয়ে যদি একেবারেই এদের বর্জন করা হয় তবে তাই বোধ হয় বেশী গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞোচিত হবে, আদিরোন্‌দাক্ ডেইলি এনটারপ্রাইজ-এর জেমস্ ল্যুব. জুনিয়ার, এর উপদেশ গ্রহণ করে যদি শক্তিমান প্রার্থীরা বর্তমানে চালু পদ্ধতি একেবারে বর্জন করেন তবে আমি সুখী হব।

পক্ষান্তরে কনভেনশন কিন্তু স্পষ্টতই জয়যুক্ত হয়েছে। আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে ফলাফল আমরা প্রত্যাশা করি তা এ পূর্ণ করেছে; যে কাজের জন্য এর সৃষ্টি, সে কাজ এ ভালভাবেই সম্পন্ন করেছে। বস্তুতঃ এর স্বপক্ষে আরো যুক্তি আছে, এ এমন কতগুলো কাজ করে যা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান করতে পারে না বা অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় সম্ভব নয়। এ যে কেবল অরাজকতাপ্রবণ বিকেন্দ্রীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করছে তাই নয়, অধ্যাপক ভি. ও. কের মতানুসারে যে যাদুদণ্ডের সাহায্যে মানুষ শাসিত হয় এ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপও এবং আবার বলছি আমেরিকাবাসীরা রাজনৈতিক যাদুর প্রয়োজনীয়তার ঊর্ধ্বে উঠবার মত আলোকপ্রাপ্ত নন। মনোনয়নমূলক কনভেনশন এক শাসনতান্ত্রিক শূন্যতাকে পূর্ণ করে; এ প্রত্যেক দলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করে ও অনুপ্রাণিত করে, যে আকর্ষণীয় গণভোটের সাহায্যে আমরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করি সে ব্যাপারে এ আমাদের উৎসাহিত করে। আমেরিকার গণতন্ত্রের এই প্রশংসনীয় পদ্ধতিকে সংস্কৃত করার চেষ্টা করার আগে আমাদের কনভেনশনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত যা শুনেছি তার চেয়ে প্রামাণ্য যুক্তি শুনতে হবে।

নির্বাচনী পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তি আরো. প্রবল, এত প্রবল যে, ১৯৫০ সনে সেনেট দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন করার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। লজ-গসেট সংশোধনী প্রস্তাবে নির্বাচনী কলেজ তুলে দেবার কথা ছিল কিন্তু নির্বাচনী ভোটকে প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রে এক বিশেষ নিয়মে ভাগ করে দেবার কথা ছিল। সেই নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি

পদপ্রার্থী প্রদত্ত গণভোটের যে শতাংশ পাবেন সেই অনুপাতে নির্বাচনী ভোট তাঁর পক্ষে দেওয়া হবে। পুরাণো যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র ও নতুন মহাদেশীয় গণতন্ত্রের এই মীমাংসাসূত্র মনঃপূত না হওয়ায় প্রাক্তন সেনেটর লেম্যান ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এক জাতীয় গণভোট প্রবর্তন করার কথা চিন্তা করেছিলেন যার ফলে অঙ্গরাষ্ট্রের সীমানা ছাপিয়ে সমস্ত যোগ্য ভোটদাতারা প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিতে পারতেন নির্বাচনী কলেজের সমস্ত আঙ্গিককে আমূল উৎসাহিত করে। প্রাক্তন পরিষদ সদস্য কাউদার্ত আবার জেলাপ্রথা (District system) চালু করার প্রথা চিন্তা করেছিলেন। এ প্রথা প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকে বেশ চালু ছিল। এই প্রথায় প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে যত সদস্য সংখ্যা থাকতো, ততগুলো নির্বাচনী জেলায় রাষ্ট্র বিভক্ত হত। প্রত্যেক জেলার ভোটাররা একজন নির্বাচক বাছাই করতেন; সমস্ত জেলার ভোটাররা মিলিত হয়ে আরো দুজন নির্বাচক বাছাই করতেন কারণ সেনেটে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই দুটো পদ আছে।

নিজেদের ব্যক্তিগত বিভেদ যতই থাক, এ সব ভদ্রলোকেরা বর্তমান পদ্ধতির সমালোচনায় একমত, তাঁরা বিশেষ করে আক্রমণ করেন সেই সব অবিচার ও অসঙ্গতির উপর যা সাধারণ টিকেট পদ্ধতির অন্তর্নিহিত স্বেচ্ছাচারিতার ফল এবং নিম্নলিখিত সমালোচনায় তাঁরা সর্বদাই মুখর।

(১) নির্বাচনী ভোট প্রায়শঃই দেশের যথার্থ ইচ্ছাকে বিকৃত করে ফেলে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনও শোচনীয় পরাজয়ের রূপ নিতে পারে।

(২) লক্ষ লক্ষ ভোট বস্তুতঃ গ্রাহ্যই করা হয় না এবং অনেক আমেরিকাবাসী, বিশেষ করে ভারমণ্ট ও জর্জিয়ার লোকেরা, অনির্দিষ্টকাল ধরে তাঁদের রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচনী ভোট বৃথাই দিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে অনেক ভোটারই ভোটকেন্দ্রে যাবার উৎসাহ বোধ করেন না।

(৩) লুসিয়াস্ উইল্মারদিঙ্গের ভাষায় এই পদ্ধতি আকস্মিকতাকে বেশী মর্যাদা দেয়। সংখ্যালঘু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব (আমরা কয়েকবারই করেছি)—এমন কি এমন এক ব্যক্তিকে যিনি গোটা-কয়েকের বেশি গণভোট পর্যন্ত অর্জন করেন নি।

(৪) বৃহৎ এবং সন্দেহজনক অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয় রাজনৈতিক দলগুলিকে এবং তার ফলে দুর্নীতি ও শঠতা প্রশ্রয় পায়।

তদুপরি এই সব রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁদের সংখ্যা ও গুরুত্বের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে।

(৫) যদিও ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো তাদের সংখ্যানুপাতে অনেক বেশী নির্বাচনী ভোটের অধিকারী তবু রাষ্ট্রপতিপদ অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নের সময় তাঁদের দাবি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়।

এই পদ্ধতির অন্যান্য বিষয়েরও তীব্র সমালোচনা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে নির্বাচকরা যদি আইনসম্মত উপায়ে বা সাংবিধানিক ক্ষমতায় স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন তবে তার ফল খুব ভীষণ হতে পারে। অন্যান্যরা বলেন কোন প্রার্থী নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে অসমর্থ হলে প্রতিনিধি পরিষদের প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রের একভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে ক্ষমতা আছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তার উপর যদি নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী নভেম্বর মাসের নির্বাচনের পর কিন্তু ডিসেম্বরের চূড়ান্ত ভোটাভুটির পূর্বে মারা যান তবে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সংবিধানে, আইনে বা প্রচলিত প্রথায় এ রকম অবস্থার কোন প্রতিবিধান নেই।

সত্য বিকৃতি, অন্যায়, ঔদাসীন্য, আকস্মিকতা, শঠতা ও গোষ্ঠীপ্রিয়তা এই সমস্ত প্রবল অভিযোগ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমাদের অনুসৃত পদ্ধতির বিরুদ্ধে করা হয়, তবু কিন্তু (১৯৫০ সনের চ্যালেঞ্জের সার্থক প্রতিরোধের পর) এই পদ্ধতি সংশোধিত না হয়েও আগামী বছরগুলোতে সার্থকভাবে কার্যকরী হয়ে থাকবে। লজ-গসেট বা কাউদার্ত প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি আইন-সভার উভয় পরিষদেই খোলাখুলিভাবে আলোচিত হয়েছে। (বলা বাহুল্য প্রস্তাবাবলীর মত যুক্তিগুলোও অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত)। দক্ষিণের অঙ্গরাষ্ট্রগুলো বাদ দিলে, অন্যান্য রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ রাজনৈতিক দলগুলোর উপর তাঁদের প্রভাব হারিয়ে ফেলবে, (বিশেষ করে গণতন্ত্রীরা, শ্রমসংস্থাসমূহ ও ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীসমূহ) যদি গণসংখ্যানুপাতে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনী ভোট প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এই আশঙ্কাই সংস্কারের বিপক্ষে প্রবলভাবে কাজ করছে। দ্বাদশ সংশোধনী পুনর্বিন্যাসের অনুকূলে রক্ষণশীল দক্ষিণের ওকালতি ও সংশোধনী অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে উত্তরের প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলোর স্থিরসংকল্পের ব্যাখ্যা এই অবস্থার মধ্যে নিহিত আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে জয়ী প্রার্থীর অনুকূলে নির্বাচনী ভোটের

ব্যবধান দক্ষিণে এই ব্যবস্থায় বিগত নির্বাচনের তুলনায় কিছুমাত্র কম হবে না—কারণ ওখানকার রাজনীতি একদলীয়, কিন্তু দুইদলে বিভক্ত উত্তরের অঙ্গরাষ্ট্র-গুলোর মধ্যে যারা বৃহত্তম সেখানে ভোটের ব্যবধান একেবারেই কমে যাবে, ফলে দক্ষিণ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উত্তরের তুলনায় সুবিধাজনকভাবে এগিয়ে যাবে। কংগ্রেসে দক্ষিণের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য সম্বন্ধে যাঁরা আওয়াজ তোলেন তাঁদের পক্ষে রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতাকেন্দ্রের এ রকম পরিবর্তন স্বভাবতই অসহনীয়। অনেকেই রাষ্ট্রপতির জাতীয় ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দাবি করেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই একটি সর্ত জুড়ে দেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদাতাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিষয়ে কংগ্রেস যেন আইন প্রণয়ন করেন। অতীতের ইতিহাস ও বর্তমানের রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা থাকলে তাঁরা বুঝতেন যে এ আশা ফলবতী হবার সম্ভাবনা নেই।

বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের বিরুদ্ধবাদী যাঁরা তাঁদের পক্ষে আছে স্বাভাবিক দূরদৃষ্টি যদিও খুব যুক্তিবাদী তাঁরা নাও হতে পারেন। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দুটো কারণের যে কোন একটা উত্থাপিত হতে পারে: প্রথমটি ভাবে এবং ভঙ্গীতে রক্ষণশীল, কারণ এ যুক্তি যাঁরা উত্থাপন করেন তাঁরা মনে করেন যে সাংবিধানিক সম্পূর্ণতা কখনোই অর্জন করা যায় না; সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। যদি আমি এঁদের যুক্তি যথার্থভাবে বুঝে থাকি তবে মনে হয় এঁরা যে বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন তা নয়, তবু এঁরা আন্তরিকভাবে মনে করেন যে পরিবর্তিত পদ্ধতি বর্তমান দোষত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারলেও অন্যধরণের দোষত্রুটির জন্ম দিতে বাধ্য এবং তার কিছু অংশ হয়ত আমাদের বর্তমান অসুবিধার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অসহনীয় হবে। তাঁরা আরো বলেন যে বর্তমান পদ্ধতির অনেক বিপদই স্বকপোলকল্পিত, অন্যের অন্যায় ঠিক অন্যায়ই নয়। প্রসঙ্গতঃ এ কথা বলা যাবে না যে ১৮৬০ বা ১৯৩৬ সনের অসঙ্গতির ফলে আমাদের রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, আমেরিকার জনসাধারণ সত্যিকারের বিকৃতি বা বিচ্যুতির মুখোমুখি হলে তা স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ নয় এ কথা অনস্বীকার্য। ১৮২৪ বা ১৮৭৬ সনে, এমন কি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দেও এমন কোন তর্কাতীত ঘটনার উল্লেখ করা যাবে না যার ফলে একজন প্রার্থী গণভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারেন নি। একজন একক নির্বাচক

তাঁর তথাকথিত স্বাধীনতা ভোটের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্‌ রাসেল লাওয়েলকে তাই করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু দশহাজারে এক ক্ষেত্রেও তাতে বিশেষ সুবিধা হবার সম্ভাবনা নেই। গত দেড়শ বছরে মাত্র দুইবার একজন নির্বাচক প্রতিশ্রুত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে অন্য প্রার্থীকে দিয়েছিলেন—নিউ হ্যাম্পসায়ারের উইলিয়াম প্লামার ১৮২০ সনে জেম্‌স্‌ মন্‌রোর বদলে জন কুইন্সি এ্যাডাম্‌স্‌কে ভোট দিয়েছিলেন এবং আলবামার ডব্লু. এফ. টার্ণার ১৯৫৬ সনে আদলাই স্টিভেনসনের বদলে বিচারক ওয়াল্টার. বি. জোনসকে ভোট দিয়েছিলেন এবং এক নির্দোষ বেয়াডাপনা ছাড়া আর বিশেষ কোন তারতম্য এই দুই বারে ঘটে নি। সেনেটর লজের মতে বর্তমান ব্যবস্থায় ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো প্রার্থী নির্বাচনে কোন সুযোগ পায় না, কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেই যে আমাদের রাজনৈতিক লোকের মানস পরিবর্তিত হবে তাতো মনে হয় না। বড় বড় অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর উপর অনেক কারণেই আমরা নির্ভরশীল, তার মধ্যে একটা বড় কারণ এই যে ছোট রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় তাঁরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্বের যোগ্য প্রতিভাবান প্রার্থী বেশী পরিমাণে যোগান দিতে পারে।

বর্তমান পদ্ধতির উপর সর্বাত্মক আক্রমণ এ ভাবেই চলে আসছে—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমাদের বর্তমান পদ্ধতির দোষত্রুটিতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত ভদ্রলোকেরা একটি সহজ ও যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর, নতুন নতুন সমস্যা তাতে যতই সৃষ্টি হোক না কেন। বর্তমান পদ্ধতির স্বপক্ষে যাঁরা তাঁরা বলেন যে পরিবর্তনবাদীরা রাষ্ট্রের কাঠামো খুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন—সব সময়েই তা নিন্দনীয় বিশেষ করে এখন যখন আমরা আশঙ্কায় রুদ্ধনিশ্বাস হয়ে আছি।

পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুক্তি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত, অন্ততঃপক্ষে, সমসাময়িক দলীয়, রাজনীতিতে। যাঁরা এ মত পোষণ করেন তাঁরা খোলাখুলিভাবেই বলেন যে বর্তমানে চালু নির্বাচন পদ্ধতি সহরের ভোট-দাতাদের অনুকূলে বিশেষভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু যেহেতু প্রতিনিধি পরিষদে ও সেনেটে গ্রাম্য স্বার্থ সংখ্যাতিরিক্ত ভাবে সুরক্ষিত, সুতরাং এই অসঙ্গতির প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য। এই সব প্রস্তাবানুসারে প্রত্যেক অঙ্গরাষ্ট্রে নির্বাচকদের সাধারণ টিকেট পদ্ধতির যদি পরিবর্তন করা হয় তবে আমাদের

সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় প্রতিনিধিত্বের সমতা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং এখনকার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হয়ে উঠবে আমাদের শিল্প সভ্যতার নানা সমস্যার সমাধান। কংগ্রেসের মত রাষ্ট্রপতিত্ব ও প্রত্যেক দলের রক্ষণশীলদের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে প্রগতিবাদীদের নয়। যদি নির্বাচনী এলাকা এ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে রাষ্ট্রপতিত্বের মহান গণতান্ত্রিক রূপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই ভদ্রলোকেরা কিন্তু নির্বাচনী পদ্ধতি সম্বন্ধে ততটা কৌতূহলী নন যতটা বিশেষ মতাবলম্বী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধে। তাঁরা জোরের সঙ্গে বলেন যে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা অন্ততঃ একটি শহরে পদাধিকারের দাবি রাখে যা জাতীয় স্তরে সক্রিয় ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থ।

এর প্রত্যেকটা যুক্তিরই স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা সম্ভব, এখনকার মত অবশ্য এ সব তর্ক স্থগিত রেখে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিকে সহ্য করে যাওয়াই ভাল। আমি নির্বাচনী কলেজ তুলে দেওয়ার পক্ষে। যদি নির্বাচকরা পুতুল হয়ে থাকেন, তবে তাঁরা অপদার্থ; আর যদি তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে সমর্থ হন (যা কিছু দক্ষিণী অঙ্গরাষ্ট্র তাঁদের দিয়ে করাতে চেয়েছিলেন) তবে তাঁরা ১৭৫ বছরের পুরাণো ভাবধারা আঁকড়ে ধরে আছেন মনে করতে হবে।

নভেম্বর মাসের ৮ই তারিখ হতে ডিসেম্বর মাসের ১৯শে তারিখ পর্যন্ত সময়টুকু খালি থাকার কোনও কারণ নেই। জয়ী প্রার্থীর রাজনৈতিক দলের হাতে প্রার্থীর এই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হলে অন্য একজন প্রার্থী নির্বাচিত করার ক্ষমতা দেওয়া অসম্ভব—এমন কি তাঁর নির্বাচন সহযোগীকে পর্যন্ত নয়। ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ৬ই জানুয়ারীর মধ্যে যে সব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে সেগুলো অগ্রাহ্য করা আরো অসম্ভব। বিংশতম সংশোধনীর তৃতীয় ও চতুর্থ ধারায় নানা কঠিন অবস্থার উল্লেখ আছে কিন্তু কংগ্রেস আইন করে সে সমস্ত অবস্থার প্রতিবিধান করার খোলা আমন্ত্রণ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করে নি। প্রতিনিধি পরিষদ্ ও সেনেট একত্রিত হয়ে (প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট) কেন অমীমাংসিত নির্বাচনকে নিয়মানুগ করতে অনিচ্ছুক সে সম্বন্ধে কেবল একটা যুক্তি আমি শুনেছি ছোট ছোট অঙ্গরাষ্ট্রগুলো এ অবস্থা মানবে না। এটা অবশ্য কোন যুক্তি নয়, এ হচ্ছে অক্ষমতার দীর্ঘশ্বাস।

আমরা কেন মোটামুটি কার্যকরী একটা জোড়াতালি দেওয়া পদ্ধতি পরিবর্তন করে একটা নিটোল পদ্ধতি (যা আমাদের মুখের উপরই কোনদিন

ভেঙ্গে পড়তে পারে) গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবো তার অনেক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। বর্তমানে চালু পদ্ধতির স্বপক্ষে অনেক যুক্তি বেশ বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীপ্রসূত, এর বিরুদ্ধে আনীত অধিকাংশ যুক্তি কেতাবী। নির্বাচনী পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনে রাষ্ট্রপতিত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। এ আশ্বাস যতদিন না পাচ্ছি ততদিন আমরা বরং ঐতিহ্য ও অনুসৃত পদ্ধতি মেনে চলব।

পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হল, এবার ফল বিশ্লেষণ করা হবে। এই পদ্ধতি কি ধরণের লোককে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি করে তোলে? তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি যে সব রকম মানুষই রাষ্ট্রপতি হতে পারেন—বিংশশতাব্দীর এমন সব মানুষ যাঁরা একে অপরের থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র: থিয়োডর রুজভেল্ট ও কেলভিন কুলিজ, হার্বার্ট হুভার ও হ্যারি ট্রুম্যান, উড্রু উইলসন ও ওয়ারেন হার্ডিঙ্গ, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার। তা সত্ত্বেও আমরা এঁদের আপাত পার্থক্য সম্বন্ধে বেশী সচেতন হ'ব না কারণ এঁদের মধ্যে ঐক্যসূত্রও ছিল। আমেরিকার জনসাধারণ রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থীর কাছ থেকে যে সব যোগ্যতা প্রত্যাশা করেন, এঁদের সবাইকে তা পূরণ করতে হয়েছে। সব রকম দাবিই কিছু ভদ্র ও যুক্তিসঙ্গত নয়। তাহলেও এগুলো আমাদের নির্বাচনী পদ্ধতির এক প্রবল অংশ। এই অধ্যায়ের শেষে মনোনয়ন ও নির্বাচন সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত প্রশ্ন আমি তুলেছি সেই প্রশ্নই আমার মনে আসছে: কী ধরণের মানুষ আমেরিকার রাষ্ট্রপতিপদ-প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হবেন? কী ধরণের মানুষ কোনদিনই মনোনীত হবেন না? অন্যভাবে, রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থীর পৃষ্ঠপোষকতা কত ব্যাপক হলে সাফল্য সম্ভব? যদি তাঁকে একজন আধুনিক ও সক্রিয় রাষ্ট্রপতি হতে হয় তবে তাঁর কী কী যোগ্যতা থাকা উচিত তা আমি আগেই বলেছি। এখন আমি আলোচনা করব সেই সব গুণাবলীর যা তাঁর থাকতেই হবে, যা অনুশীলনে করায়ত্ত হবার সম্ভাবনা নেই এবং যা না থাকলে রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করাই বাতুলতা। যে সমস্ত শারীরিক, রাজনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ত্রুটি মানুষকে মহৎ ও প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থী হিসাবে অযোগ্য করে তোলে সে সম্বন্ধেও এ আলোচনা দৃষ্টি রাখবে।

রাষ্ট্রপতিত্ব লাভেচ্ছুদের মধ্যে কে আশা পোষণ করতে পারেন আর কেই

বা পারেন না সে সম্বন্ধে একটা তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে যদিও তা খুব বিজ্ঞানসম্মত না হতেও পারে। কিন্তু এ তালিকা তথ্যপূর্ণ হবে এবং যদি আমেরিকার ইতিহাস ও আমেরিকাবাসীদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আদৌ সঠিক হয়ে থাকে তবে বলতে পারি যে রাষ্ট্রপতিপদলাভেচ্ছুকে এ সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ঃ

সংবিধান অনুসারে তাঁকে ঃ

অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হতে হবে,

জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হতে হবে,

১৪ বছর আমেরিকায় বসবাস করতে হবে—এ কথাটার মানে যাই হোক,

অলিখিত আইন অনুসারে তাঁকে হতে হবে ঃ

একজন পুরুষ মানুষ,

শ্বেতকায়,

একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী,

তাঁকে প্রায় নিশ্চিতভাবে হতে হবে ঃ

উত্তরের বা পশ্চিমের অধিবাসী,

বয়স পঁয়ষট্টি বছরের কম,

জাতিতে উত্তর ইউরোপীয়,

রাজনীতি ও জনসেবায় অভিজ্ঞ,

স্বাস্থ্যবান।

তাঁর হলে ভাল হয় ঃ

কেন্টাকি থেকে বড় কোন অঙ্গরাষ্ট্রের অধিবাসী,

পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী বয়স,

বিবাহিত গৃহস্থ,

ইংরাজ বংশজাত,

প্রটেষ্ট্যাণ্ট,

যুদ্ধপ্রত্যাগত,

আইনজীবী,

রাজ্যপাল,

লিজিওনেয়ার,

রাজমিস্ত্রি—সৈনিক—রোটারিয়ান, সব একসঙ্গে হলে ভাল,
ছোট সহরের ছেলে,
আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানুষ বিশেষ করে যদি প্রজাতন্ত্রী হন,
আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ,
একজন সংস্কৃতিবান অমুন্নাসিক ভদ্রলোক যিনি বেসবল খেলেন,
রোমহর্ষক বই পড়তে ভালবাসেন, মাছ ধরেন, কনসার্টে যান,
পিকনিক করেন, সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করেন।

তিনি নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হ'ন বা না হ'ন এসে যায় না :

কলেজ গ্র্যাজুয়েট,
ছোট ব্যবসায়ী,
কংগ্রেস সদস্য,
কেবিনেট সদস্য,
রাষ্ট্রপতিত্বের নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী, যদি পরাজয়ের মধ্যে
সহাস্য যোদ্ধার ভূমিকা পরিগ্রহ করতে পারেন।
তাঁর এ সমস্ত ক্রটিবিচ্যুতি না থাকাই উচিত যে তিনি
কেণ্টাকি থেকেও ছোট অঙ্গরাষ্ট্রের অধিবাসী,
বিবাহ-বিচ্ছিন্ন,
অবিবাহিত,
ক্যাথলিক,
প্রাক্তন ক্যাথলিক,
কর্পোরেশন প্রেসিডেণ্ট,
রাষ্ট্রপতিত্ব-দ্বন্দ্বে দুইবার পরাজিত প্রার্থী,
বুদ্ধিজীবী—এমন কি রাজনৈতিক যুদ্ধে দীক্ষিত হলেও,
পেশাদার সৈনিক,
পেশাদার রাজনীতিবিদ,
বিরাট ধনী,
এবং এ হলে কিছুতেই চলবে না যে তিনি
একজন দক্ষিণী (টেক্সাস দক্ষিণে না পশ্চিমে
তা অবশ্য আমি জানি না)

জাতে পোলিশ, ইতালীয় বা স্লাভ,

শ্রমিকনেতা,

খৃষ্টীয় মিনিষ্টার,

অলিখিত বিধানবলে তিনি

নিগ্রো,

ইহুদি,

প্রাচ্যবাসী,

স্ত্রীলোক,

নাস্তিক,

বা বিকলাঙ্গ হতে পারবেন না।

সংবিধান বলে হতে পারবেন না:

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি যিনি দেড়টি কার্যকালের বেশী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,

পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়স,

নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত পুরুষ,

বিদেশাগত।

এই তালিকা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ, আমি ইচ্ছা করেই কতগুলো অদৃশ্য গুণাবলীর বিচার করি নি—কৃতিত্ব, বন্ধুপ্রীতি, নৈতিক উচ্চাদর্শ, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মীতা, বুদ্ধি, আচারে আচরণে নম্রতা, দেশের সমসাময়িক ভাবধারার সঙ্গে একাত্মবোধ, বিশ্বস্তভাবে সেবা করার ইচ্ছা (এবং তার আগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা) জয়ীর মত ব্যবহার—এ সমস্ত গুণ থাকলেই সাধারণভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক প্রার্থীরা সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন। আমি এখানে সেই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ গুণাবলীর উল্লেখ করেছি যার অধিকারীদের সংখ্যা অনিবার্যভাবে ৭৫ থেকে ১০০ জন আমেরিকানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষের মধ্যে একজনেরও কম।

দ্বিতীয়তঃ চতুর্থ ও ষষ্ঠ পর্যায়ে যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে একজন প্রার্থীর অন্যান্য যোগ্যতা খুব বেশী হলে তার আপেক্ষিক অপ্রতুলতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পক্ষে অন্তরায় হয়ে ওঠে না, বিশেষ করে যদি অদৃশ্য গুণাবলী তাঁর থেকে থাকে। ওয়েণ্ডেল উইল কি ছিলেন একজন কর্পোরেশন প্রেসিডেন্ট, আদ্‌লাই স্টিভেন্সন ছিলেন বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, উইলিয়াম জেনিংস ব্রিয়ান দুবার

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়েছিলেন, আল স্মিথ ছিলেন ক্যাথলিক তবু কিন্তু গোঁড়া ব্যক্তিরা তাঁদের মনোনয়ন দিয়েছিলেন এই আশায় যে তাঁরা জয়যুক্ত হবেন। তাঁরা কেউই জয়ী হন নি এবং আমাদের প্রায় নিশ্চিত ধারণা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ অযোগ্যতার জন্য বেশ কিছু ভোট হারিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই তালিকার যোগ বিয়োগ নির্বাচনেচ্ছু দুই প্রার্থীর উপরই বেশী প্রযোজ্য, মনোনয়ন প্রার্থীদের উপর ততটা নয়।

এগুলো আবার উপরাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থীদের বেলায় ততটা জোরের সঙ্গে খাটবে না। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হুইগরা জ্যাকারি টেলরকে মনোনীত করবার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোন দক্ষিণী নাগরিক কোন বড় দলের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রপতিত্বের মনোনয়ন পান নি; কিন্তু ১৯৫২ সনে আলবামার জন স্পার্কম্যানের মনোনয়ন প্রমাণ করে যে গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি হিসাবে যাকে মনোনয়ন দিতে ইচ্ছুক না তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দিতে অনিচ্ছুক হবেন না। প্রজাতন্ত্রীরাও তাই করবে; ১৯৫২ সনে যুবক রিচার্ড নিক্সনকে রাষ্ট্রপতিত্বের মনোনয়ন দিতে তারা সাহসী হন নি; কিন্তু উপরাষ্ট্রপতিপদের মনোনয়ন দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমি অবশ্য এ কথা যোগ করতে চাই যে এই তালিকার প্রত্যেক যোগ্যতা, বিশেষ করে মাঝের দিকের গুলো, আগামী ২৫ বছরের বেশী সবসময়েই প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যদিও আমাদের অনেক রুচি ও প্রত্যাশা (আমাদের কুসংস্কারও) বেশ অনড়, অনেকগুলো আবার পরিবর্তনশীল; সামাজিক প্রগতি ও নতুন ভাবধারার চাপে অতীতে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। যদি ইতালীয় ও পোলিশ বংশোদ্ভূতদের মনোনীত হবার সম্ভাবনা আজ না থেকে থাকে, খৃষ্টাব্দ ২০০০ এ তাদের মনোনীত হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিকদের মনোনীত হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রত্যেক নতুন লোক গণনার ফলে তাঁরা ক্রমশঃই বেশী যোগ্য হয়ে উঠছেন। বস্তুতঃপক্ষে আজ রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে গণতন্ত্রী দল, যদি কোন সর্বতোভাবে যোগ্য প্রার্থীকে ক্যাথলিক এই অজুহাতে মনোনয়ন না দেয় তবে নিজ দলেরই ক্ষতি করবে, তুলনায় যে সংস্কার ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে তাকে অগ্রাহ্য করলে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা

নেই। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া হয় যে দুইজনের যোগ্যতা অন্যান্য বিষয় বিচার করলে একেবারে সমান, তবে প্রোটেষ্টাণ্টেরই মনোনীত ও নির্বাচিত হবার সমধিক সম্ভাবনা।

পরিশেষে দুই রাজনৈতিকদলের বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। গণতন্ত্রীরা এখন আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, প্রজাতন্ত্রীরা সংখ্যালঘু—এই প্রতিষ্ঠিত সত্য দেশের শক্ত লোকেরা বেশ বুঝতে পারছেন। ১৮৯৬ সন থেকে ১৯৩৪ সন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রীদের যে প্রাধান্য ছিল আজ গণতন্ত্রীরা সেই প্রাধান্য ভোগ করছে। আর সব দিক যদি ঠিক থাকে (প্রায়ই থাকে) তবে গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতিত্বের দ্বন্দ্বে যোগদান করলেই জয়ী হয়। সুতরাং তাঁদের আসল সমস্যা হচ্ছে এমন একজন প্রার্থীকে মনোনীত করা যিনি দলের ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে প্ররোচিত করতে পারবেন। এমন একজন লোক খুঁজে বার করতে হবে যিনি ভাসমান ভোট সংগ্রহ করতে পারবেন, যিনি প্রজাতন্ত্রীদলের অস্থিরমতিদের প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশী দরকার এমন একজনকে খুঁজে বার করা যিনি এই অত্যাশ্চর্য কোয়ালিসনের ঝগড়াটে উপদলগুলোকে সংযত রাখতে পারবেন। তাঁকে ইউনাইটেড্ অটোমোবাইল ওয়ার্কারস, ইউনাইটেড্ ডটারস অফ দি কনফেডারেসি, বোষ্টনের আইরিশ, ব্রুকলিনের ইহুদি, অধ্যাপক ও বৃত্তিজীবী, কৃষক ও কারখানার শ্রমিক, জর্জিয়ার শ্বেত প্রভুত্ববাদী ও হারলেমের নিগ্রোদের আপোষ মানাতে হবে।

গণতন্ত্রীদের জাতীয় কনভেনশনে এক অলিখিত আইন চালু আছে। তার ফলে প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতিপদের জন্য এমন এক প্রার্থীকে মনোনীত করতে বাধ্য হন যিনি (১) দলের অনুগত কর্মী, বহু যুদ্ধের নায়ক। (২) কোয়ালিসনের কোন বড় উপদলের সঙ্গে খুব স্পষ্টভাবে সংযুক্ত থাকেন না। (৩) প্রকাশ্যে কোন উপদলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন। যদি কেউ এই আইনের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে ১৯৫২ সনে অনিচ্ছুক আড্লাই ষ্টিভেনসনের মনোনয়নের ব্যাখ্যা তিনি করুন। যদি মিজৌরিতে তাঁর জন্ম হ'ত, বিবাহ বিচ্ছেদ না করতে হ'ত তবে আধুনিক গণতন্ত্রীদলের প্রায় আদর্শপ্রার্থী তিনি হতে পারতেন।

তিনি প্রজাতন্ত্রীদলের একেবারে এক আদর্শপ্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন—গোলমাল বাধল এইখানেই। তা আবার এমন এক বছরে যখন

সাম্যবাদ, দুর্নীতি ও কোরিয়ার আশীর্বাদে অন্যান্য ব্যাপারগুলোও আর সমান ছিল না। প্রজাতন্ত্রীদলের বিশেষ সমস্যা হচ্ছে একজন প্রার্থীকে মনোনীত করা যিনি দলের ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে সক্ষম ও কয়েক লক্ষ ভোটদাতা যাঁরা স্বাভাবিকভাবে গণতন্ত্রীদের ভোট দিয়ে থাকেন, তাঁদের তাঁর পক্ষে ভোট দিতে অথবা ভোট একেবারেই না দিতে প্ররোচিত করতে সক্ষম। আইজেনহাওয়ার এই হিসাবে একেবারে স্বর্গে তৈরী প্রার্থী বিশেষ এবং আমি সব সময়েই মনে করেছি যে ১৯৫২ সনে চিকাগো কনভেনশনে আইজেনহাওয়ার ও ট্যাফ্‌ট এর মধ্যেকার বর্বর সংঘর্ষ কিছুটা অবাস্তব ছিল। সেনেটর ট্যাফট্‌ নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন—আমি বলি যে তিনি যদি প্রজাতন্ত্রী প্রার্থী না হয়ে গণতন্ত্রী প্রার্থী হতেন, তবে জীবনে অন্ততঃ দু'বার "অন্য দলের" প্রার্থী হতে পারতেন। তাঁর দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁকে দু'বারের বেশী অনিবার্য ভাবে হেরে যেতে হয়েছিল কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে তাঁর দল "স্বাধীন ভোটদাতাদের" বশে আনতে সক্ষম এ রকম একজন প্রজাতন্ত্রীকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাতে বাধ্য হয়েছিল। যতদিন রাজনীতির জোয়ার বর্তমান খাতে বইতে থাকবে, ততদিন প্রজাতন্ত্রীরা বুকানন থেকে রুজভেল্ট পর্যন্ত গণতন্ত্রীদের মত আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করবে যদি এমন একজন দলীয় প্রার্থীকে মনোনীত করে যিনি দলের বিশ্বস্তদের বাদ দিলে অন্যদের উপর কোন প্রভাব খাটাতে পারবেন না। যে ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রীদের মনোনয়ন লাভ করতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক তাঁকে আধুনিক প্রজাতন্ত্রী হতে হবে।

আইন না হলেও রাষ্ট্রপতিত্বের রাজনীতিতে এগুলো হচ্ছে আমেরিকার স্বতঃসিদ্ধ বিশেষ। আমি মনে করি না এ সব অবহেলাভরে অগ্রাহ্য করা আগামী দিনে সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি, অবসর গ্রহণ ও মৃত্যু

নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য ক্ষমতায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। ইচ্ছা করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্মতি দিলে তিনি আট বৎসর পর্যন্ত শাসন করতে পারেন। আমরা অবশ্য তাঁকে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত নাও করতে পারি; কিন্তু তার দল তাঁকে পুনর্বার মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করতে পারে না। ১৯১২ সনে ট্যাফ্‌ট্, ১৯৩২ এ হুভার ও ১৯৪৮এ ট্রুম্যান দেখিয়ে গেছেন যে ফলাফল সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া রাষ্ট্রপতিরাও দ্বিতীয়বার মনোনয়ন দাবি করার ক্ষমতা রাখেন। আট বছরের বেশী রাজত্ব অত্যন্ত জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতির পক্ষেও আজকাল আর সম্ভব নয়; কিন্তু এ বিষয়ে পরে কয়েক পাতায় কিছু লিখব।

একটি পূর্ণ কার্যকালের সম্ভাবনা রাষ্ট্রপতিকে আশ্বস্ত করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন করবে না। জীবনে কিছুই একেবারে নিশ্চিত নয় এবং প্রত্যেক পদাধিকারীই জানেন যে অন্ততঃ চার ভাবে তাঁর কার্যকাল সংক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সবগুলোর সম্বন্ধেই সংবিধানে প্রকাশ্য আলোচনা রয়েছে।

প্রথমতঃ প্রতিনিধি পরিষদ রাষ্ট্রদ্রোহ, উৎকোচ গ্রহণ বা অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের অপরাধ এবং অশালীন আচরণের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করলে সেনেট

উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে। সংবিধানের এই সুতীব্র দাওয়াই সম্বন্ধে যা বলার আগেই বলেছি। আমি নতুন ক'রে এই মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, অর্থাৎ পদাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার দুই কক্ষের মিলিত কোন অনুসন্ধিৎসা নয়; এ হচ্ছে এক ন্যায় বিচারের প্রক্রিয়া অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। এ রকম দোষত্রুটির জন্য রাষ্ট্রপতির বিচার যার পৌরহিত্য করেন মুখ্য বিচারপতি, যেখানে অভিযোগ উত্থাপন করেন প্রতিনিধি পরিষদ ও জুরীর ভূমিকা পরিগ্রহ করেন সেনেট। যদিও আগে আমি "পরবর্তী রাষ্ট্রপতি যিনি অভিযুক্ত হবেন" বলে কিছু লিখেছি, আমি মনে করি না এ রকম কোন বিচার আমরা আর দেখতে পাব।

দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু—সম্ভবতঃ রাষ্ট্রপতিদের বেলায় তাড়াতাড়ি আসে। আমাদের অনেক রাজনৈতিক হিসাব (যেমন ধরুন উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা) অন্যভাবে করা দরকার হয়ে পড়বে যখন আমরা কষে দেখব যে উনত্রিশ জন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির মধ্যে সাতজনই, অর্থাৎ চারজনে একজন, কার্যকালের মধ্যেই মারা গেছেন। যাঁরা বিস্তৃত তথ্য চান নিম্নলিখিত সূচী তাঁদের উপকারে লাগবে।

মৃত রাষ্ট্রপতি	মৃত্যু তারিখ	মৃত্যুর কারণ	অপূর্ণ কার্যকাল
উইলিয়াম. এইচ. হ্যারিসন	৪ এপ্রিল ১৮৪১	নিউমোনিয়া	৩ বছর ১১ মাস
জ্যাকারি টেলর	৯ জুলাই ১৮৫০	কলেরা মরবাস (দুরারোগ্য অজীর্ণতা)	২ বছর ৭ মাস ২৩ দিন
এব্রাহাম লিঙ্কন	১৫ এপ্রিল ১৮৬৫	হত্যা (৯ ঘণ্টা বেঁচেছিলেন)	৩ বছর ১০ মাস ১৭ দিন
জেমস. এ. গারফিল্ড	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮১	হত্যা (৮০ দিন বেঁচেছিলেন)	৩ বছর ৫ মাস ১৩ দিন
উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লে	১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০১	হত্যা (৮ দিন বেঁচেছিলেন)	৩ বছর ৫ মাস ১৮ দিন
ওয়ারেণ জি. হার্ডিঙ্গ	২ আগষ্ট ১৯২৩	ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া এমবলিজম্	১ বছর ৭ মাস ২ দিন
ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট	১২ এপ্রিল ১৯৪৫	মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ	৩ বছর ৯ মাস ৮ দিন

যাঁরা মনে করেন আমাদের সংবিধানের সবই লিখিত এবং কিছুই অলিখিত নয় তাঁরা এ রকম আকস্মিক মৃত্যুর পর কি ঘটেছিল তা প্রনিধান করলে ভাল করবেন। কারণ প্রথমবার যা ঘটেছিল ও পরে যা ঘটে যাচ্ছে তার সবটাই সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার এক উপধারার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের (Article II, Section 1, Clause 6) পরিপন্থী ও সংবিধান প্রণেতাগণের প্রত্যাশা বহির্ভূত। সাংবিধানিক ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে সংবিধান প্রণেতাগণ যখন পদাধিকার খালি হয়ে পড়বে তখন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি না হয়ে কেবল রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পরিগ্রহ করবেন এ রকমই চেয়েছিলেন। তবু যখন পদাধিকারটি প্রথমবার খালি হ'ল তখন উপরাষ্ট্রপতি জন টাইলর শক্ত মানুষ রাষ্ট্রসচিব ডানিয়েল ওয়েব্‌স্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনরকম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন না হয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব, পারিশ্রমিক, আবাসস্থল, সম্মান ও পদবী গ্রহণ করলেন। আটজন সেনেট সদস্য, কয়েকজন সাংবাদিক ও ঋজু মানুষ জন কুইন্সি এডাম্‌স বাদে কেউই টাইলর যখন বললেন যে "তিনি রাষ্ট্রপতিত্বে আসীন হলেন" তখন প্রতিবাদের সাহস রাখেন নি।

জ্যাকারি টেলর এর মৃত্যুর পর যখন দ্বিতীয়বার পদাধিকারটি খালি হল তখন ঐ নড়বড়ে পূর্ব-সিদ্ধান্তটি পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল এবং আর কেউই এর পর আর প্রতিবাদের ঝড় তুলতে সাহসী হয় নি। ক্যাবিনেট টেলরের মৃত্যুর খবর সরকারীভাবে জানালেন উপরাষ্ট্রপতি ফিলামারকে "আমেরিকার রাষ্ট্রপতি" বলে সম্বোধন করে এবং ফিলমোরও পরের দিন কংগ্রেসের যুগ্ম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ করলেন। এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনকে কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদ এক প্রস্তাবনায় "আমেরিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকারী এক কার্যাধ্যক্ষ"—বলে অভিহিত করেছিলেন, পরে আবার তাঁকেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে অভিযুক্ত করে (Impeachment) অন্যান্য সম্মান দেখিয়েছিলেন।

শেষ চার উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন কোন প্রতিবাদ বা জিজ্ঞাসা বাদেই।

এঁদের মধ্যে একজন কালভিন কুলিজ আমেরিকার রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে তাঁর বাবার গৃহেই। তাঁর বাবা ছিলেন প্লিমাউথের এক বিশিষ্ট নোটারি। আবেগপ্রবণ জাতির প্রচুর খোরাক ছিল এই ঘটনায়—এক বৃদ্ধ লাঠির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মরচে পড়া

কেরোসিন বাতির সামনে—কিন্তু কুলিজ দুই সপ্তাহ পরে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারপতির কাছে ওয়াশিংটনে শপথ গ্রহণ করে পূর্বেকার অনুষ্ঠানের বিধিবদ্ধতা সম্বন্ধে নিজের সন্দেহের অপনোদন করেছিলেন। এ্যাটর্নি জেনারেল ঐ বিচারপতিকে এই খবর গোপন রাখার জন্য শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন; ১৯৩২ সনে যখন অভিজ্ঞ কুলিজের দুর্ভাবনা করার কিছু ছিল না তখন এ খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কোন রাষ্ট্রপতিই তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় ইস্তাফা দিয়ে রাষ্ট্রপতিত্বের গদি ছেড়ে দেন নি যদিও উড্রু উইলসন গভীরভাবে এ রকম কিছু করার কথা চিন্তা করেছিলেন। (আমি অবশ্য অনুমান করতে পারি যে যাদের গায়ের চামড়া ছয় ইঞ্চির কম মোটা ছিল তাঁরা অন্ততঃ একবার পদত্যাগের কথা ভেবেছিলেন)। ১৯১৬ সনের নির্বাচনের পূর্বে উইলসন এক চিঠিতে রাষ্ট্রসচিব ল্যানসিঙ্গকে লিখেছিলেন যে যদি তিনি চার্লস ইভান্স হিউয়েসের কাছে হেরে যান তবে তিনি হিউয়েসকে ল্যানসিঙ্গের পদে অধিষ্ঠিত করবেন ও তারপর উপরাষ্ট্রপতি মার্শালের সঙ্গে একযোগে হঠাৎ পদত্যাগ করবেন। মার্শালের পরামর্শ অবশ্য তিনি এ ব্যাপার নেন নি। তখনকার দিনে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন অনুসারে হিউয়েস তাঁর কার্যকাল আরম্ভ হবার চারমাস আগেই এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি হতেন এবং এইভাবে উইলসনের ভাষায় দেশকে এমন এক রাষ্ট্রপতির হাত থেকে মুক্ত করতেন যাঁর প্রতি দেশের লোকের নৈতিক সমর্থন ছিল না, এ রকম সমর্থন অন্যদেশীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল বলে উইলসন মনে করতেন।

এই কথিকার দুর্ভাগ্যবশতঃ উইলসন পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন, সুতরাং, আমরা কখনই জানতে পারব না তিনি সত্যি সত্যি এ রকম কিছু করতেন কিনা। ১৯২০ সনের নির্বাচনের দুইদিন পরে উইলিয়াম জেনিঙ্গস ব্রিয়ান প্রকাশ্যে উইলসনকে আহ্বান করেছিলেন জয়ী হার্ডিঙ্গকে রাষ্ট্রসচিব পদে অধিষ্ঠিত করতে এবং তারপর ১৯১৬ সনে যা করবেন বলেছিলেন সাহসের সঙ্গে তাই করতে। ব্রিয়ানের প্রস্তাবের সাড়ায় শীতল নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছু শোনা যায় নি।

১৯৪৬ সনে কংগ্রেসের নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীরা যখন জয়লাভ করল তখন সেনেট সদস্য ফুলব্রাইট ভাল মানুষের মত কিন্তু বিশেষ চিন্তা-ভাবনা না করেই

এই পরামর্শ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে। আইজেনহাওয়ারের দ্বিতীয় কার্যকালেও এ রকম হাল্কাভাবে ভালমানুষি—দেখান প্রস্তাব মাঝে মাঝে করা হ'ত। রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করার যৌক্তিকতা বুঝতে আমি অক্ষম, কারণ জনসাধারণের কাছ থেকে যে পবিত্র নির্দেশ রাষ্ট্রপতি লাভ করেন তার যথার্থতা এ রকম আবেদনকারীরা বুঝতে অনিচ্ছুক। আমরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করি এই আশায় যে মৃত্যু বা অক্ষমতাজনিত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হলে তিনি পূর্ণ কার্যকাল পর্যন্ত কাজ করে যাবেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে রাষ্ট্রপতিত্বে পদারূঢ় হওয়া অপেক্ষা দ্রুত উপনির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদ লাভ করা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রপতিত্ব এক "প্রজাতন্ত্রী রাজতন্ত্র" বিশেষ—যদি গদি ত্যাগের প্রশ্নই উঠে এর অধিকারী বরং পথ থেকে সরে দাঁড়াবেন কিন্তু পদত্যাগ করবেন না। সে যাই হোক না কেন সংবিধানে পদত্যাগের কথা আছে, ১৭৯২ সনের আইনে এর উল্লেখ আছে। হাতে লিখে সই করে রাষ্ট্রসচিবের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে একজন রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারেন। জন. সি. কালহাউন নামে এক উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল শেষ হবার দুমাস আগে পদত্যাগ করেছিলেন। সেনেট তাঁকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করতে বলেছিল, তিনিও আনন্দের সঙ্গে করেছিলেন।

সংবিধানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে বলা হয়েছে যে কার্যালয়ের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতিকে গদি ছাড়তে হতে পারে। সংশ্লিষ্ট উপধারার আর এক জায়গায় "অসামর্থ্য" কথাটার উল্লেখ আছে এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে এ দুটো শব্দ পরস্পরের বিকল্প। জন ডিকনসন তাঁর সহযোগীদের কনভেনশন গৃহে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অসামর্থ্য কথাটার মানে কি এবং কেই বা সিদ্ধান্ত করবেন রাষ্ট্রপতি অসমর্থ কিনা, কিন্তু কেহই এ সম্বন্ধে কোন অনুমান করতে সাহসী হন নি। সংবিধান প্রণেতাগণের মনোভাব কি ছিল তা আমরা কখনই জানতে পারব না। এ ব্যাপারে আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিন্তু অতীতে এ রকম চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আমেরিকার ইতিহাসে দুইবার রাষ্ট্রপতি সন্দেহাতীতভাবে বেশ কিছুদিনের জন্য পদাধিকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অসমর্থ ছিলেন। যেদিন গারফিল্ডকে গুলিবিদ্ধ করা হয় সেদিন থেকে যেদিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, এই এগার

মাস তিনি জাতির কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে পারেন নি কেবল একটি বহিষ্কারের আদেশ পত্রে সই করেছিলেন মাত্র। শেষের কয়েক সপ্তাহে আহত দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অধোগতি হয়েছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উইলসন ভেঙ্গে পড়ার পর (কয়েকদিন পরে তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছিল) থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনিও এক অথর্ব রাষ্ট্রপতি হয়ে রয়েছিলেন। কংগ্রেসের খসড়া আইনে পরিণত হত কারণ তিনি সই করতেন না, আট মাসের মত কোন কেবিনেট বৈঠক তিনি ডাকেন নি, চার মাসের মধ্যে তিনি জানতেও পারেন নি যে তাঁর অনুপস্থিতিতেই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে; পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় সেনেট কমিটি খবর চেয়ে পাঠিয়ে যে সমস্ত কাগজপত্র পাঠাতেন তার কোন উত্তর তাঁর কাছ থেকে যেত না। বস্তুত:পক্ষে উইলসনের অসুস্থতার গুরুত্ব গারফিল্ডের চেয়ে বেশী ছিল, কারণ সেই সময় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। লীগ অফ নেশনস সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক বিতর্কের সূচনায় বন্ধুদের সমর্থন ও সেনেটরদের প্রভাবান্বিত করার জন্য দেশের সর্বত্র যে সফরে তিনি বেরিয়ে পড়বার পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যেই তাঁর সব শেষ হয়ে যায়।

অন্য সময়ও ছিল যখন রাষ্ট্রপতিত্ব কার্যতঃ এক স্থবির কার্যালয়ে পরিণত হয়েছিল—হ্যারিসন, টেলর, ম্যাক্‌কিন্‌লে ও হার্ডিঙ্গ এর শেষ কয়দিন, লিঙ্কন ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের শেষ কয় ঘণ্টা এবং আইজেনহাওয়ারের অসুস্থতার (তিনবার) প্রথম কয়েক ঘণ্টা বা দিন—কিন্তু এ সব অস্থায়ী সংকটের সমাধান আপনা আপনি হয়ে গিয়েছিল এবং কেউই সংকটকে ঘনীভূত করার জন্য সংবিধানের আক্ষরিক ভাষ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আইজেনহাওয়ার ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম, তিনি নিজেই অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছিলেন। এর সঙ্গে যোগ করা যায় ঐতিহাসিকদের কল্পনাশ্রয়ী দুটি সম্ভাব্য অক্ষমতার কথা, যেমন ধরুন ম্যাডিসন বা লিঙ্কন যদি শত্রুহস্তে পতিত হতেন (ব্যাপারটা খুবই সম্ভব ছিল) তাহলে যে অরাজকতার উদ্ভব হত তার কথা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি দেশের আর সকলের মতই প্রতিদিন এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যে (যদিও আমরা সে সব কথা ভুলে যেতে অভ্যস্থ) দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা তাঁকে নিরাবলম্ব বা অজ্ঞান করে ফেলতে পারে তাঁর মৃত্যু না ঘটিয়েও।

অসামর্থ্য একটি বাস্তব সমস্যা, এ সমস্যা শুধু ইতিহাসের নয়, এ হচ্ছে সর্ব সময়ের বন্নাবিহীন অরাজকতার সমস্যা। রাষ্ট্রপতিত্বের পদাধিকারীর পূর্ণ কার্যকালে নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা হচ্ছে আমেরিকার সুশাসনের আজ সম্ভবতঃ একমাত্র জরুরী প্রয়োজন। আমরা রাষ্ট্রপতি হিসাবে এমন একজনকে চাই যিনি সব সময়ে এই কর্তৃত্ব ভোগ করবেন, তা'ছাড়া আমরা এমন একজনকে চাই যাঁর নেতৃত্ব হবে অবিসম্বাদী।

যদি দৃশ্যতঃই যোগ্য না হ'ন তবে কাউকেই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেওয়া উচিত হবে না। ক্ষমতা আইনানুমোদিত হওয়া উচিত এই মহতী ভাবধারার স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি প্রযোজ্য তার সবগুলোই দ্বিগুণ উৎসাহে প্রযোজ্য হবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্ষেত্রে। আর কিছুর জন্য না হলেও শুদ্ধমাত্র এইজন্য রাষ্ট্রপতির অসামর্থ্য আমাদের কঠিনভাবে ভাবিয়ে তোলে এবং আমরা আশা করি এ ব্যাপারে কংগ্রেসের কর্তা ব্যক্তিরা আমেরিকার বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক কার্যকরী সমাধান খুঁজে বার করবেন। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ সন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে অনেক কথা বলেছি। এর আগে ২রা জুলাই ১৮৮১ ও ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সনের পরে প্রথম কয়েক বছরেও এ রকম আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত কাজ করেছেন কেবল ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার। আমরা যে এ সমস্যা সমাধান করতে পারি নি তার কারণ অবহেলা বা ক্ষুদ্র স্বার্থ নয়। এ হচ্ছে আমাদের অপ্রকাশ্য স্বীকৃতি যে সমস্যা খুবই পিচ্ছিল।

কার্যকরী সমাধান খুঁজে বার করতে হলে প্রথমে চারিটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে হবে। এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব সংবিধান দেয় নি।

(১) রাষ্ট্রপতিত্বে অসামর্থ্য বলতে কি বোঝায়?

(২) অসামর্থ্যের অস্তিত্ব নির্ণয় করেন কে?

(৩) অসামর্থ্যের সন্দেহাতীত অস্তিত্বে উপরাষ্ট্রপতির ভূমিকা কি?—তিনি কি উক্ত কার্যালয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্বের কেবল ভার গ্রহণ করেন না তিনি নিজেই পদাধিকারী? তিনি কি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাত্র, না তিনিই—সোজাসুজিভাবে রাষ্ট্রপতি?

(৪) যদি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজই মাত্র করেন অর্থাৎ যথার্থ রাষ্ট্রপতি যদি পরে ক্ষমতা ফিরে পান তবে সে অবস্থায় সংবিধানের ভাষায় অসামর্থ্য যে কাটিয়ে ওঠা গেছে তা কে ঠিক করবে?

গত কয়েক বছরের শুনানী, সম্পাদকীয় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকার পর এই সব প্রশ্নের সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। এদের সম্বন্ধে যে সাধারণ মত প্রচলিত আছে (যেখানে নেই সেখানকার বিরুদ্ধ মতও) তার একটা সংক্ষিপ্ত ভাষ্য নিচে দেওয়া গেল। দেখা যাক এই ভিত্তিতে কোন কার্যকরী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

(১) অধ্যাপক রুথ সিলভারের মত যাঁরা এ ব্যাপারে অনেক পড়াশুনা করেছেন তাঁরা স্বীকার করেন যে সংবিধান এক কার্যকরী অসামর্থ্যের কথা বলেছে (তার কারণ বা কার্যকাল যাই হোক না কেন) যদি এমন সময় তা ঘটে যখন জনস্বার্থে কার্যনির্বাহকের সক্রিয় হওয়া দরকার। অসামর্থ্য সম্বন্ধে রায় দেবার আগে রাষ্ট্রপতির নিজের অবস্থা ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতেই হবে, সুতরাং অসামর্থ্যের এর চেয়ে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা মূর্খতার পরিচায়ক। সম্ভবপর সমস্ত অসামর্থ্য সম্পর্কে যদি কোন বিস্তৃত আইন করার চেষ্টা করা হয় তবে এমার্সন সমস্ত নির্বোধ আইন সম্বন্ধে যা বলেছেন তাই ফলে যাবে। তিনি বলেছিলেন যে নির্বোধ আইন হচ্ছে বালুর বাঁধ, বাঁধতে গেলেই ভেঙ্গে যাবে। এ্যাণ্ড্রু জনসন এবং উড্রু উইলসনকে ধন্যবাদ, অভিযুক্তিকরণ বা স্বদেশে অনুপস্থিতি অসামর্থ্যের সূচক নয়।

(২) রাষ্ট্রপতির নিজেকে অসমর্থ বলার ক্ষমতা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে নি।

উপরাষ্ট্রপতির যে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে এমন কি তাঁর ব্যক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তাঁর অসামর্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই, এমন অবস্থায় হোয়াইটহাউসের অন্তরঙ্গ মহল পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করবে। কিন্তু যেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে—সেখানে কি হবে? উপরাষ্ট্রপতি আর্থার, মার্শাল বা নিক্সনের মত অনিচ্ছুক হলে কি হবে? রাষ্ট্রপতির গদি গ্রহণ করতে তাঁকে কী করে প্রলুব্ধ করা যাবে? এবং কি করেই বা বোঝান যাবে যে পদ গ্রহণ করে তিনি সাংবিধানিক সততা ও নৈতিক নিয়মনিষ্ঠারই পরিচয় দিচ্ছেন? যাঁরা এর সম্বন্ধে আদৌ কোন চিন্তা করেছেন তাঁরা উত্তরে বলবেন: এই সিদ্ধান্ত নেবে এমন একজন যাঁর আইনানুগ ক্ষমতা সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই, যাঁর প্রতিপত্তি ও সম্মান অনস্বীকার্য ও যাঁর সিদ্ধান্ত জাতি বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ,

সম্পাদকেরা, আইনজীবীরা ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপকবৃন্দ এ রকম কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অন্বেষণে গত কয়েক বছরে হয়রাণ হয়ে গিয়েছেন এবং নিম্নলিখিত সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করেছেন :

কেবলমাত্র উপরাষ্ট্রপতি বিবেকের প্রেরণায়ও কংগ্রেস, সুপ্রীম কোর্ট, জনমত ও ইতিহাসের আনুকূল্যে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন।

উপরাষ্ট্রপতির সম্মতিতে বা সম্মতি ব্যতিরেকে ক্যাবিনেট এক সাধারণ বা অসাধারণ ভোটাধিক্যে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ক্যাবিনেটের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রসচিব এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কংগ্রেস নিজদায়িত্বে বা ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বা উপরাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় বা উভয়ের অনুরোধে এক যৌথ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। ভোটগ্রহণ নিম্নলিখিতরূপ গ্রহণ করতে পারে। (ক) প্রত্যেকসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। (খ) দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্য। (গ) তিন-চতুর্থাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

সুপ্রীম কোর্ট সাধারণ বিচারালয় হিসাবে বা কোন বিশেষ ন্যায়াধিকরণ হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা একমত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পঞ্চাশটি অঙ্গরাষ্ট্রের রাজ্যপালগণ।

খ্যাতনামা চিকিৎসকদের এক গোষ্ঠী।

প্রখ্যাতনামা নাগরিকদের এক গোষ্ঠী যার মধ্যে থাকবেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিরা সকলে।

উপরি লিখিত ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সকল রকম যোগাযোগ—

একটি বিশেষ ন্যায়াধিকরণ যার সদস্যরা হবেন বড বড কার্যাধ্যক্ষরা সকলে —যেমন মুখ্য বিচারপতি, দুইজন প্রবীণ সহকারী বিচারক, পরিষদের স্পীকার, সেনেটের প্রেসিডেন্ট, দুই সভার সংখ্যালঘিষ্ঠদলের নেতারা, রাষ্ট্রসচিব, রাজস্ব সচিব ও প্রতিরক্ষা সচিব যারা এ রকম এক উচ্চ ন্যায়াধিকরণের কথা বলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এর সিদ্ধান্তকে আবশ্যিক করতে চান, আবার কেউ বা চান কংগ্রেস, ক্যাবিনেট বা উপরাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবার মধ্যেই এর কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকুক। আমি জানি অন্ততঃ একজন বিখ্যাত সমালোচক রাষ্ট্রপতি-জায়াকে সদস্যভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলার কোন ইচ্ছা আমার নেই কিন্তু এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে যাঁরা মনে করেন আইন করে এ বিতর্কের মীমাংসা করা

দরকার আর যাঁরা মনে করেন এর জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধতা প্রবল।

(৩) আমরা আগেই দেখেছি যে সংবিধান প্রণেতাগণ কখনই ভাবেন নি যে উপরাষ্ট্রপতি বিনা নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হবেন। জন টেলর ও তাঁর সহযোগীগণ যদি এই ইচ্ছার মর্যাদা রাখতেন (টেলারের স্বপক্ষে অবশ্য বলা যায় যে এ ইচ্ছা কখনই নির্ভুল ভাষায় লেখা হয় নি) তাহলে তৃতীয় প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকত না এবং এ প্রশ্ন যদি নাই উঠত, অসামর্থ্যজনিত সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে যেত। আর্থার এবং মার্শাল অসুস্থ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে কার্যভার কখনই বুঝে নিতেন না কারণ যাঁদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন যে এই বিকল্প ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়। যে রাষ্ট্রপতি নিজে থেকে সরে যাচ্ছেন বা যাঁকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তিনি আর রাষ্ট্রপতিই নন: বস্তুতঃ সংবিধান অনুসারে একই সময়ে দুইজন রাষ্ট্রপতি, একজন কার্যরত ও আর একজন রোগশয্যায় শায়িত থাকা অকল্পনীয়। পূর্বানুসৃত রীতি অনুসারে সংবিধানের মূল বক্তব্য এই বলে যাঁরা মনে করতেন তাঁদের মতের বিরুদ্ধতা করার লোকের অভাব ছিল না। যখন সংশয় এত প্রবল তখন আর্থার বা মার্শাল কার্যভার গ্রহণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই সংশয় সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে দূর হয়ে গেছে আজকাল। অবশ্য যতদিন পরিষদের স্পীকারের মত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী পর্যন্ত এবম্বিধ সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকবেন ততদিন অসামর্থ্য সম্পর্কীয় সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে সন্দেহ নেই।

(৪) যদিও অসামর্থ্যের প্রমাণসূচক প্রত্যেক পদ্ধতিই অসামর্থ্য অবসানের প্রমাণের সূচকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তবুও রাষ্ট্রপতির উপরই মুখ্যতঃ দায়িত্বভার অর্পিত হয়। যদি তিনি বলেন যে কার্যভার গ্রহণে তিনি সমর্থ তবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে তাই হবে চূড়ান্ত। আমি ধরে নিচ্ছি অসুস্থ রাষ্ট্রপতিকে এমন কিছু কাউকে বলতে সুযোগ দেওয়া হবে না যিনি সংবাদপত্রের কাছে তা ফাঁস করে দিতে পারেন। আমার অনুমান ভুল হতে পারে।

অসামর্থ্য সম্বন্ধে আমাদের চূড়ান্ত সমাধান কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে যে অবস্থার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত

হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া কর্তব্য। আমি আইজেনহাওয়ার-নিক্সন চুক্তির কথা বলছি, রাষ্ট্রপতি ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ সনে এর আভাস দেন ও পাঁচদিন পরে জনমতের চাপে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। তিনবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় জনচিত্তে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কয়েকমাস ধরে কংগ্রেসকে নিয়মতান্ত্রিক বৈধতা সৃষ্টি করার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছিলেন। পরে যখন আইন বিভাগের উপর আস্থা নষ্ট হয়ে গেল তখন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন। উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরিষ্কার বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন ও জাতিকে তা জানিয়ে দিলেন :

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন, যে সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার এক উপধারার নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হবে। তাঁরা মনে করেন যে এই পদ্ধতি যদিও তাঁদের উপরই প্রযোজ্য হবে তবু তা সংবিধান বহির্ভূত নয়, পরন্তু সংবিধানের বর্তমান বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন এবং এর স্পষ্ট ইচ্ছার অনুবর্তী।

(১) অসমর্থ হয়ে পড়লে রাষ্ট্রপতি সম্ভব হলে উপরাষ্ট্রপতিকে জানাবেন, উপরাষ্ট্রপতি যতদিন না রাষ্ট্রপতি সামর্থ্য ফিরে পাচ্ছেন ততদিন পদাধিকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন।

(২) যদি রাষ্ট্রপতির অসামর্থ্য এ রকমের হয় যে উপরাষ্ট্রপতিকে জানান পর্যন্ত সম্ভব নয়, উপরাষ্ট্রপতি অবস্থানুযায়ী পরামর্শ গ্রহণ করার পর ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন ও রাষ্ট্রপতির সামর্থ্য ফিরে না আসা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করে যাবেন।

(৩) সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিই ঠিক করবেন কখন সামর্থ্য ফিরে পেয়েছেন এবং সেই অনুসারেই পদাধিকারের পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব পুনর্গ্রহণ করবেন। এই নির্যাসমূলক (talmudic) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন স্পীকার রেবার্ন ও শ্রীট্রুম্যান। এঁদের দুজনের উপরাষ্ট্রপতি নিক্সনের প্রতি বৈরীভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিবাদ সহজবোধ্য ছিল। তা'ছাড়া আর সবাই এই সহজ সরল পদ্ধতির প্রশংসাই করেছে অবশ্য রাজনৈতিক আনুগত্যের বিভিন্নতার জন্য প্রশংসা কখনো উচ্ছ্বসিত কখনো বা স্তিমিত শুনিয়েছে। শ্রীআইজেনহাওয়ার পরবর্তী রাষ্ট্রপতিদের জন্য কোন নজীর সৃষ্টি করে গেলেন

কিনা তা ভবিষ্যতই বলতে পারে, কিন্তু তাঁর কার্যকালের মধ্যে যা করণীয় ছিল তিনি তা করে গেছেন।

আমার কিন্তু মনে হয় এই ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে আরো কিছু দরকার, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতিদের উপর অনতিক্রমণীয় নজির হিসাবে এর স্থান যাই হোক না কেন। অবশ্য গত কয়েক বছরে যে সমস্ত দীর্ঘবাহু প্রস্তাব এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে তা গ্রহণ করার কথা উঠছে না। "আরো কিছু করা দরকার" এ কথাটা বলার কারণ অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন; দীর্ঘবাহু প্রস্তাবাবলী অগ্রাহ্য করা উচিত কারণ যে সমস্যা হয় কোন সমস্যাই নয়, নয়ত সমাধানের অযোগ্য সে সমস্যা সমাধান মানসে বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা অস্থিরমতির পরিচায়ক হবে।

যে সমস্ত কংগ্রেসসদস্য ও পণ্ডিতগণ মনে করেন যে কংগ্রেসের যৌথ প্রস্তাবনার মধ্যেই যুক্তিপূর্ণ মীমাংসার সূত্র নিহিত আছে তাদের সঙ্গে আমি একমত। এ রকম সিদ্ধান্ত অন্ততঃ পাঁচটি বিতর্কিত বিষয়ের উপর যবনিকা ফেলতে পারে। বাদ বাকির জন্য শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আগামী শাসকদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারব। নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো গ্রহণীয় কারণ—এ ব্যাপারে এগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে সুচিন্তিত অভিমত।

(১) আমেরিকার রাষ্ট্রপতি অসমর্থ হয়ে পড়লে তা ঘোষণা করার অধিকার রাখেন এবং তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি না থাকলে পরবর্তী মুখ্য অধিকর্তা কে অর্পণ করতে পারেন।

(২) যদি রাষ্ট্রপতি স্বীয় অসামর্থ্য ঘোষণা করতে সক্ষম না হ'ন উপরাষ্ট্রপতি নিজ দায়িত্বে এই সিদ্ধান্ত নেবেন।

(৩) অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করে যাবেন মাত্র; উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর আদেশ, ঘোষণা ও অন্যান্য সরকারী কাজকে আইনসম্মত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট বলে পরিগণিত হবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব পুনর্গ্রহণ করার জন্য উপরাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে দেবেন যে তিনি আর অসমর্থ নন।

(৫) অধ্যাপক সিলভার ভাষায় যখন রাজকার্যে কার্যনির্বাহকের সক্রিয়তা জরুরী হয়ে পড়ে তখন যদি তিনি অসমর্থ হয়ে পড়েন তবে তাই হবে বাস্তব অসামর্থ্য, তার কারণ বা সময় যাই হোক না কেন।

আমি ব্যবহারাজীবী নই তাই মনে হয় যে ভাষায় এ আলোচনা করেছি তার চেয়ে আরো সঠিক ভাষায় আলোচনা সম্ভব। সে যাই হোক না কেন ব্যাপারটার একটা সহজবোধ্য দিক আছে, যা সংবিধান প্রণেতাগণের ইচ্ছা ও বিংশ এবং দ্বাবিংশ সংশোধনীর উদ্ভাবকদের বাসনা এবং জাতির ভবিষ্যৎ দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমান অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি এর দ্বারা সাধিত হবে না। অবশ্য, আইজেনহাওয়ারও তাই বলেছেন কিন্তু যদি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে সংশয়ের ঘূর্ণীবাত্যা দূরীভূত হয়, আমাদের তা গ্রহণ করে ফেলাই ভাল। যাঁরা এখনো সন্দেহ পোষণ করেন তাঁদের সংশয় নিরসনের জন্য এই নীতি সংশোধন করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এর বেশী কিছু করা ঠিক হবে না। সম্ভবপর সব রকম অবস্থার জন্য আইন করার চেষ্টা করা ঠিক হবে না, কারণ তার ফলে আমাদের বংশধরেরা আইনের জটিল গ্রন্থিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্দেহজনক অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি বাদে অন্য কোন আঙ্গিকের আশ্রয় নেওয়া অসমীচীন হবে কারণ তার ফলে এক দৈত্য জন্মগ্রহণ করতে পারে যে নিরসন না করে সংশয় বাড়িয়ে যাবে। যে গোটা বারো প্রস্তাবে কংগ্রেস, ক্যাবিনেট, সুপ্রীম কোর্ট বা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের এ ব্যাপারে টেনে আনা হয়েছে তাতে ভরসা করবার কিছু দেখছি না বরং চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। রাষ্ট্রপতির অসামর্থ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত—এ হচ্ছে রাজনীতি সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত, সুতরাং জনসাধারণের কাছে যাঁরা দায়িত্বশীল তাঁদের কাজ; এ হচ্ছে সম্ভাবনাময় আর্টের বহিঃপ্রকাশ, সুতরাং সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশে যাঁরা এই শিল্প কাজে নিযুক্ত এ তাঁদেরই কাজ। রাজনীতিতে যে সব কংগ্রেস সদস্য বা ক্যাবিনেট সদস্যের মতের গুরুত্ব আছে তাঁদের মত শ্রুত হবে নিশ্চয়ই এবং আমার মনে হয় কি করে তাঁদের মত বিবেচিত হবে সে ব্যাপারটা তাঁদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। যাঁদের গুরুত্ব নেই এবং এঁদের মধ্যে ধরছি রাজ্যপাল, চিকিৎসক, সাধারণ নাগরিক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি জায়া এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, তাঁদের পরামর্শ চাইলেই তাঁরা এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবেন নচেৎ নয়—বিচারপতিরা অবশ্য কোন সময়েই নয়। বর্তমান বিচারালয়ের সমস্ত সদস্যরা এ মত সমর্থন করেন

জেনে আনন্দিত হয়েছি। বিচারালয় হিসাবে ও ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী—কোন আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না।

বিশেষ আদালত যেমন ধরুন রাষ্ট্রপতির অসামর্থ্য বিষয়ক কমিশন যে আমাদের সন্দেহ নিরসন করতে পারবে তা মনে হয় না। সাক্ষী সাবুদ সমেত এক বিচারালয় স্থাপন করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। যখন জরুরী সিদ্ধান্ত দরকার তখন এ কালাপহরণ করবে; যে সংকটে একতা দরকার এ সেখানে অপ্রয়োজনীয় আঘাত হানবে। এমন সহজ কিছু করা আবার ঠিক হবে না যার ফলে সাময়িকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে রাষ্ট্রপতি প্রলুব্ধ হতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রপতিত্বের ঐক্য প্রয়াসে কর্মরত আমরা—অন্ততঃ আমি এই মহান কার্যালয়ের দরজা একটু খুলে বহুনায়কত্বকে আহ্বান করার দৃশ্যে কম্পিত বোধ করব। একজন অসুস্থ রাষ্ট্রপতি একজন কর্পোরেশন মুখ্য অধিকর্তা বা সেনানায়ক বা রাষ্ট্রসচিবের মত তাঁর ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে পরবর্তী কর্মচারীর হাতে দিতে পারেন এ ধারণা যাঁদের আছে তাঁরা এই পদাধিকার ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্য সমস্ত সরকারী কার্যালয়ের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য আছে তা জানেন না। উপরাষ্ট্রপতি যে রাষ্ট্রপতির প্রধান সহকারী পর্যন্ত নন এই ঐতিহাসিক রূঢ় সত্য তাঁরা এড়িয়ে যান। এমন কি উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির অন্তরঙ্গ মহলের বাইরেও থাকতে পারেন। আর্থারের এই ছিল অন্যতম অসুবিধা—কারণ গারফিল্ডের মত একজন আধা-স্বীকৃত (আমরা তাঁকে আধুনিক প্রজাতন্ত্রী ব'লব) ব্যক্তির মনোনয়নের ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তা অপনোদনের জন্যই যোদ্ধা আর্থার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি মার্শালকেও কোনদিন তাঁর বিশ্বস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তার চেয়েও খারাপ কথা, তাঁর নাম ছিল টমাস. আর. মার্শাল আর রাষ্ট্রপতি ছিলেন উড্রু উইলসন; কংগ্রেস, ক্যাবিনেট, আমেরিকার জনসাধারণ ও বিশ্বের চক্ষে তাঁদের গুণগত পার্থক্য এত বেশী ছিল যে একজন আর একজনের হয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিগ্রহ করছেন, লোকে এ ভাবতেই পারত না। কয়েকটা আইনে সই করতে বা নিয়োগকর্তা হিসাবে কয়েকজনকে চাকুরি দিতে তিনি হয়ত পারতেন, কিন্তু লীগ অফ নেশনস সম্পর্কে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার সাধ্য তাঁর ছিল না। রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এ রকম এক কার্যাধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি নিজে যে সিদ্ধান্ত নিতেন না তা তাঁকে

গ্রহণ করতে বাধ্য করতে কখনই পারেন না এবং আমরা তা আশঙ্কাও করি না।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পুনরায় উপনীত হয়েছি যে অসামর্থ্যজনিত সমস্যার কোন সমাধান নেই। একজন অসুস্থ রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী উপরাষ্ট্রপতির হাতে কি কি অবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা যেতে পারে আইনে ও প্রথায় তার বিস্তৃত নির্দেশ দিয়ে আমরা একটা আইনসম্মত সমাধানের চেষ্টা করতে পারি; যে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিত্বের পরিধির বাইরে অবস্থান করেন বা যে রাষ্ট্রপতি তাঁর ব্যক্তিত্বে অন্য সবাইকে ম্লান করে দেন তাঁরা যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করেন তার সমাধানও সম্ভবতঃ আমরা করতে পারি, শারীরিকভাবে অসুস্থ কিন্তু মনের দিক থেকে সজাগ রাষ্ট্রপতির কথা নাই তুললাম। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি যথার্থই প্রামাণ্যভাবে কিছুদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ রকম অবস্থায় যিনি রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে যাবেন তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক ও নম্র হ'তে হবে।

যদি অসুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে (যে রকম অবস্থায় একজন রুজভেল্ট হয়ত ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হবেন না বা একজন আইজেনহাওয়ার হয়তো সেরে উঠছেন) তবে অবস্থা জটিলতর হবে; তখন একজন ট্রুম্যান বা নিক্সন কেন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন না সে প্রশ্ন তুলে কোনই সুরাহা হবে না। এর পরিষ্কার কারণ হচ্ছে তিনি তা পারেন না। রাষ্ট্রপতিত্ব এমন একটি পদাধিকার যা সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; আমেরিকার জনসাধারণের সুন্দর এক প্রথানুসারে আমরা ন্যায়মূল্যে রাষ্ট্রপতিত্বের ঐক্য ও রাষ্ট্রপতির সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। গত কয়েক বছর ধরে এ সমস্যাই জনসাধারণ, অধ্যাপকবৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের পীড়িত করেছে: আইজেনহাওয়ারের পর পর তিনবার অসুস্থতার ফলে হোয়াইটহাউসের আংশিক পক্ষাঘাতের যে বিড়ম্বিত ছবি সেই সংশয়পূর্ণ দিনগুলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি তাই আমাদের বিচলিত করেছে, গারফিল্ডের স্মৃতি বা উইলসনের প্রেতাত্মা নয়।

আমাদের বিচলিত হবার অনেক কারণ ছিল, আমরা যে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যার কোন সহজ সমাধান নেই এই উপলব্ধি ছিল তার মধ্যে অন্যতম। সম্ভবতঃ এর কোন সমাধানই নেই কেবল ধৈর্য, প্রার্থনা

ও জোড়াতালি দেওয়া বন্দোবস্ত ছাড়া। প্রত্যেকবারেই যে ভাবে আমরা সমস্যার সমাধান করেছি তার চেয়ে পরিচ্ছন্নতর কোন সমাধান আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর করায়ত্ত নয়। আইজেনহাওয়ার কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকটা দিন ছাড়া অন্য কোন সময় অসমর্থ ছিলেন না এবং দৈনন্দিন সাধারণ কাজ কোনটাই অসম্পন্ন ছিল না এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তা'ছাড়া রাষ্ট্রপতির রোগমুক্তির সপ্তাহগুলোতে নিক্সন এমন কি একটা উন্নততর কর্মনৈপুণ্য দেখাতেন বা ভিন্নভাবে কী ই বা করতেন? কিছুই না। কার্যরত রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি এবং আইজেনহাওয়ারের অনুচরেরা আগের সেই বেদনাদায়ক দিনগুলোতে যেমন সার্থকতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেছেন ঠিক তেমনি করেই যেতেন:

অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেন মাত্র। এ কথাটা পরিষ্কার করে আমাদের জানা দরকার যে রাষ্ট্রপতির রোগমুক্তির ন্যূনতম সম্ভাবনা থাকলে উপরাষ্ট্রপতি কেবল কোনরকমে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন মাত্র। বিশ্বের কোন বিধানই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না—রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারের মর্যাদা ও কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে এ মন্তব্য প্রযোজ্য, বিশেষ করে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্বের অনন্যসাধারণ সত্তার ক্ষেত্রে।

কয়েক পৃষ্ঠা আগে এই ব্যাপারে সহজবোধ্য সমাধান হিসাবে যে বক্তব্য পরিবেশনের প্রয়াস আমি পেয়েছি তারই ভিত্তিতে কংগ্রেস অনতিবিলম্বে একটি আইন গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে এই ক্ষুদ্র আশা নিয়েই আমি বক্তব্য শেষ করছি। এ রকম এক প্রস্তাবের জোরে এবং আমাদের সার্থক প্রচার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও শালীনতাবোধ, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এখনো আমাদের সরকারের উঁচুমহলে লক্ষণীয় এই জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে আমরা আকস্মিকতার বিরুদ্ধে যতটা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দাঁড়ান সম্ভব তা নিয়ে রুখে দাঁড়াব। বিশেষভাবে প্রচার ব্যবস্থার দিকে আমি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, কারণ এর জন্যেই গারফিল্ড ও উইলসনের অসুস্থতার সময়ে যে নিরানন্দ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল আমরা তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। গণ-রাষ্ট্রপতিত্বের দিকে যে দৃঢ় পদক্ষেপ আমরা করেছি সে যাত্রায় পিছু হঠার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। আমেরিকার জনসাধারণ এখন ধরে নিয়েছে এ ধরণের কোন খবরই তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা

হবে না এবং তাঁরা ঠিকই প্রত্যাশা করেন যে প্রতিদিন এমন কি প্রতি-ঘণ্টায় অসুস্থ রাষ্ট্রপতির অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে। রাজ-প্রাসাদের প্রহরীরা অধুনা খবর দেওয়ার জন্যই নিযুক্ত থাকেন, খবর লুকানোর জন্য নয়।

এ সম্বন্ধে যাঁরা নিঃসংশয় নন তাঁদের বলি ক্লিভল্যাণ্ডের সময় ও আইজেন-হাওয়ারের সময়ের ব্যবধান সম্বন্ধে একটু ভালো করে পড়াশুনা করুন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ডকে ক্যান্সারের জন্য অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর নয় বছর পরে ও প্রকৃত ঘটনার চব্বিশ বছর পরে ১৯১৭ সনে জাতি বিশ্বস্তভাবে এ খবর প্রথম জানতে পারে! ডোয়াইট্ আইজেনহাওয়ার ১৯৫৫ সনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং এ খবর বিশ্বস্ত সূত্রে ও পূর্ণভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রচারিত হয়ে যায়। ডাঃ পল ডাডলে হোয়াইট্ ও জেম্‌স্ হেগার্টি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জনসাধারণের মনোবল বাড়বে এই আশায় রাষ্ট্রপতির পেটের গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক খবর দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গ খুব চিত্তাকর্ষক নয়, কারণ কাজটা খুবই অশ্লীলভাবে করা হয়েছিল, বিশেষ করে হোয়াইট্‌এর সেই মন্তব্য, "দেশ এখন পেট সম্বন্ধে খুবই সজাগ হয়ে গেছে।" আমি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি এই যুক্তিতে যে এখন থেকে চিরকালের জন্য আমরা যাতে তাঁর কর্তব্য পালনের যথাযথ ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারি সেইজন্য অসুস্থ রাষ্ট্রপতির শরীরিক অবস্থার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবরণী পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। ভদ্র এবং বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারব নিজেদের ক্ষমতার উপর এ বিশ্বাস যদি নাই রাখতে পারি তবে আর কিসের উপর রাখতে পারব?

এক বিশেষ অর্থে উত্তরাধিকারের সমস্যা অসামর্থ্যের চেয়ে বেশী জটিল। রাষ্ট্রপতিত্ব এমন একটি পদাধিকার যা কোন সময়ের জন্যেই খালি রাখা যাবে না; যে ব্যক্তি এই ক্ষমতা-ভোগ করছেন তাঁর কর্তৃত্বের সাংবিধানিক ও নৈতিক বৈধতা সম্বন্ধে কংগ্রেস, বিচারালয়, জনসাধারণ ও ইতিহাস কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে অপারগ। সুতরাং উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং এ নির্দেশ পরিষ্কারভাবে দিতে হবে কে কখন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হবেন,

উত্তরাধিকারের সেই রেখা পর পর কয়েকজনের উপরই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আর সেই ব্যক্তিদের জাতির দরবারে প্রথিতযশা হওয়াও দরকার।

সংবিধান প্রণেতাগণ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যথার্থই খ্যাতনামা কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতি হতে পারবেন, অতএব তাঁরা তাঁকেই উত্তরাধিকারী করতে মনস্থ করেছিলেন। তারপর কংগ্রেসকে আহ্বান করেছিলেন আইন করে দুটো পদই যাতে একসঙ্গে খালি না হয়ে পড়ে (অথবা একজন অসুস্থ আর একটি পদ খালি অথবা দুজনই অসুস্থ এ রকম অবস্থা) সেইজন্যে কে রাষ্ট্রপতি হবেন সেই নির্দেশ দিতে। কংগ্রেস তিনবার এ ভাবে আইন করেছে—১৭৯২, ১৮৮৬ ও ১৯৪৭ সনে—প্রত্যেক বারেই সংশ্লিষ্ট আইনের ভাষা এমন দ্ব্যর্থক হয়েছে যে আইনজীবীরা বা ঐতিহাসিকেরা কেউই সুখী হতে পারেন নি। সৌভাগ্যক্রমে এখন পর্যন্ত এই তিনটি বেয়াড়া আইন অনুধাবন করার চেয়ে বেশী কিছু আমাদের করতে হয়নি। গত ১৭০ বছরে আমরা কার্যরত অবস্থায় সাতজন রাষ্ট্রপতি ও আটজন উপরাষ্ট্রপতিকে হারিয়েছি, অর্থাৎ মোট পনের বার আইনের দ্বারা উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু অস্ট্রোগোরস্কির ভাষায় একান্ত ভাগ্যক্রমে চারবছরের জন্য যাঁদের নির্বাচিত করেছি এ রকম দুজনকে একসঙ্গে হারাই নি। তার মানে এই নয় যে ভবিষ্যতে এ রকম কিছু ঘটতে পারে না। দৃশ্যতঃ প্রতিভা ও মর্যাদার দুটো ক্ষেত্র আছে যার মধ্য থেকে জাতি একজন কার্যরত রাষ্ট্রপতি খুঁজে বার করতে পারে তা হচ্ছে কার্যনির্বাহক বিভাগের প্রধানগণ ও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। সেনানায়ক, বিচারপতি ও রাজ্যপালদের যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র আছে নানা কারণে তা বিশেষ আস্থাভাজন নয়, কংগ্রেস ও ক্যাবিনেট ও নিজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে দুটো পদই খালি হলে অন্য কাউকে রাষ্ট্রপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলে নি।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রথমবার দ্বিধাগ্রস্তভাবে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিল; যাঁরা সংবিধান প্রণেতাদের ঈশ্বরের সমতুল্য মনে করেন তাঁরা শুনে রাখুন যে ঐ সমাধান ছিল রাজনৈতিক বৈরিতার প্রত্যক্ষ ফল, সৃজনশীল রাজনীতির নয়। উপরাষ্ট্রপতির পর রাষ্ট্রসচিবকে প্রথম উত্তরাধিকারী না করে (এটাই তো যুক্তিপূর্ণ সমাধান, কিন্তু টমাস জেফারসন যে রাষ্ট্রসচিব ছিলেন।)

কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্ব সেনেটের প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকারকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এরা কেউই রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন না—রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পরিগ্রহ করতেন মাত্র। অধিকন্তু যদি কার্যকালের প্রথম দু'বছর সাত মাসের মধ্যেই দুটো পদ খালি হয়ে পড়ত তবে রাষ্ট্রসচিবকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল অবিলম্বে বিশেষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগে উন্নততর কোন আইন প্রণয়নে কংগ্রেস প্রয়াসী হয়নি যদিও উল্লিখিত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। তারপর এক অপরিজ্ঞাত কারণে কংগ্রেসের দুই পরিষদই হঠাৎ রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটরূপ বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিভার ক্ষেত্রের দিকে মনোযোগ দিল। এর পর থেকে দুটো পদই খালি হলে উত্তরাধিকারীরা পর পর নেমে আসতেন রাষ্ট্রসচিব থেকে আভ্যন্তরীণ সচিব পর্যন্ত। এ রকম ভাগ্যবান পুরুষের উপরই ন্যস্ত হত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তিনি কার্যরত থাকতেন। ১৭৯২ সনের আইনে যে বিশেষ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল তা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল এবং সঙ্গে নিয়ে গেল সংবিধান প্রণেতাদের এক সুস্পষ্ট ইচ্ছার অস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশকে।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে পট্‌স্‌ডাম যাবার আগে হ্যারি টু্ম্যান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনের সংশোধন করার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করলেন। নিজে একজন অভিজ্ঞ আইন প্রণেতা ছিলেন তিনি, তাই একজন মনোনীত উত্তরাধিকারী—অপেক্ষা একজন নির্বাচিত উত্তরাধিকারীর বন্দোবস্ত করা বেশী গণতান্ত্রিক হবে। এই মত তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল। যখন প্রথম এ যুক্তি তিনি শুনেছিলেন তখন এডওয়ার্ড স্টেটিনিয়াস ছিলেন রাষ্ট্রসচিব; সুতরাং প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার সাম রেবার্নকে তাঁর পরিবর্তে উত্তরাধিকারী করার ইচ্ছা কংগ্রেসকে সক্রিয় করে তুলেছিল। যখন জেম্‌স্ বার্নস্ স্টেটিনিয়াসের পর রাষ্ট্রসচিব হলেন তখন আবার চাকা থেমে গেল। ১৯৪৬ সনে কংগ্রেসীয় নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীদের সাফল্য শ্রীটু্ম্যানকে আদর্শ রাজনীতিবিদ হিসাবে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ ক'রল; আবার তিনি কংগ্রেসকে অনুরোধ করলেন স্পীকারের স্বপক্ষে উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তিত করতে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সাম রেবার্নের পরিবর্তে তখন জোসেফ মার্টিন ছিলেন স্পীকার। ১৯৪৭ সনের আইন করে কংগ্রেস সাড়া দিয়েছিল। এ আইন আগামী

কয়েক বছর আমাদের সঙ্গে থাকবে, প্রার্থনা ক'রব এর প্রয়োগের কোন আবশ্যকতা কখনো দেখা যাবে না।

১৯৪৭ সনের রাষ্ট্রপতিত্বের উত্তরাধিকার আইন ব্যবস্থাপক বিভাগের উপরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্যে। ক্যাবিনেটকেও পাশে রেখে দেওয়া হয়েছে হাতের পাঁচ হিসাবে। এ একটা জটিল আইন, যদি রাষ্ট্রপতি পদ ও উপরাষ্ট্রপতি পদ দুইই একসঙ্গে খালি হয়ে পড়ে, তখন কি হবে, সেই আলোচনাতেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। এ রকম দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার স্পীকারেরপদ ও আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যরত থাকবেন। যদি কোন স্পীকার না থাকেন বা থাকলেও অযোগ্য বলে প্রতীয়মান হন তবে সেনেটের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট ঐ পদ ও সেনেট সদস্যের পদ ত্যাগ করে রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হবেন। যদি কোন স্পীকার বা সেনেটের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট না থেকে থাকেন বা থাকলেও যোগ্য বলে বিবেচিত না হন (ধরুণ তাঁরা যদি জন্মসূত্রে নাগরিক না হন) তাহলে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্র ক্যাবিনেটের প্রথম সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর অযোগ্যতা থাকা চলবে না অর্থাৎ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিপদ গ্রহণের যোগ্যতা তাঁর থাকা দরকার, সেনেটের পরামর্শ ও অনুমতিক্রমেই তিনি পদারূঢ় থাকবেন এবং কোনরকম অভিশংসনের (Impeachment) অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। একজন যোগ্যতাসম্পন্ন স্পীকার বা সেনেটের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট কার্যভার বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি কার্যরত থাকবেন। ১৮৮৬ সনের আইনের মত এখানেও বিশেষ নির্বাচনের কোন উল্লেখই নেই।

রাষ্ট্রপতিত্বের উত্তরাধিকারের এই আধুনিকতম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেশ কিছু তীব্র যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার বা সেনেটের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট সাংবিধানিক অনুশাসন বলে কোন কার্যাধ্যক্ষ কিনা সে প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক সিলভার মতের প্রতিধ্বনি তুলে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হবে ১৯৪৭ সনের উত্তরাধিকার আইন নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে তাঁকে স্বীয় বৃত্তি ত্যাগ করতে বলছে অথচ আইন করে ঐ বৃত্তিতেই এই ক্ষমতা ও দায়িত্ব যুক্ত করা হচ্ছে! অর্থাৎ কিনা, রাষ্ট্রপতিত্বের কর্তৃত্ব অন্য কোন

পদাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা কংগ্রেসের নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কোন্ কার্যাধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি হবেন সে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার নেই অথচ ১৯৪৭ সনের আইনে কংগ্রেস ঠিক তাই করেছে। এটা অবশ্য ঠিক যে এই সব চুলচেরা বিচার সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে আমরা এড়িয়ে যেতে পারব, কিন্তু রাষ্ট্রসচিবকে নিয়মতান্ত্রিক উত্তরাধিকারী করে ও অন্যান্য ক্যাবিনেট সদস্যদের এ ব্যাপারে তারপর পর পর সাজিয়ে দিয়ে যদি আমরা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আইনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতাম তা কি আরো যুক্তি সঙ্গত হ'ত না? ১৭৯২ সন ও ১৯৪৭ সনের আইনের চেয়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আইন অন্ততঃ তিনটি কারণে উন্নততর: প্রথমতঃ কয়েকবারই আমাদের কোন স্পীকার বা সেনেটের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট ছিল না, দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রসচিবই (বা রাজস্বসচিব অথবা প্রতিরক্ষা সচিব) কার্যনির্বাহক বিভাগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষায় বেশী সমর্থ এবং তৃতীয়তঃ বাস্তববুদ্ধিতে বলে যে প্রতিনিধি পরিষদের তুলনায় রাষ্ট্রবিভাগেই রাষ্ট্রপতিজনোচিত ব্যক্তিরা পুরোভাগে বেশী থাকেন। তুলনা-মূলক বিচারে রাষ্ট্রসচিবের চেয়ে প্রতিনিধিপরিষদের স্পীকার খুব বেশী গণ-তান্ত্রিক প্রার্থী নন, বিশেষ করে আমরা যখন জানি যে স্পীকারেরা শীর্ষে ওঠেন "নিরাপদ জেলার" ভোটে, প্রবীণতার দাবিতে ও গোষ্ঠীপ্রিয়তার জন্যে।

সব দিক বিচার করলে বলতে হয় যে এখন পর্যন্ত উত্তরাধিকারের সমস্যা এমন আকার নেয় নি যে আমাদের নিদ্রাহরণ করতে সক্ষম হবে। বিকল্প-ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে ভালই লাগে এবং আমার মনে হয় কার্যকালের প্রথম দেড় বছরে যদি দুটি পদই খালি হয়ে পড়ে তবে বিশেষ নির্বাচনের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ থাকবে। এ অবস্থায়ও আমরা সাধারণ বুদ্ধি ও দেশপ্রেমের উপর নির্ভর করতে পারব আশা করি। কারণ সম্ভাব্য সমাধান কোন সময়েই জাতির সন্তুষ্টিবিধানে সমর্থ হবে বলে মনে হয় না।

ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারের সমস্যা কি আকার নেবে তাই আমার এখন বিবেচ্য। দুটো পদ খালি হয়ে পড়লে কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে যদি আমাদের সঠিক ধারণা না থেকে থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই বহু শূন্যপদের জন্য প্রস্তুত নই এবং সম্ভাবনার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত সহযোগী ওয়াকিবহাল তাঁরা আমাকে বলেছেন যে আগামী একশ' বছরে বা আরো পরে আমরা সম্ভবতঃ ঠিক এ ধরণের সমস্যারই সম্মুখীন হব। স্থির লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত একটি

বা কয়েকটি বোমা রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা গ্রহণ করতে সক্ষম এ রকম কাউকে আর জীবিত নাও রাখতে পারে তারচেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে যদি অনেকে রাষ্ট্রপতিত্বের দাবি নিয়ে সমুপস্থিত হয় ইতিহাসের এমন এক সময়ে যখন ১৮৬১ সনের এপ্রিল মাসের মত আমাদের ভাগ্য নির্ভর করবে রাষ্ট্রপতি কতটা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তার উপর। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধান কি? অন্যান্য সমস্ত কার্যনির্বাহক পদাধিকারীকে উত্তরাধিকার আইনের আওতায় এনে? বা কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে দেশের অন্যত্র কাজ করতে বলে? ন্যুইয়র্ক এর রাজ্যপাল বা ষষ্ঠ বাহিনীর সেনাপতিকে উত্তরাধিকারী করে? বা অদৃষ্টের উপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে? এর উত্তর ভবিষ্যতের উপরই ছেড়ে দেবো এবং প্রার্থনা করব যেন কখনো তাকে এর উত্তর দিতে না হয়।

এই মারণ যজ্ঞ যদি আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহলে অতীতের চেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করবার দরকার হবে না। আর যদি না পারি, যদি আমরা সোভিয়েত রাশিয়া বা চীনের বোমার খপ্পরে ভীষণভাবে পড়ে যাই (বা কিছুদিন পরে মিশর, ঘানা বা আন্দোরার আক্রমণের লক্ষ্য হই) তবে চিন্তা করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। একটা জাতি ভীষণভাবে ধ্বংস হয়েও কি রাজনৈতিক সত্তা ফিরে পেতে পারে? এ আলোচনায় এ প্রসঙ্গের স্থান নেই নিশ্চয়ই, তবু করছি।

নির্বাচন এবং কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কিত আর যে সমস্যা সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে কতবার একজন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন সেই সমস্যা। সংবিধান প্রণেতাগণ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল একবার বা বড় জোর পর পর দু'বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। শেষে কিন্তু যতবার খুসী নির্বাচনের নিদান দিয়ে তাঁরা কর্তব্য শেষ করলেন। **দি ফেডারেলিষ্ট** এ হ্যামিল্টন অনির্দিষ্ট-কাল নির্বাচিত হবার সুযোগের স্বপক্ষে জোড়ালো যুক্তি উত্থাপন করলেন, কিন্তু সন্দেহ হয় সংবিধানে কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় নি কারণ আশা করা গিয়েছিল যে জর্জ ওয়াশিংটনই হবেন প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং আরো বড় প্রত্যাশা ছিল যে জনসাধারণ তাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ক্ষমতার আসীন করে রাখবে।

যদি জর্জ ওয়াশিংটন পরোক্ষভাবে সংবিধানে পুনঃনির্বাচিত হবার সুযোগের

সৃষ্টি করে থাকেন তবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেই স্বাস্থ্যকর প্রথার সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন যার ফলে আমেরিকার জনসাধারণ ১৫০ বছর ধরে শান্তভাবে এই "স্বৈরতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে ও সংবিধান সংশোধন করে এ প্রথার অবসানকল্পে যাঁরা কাজ করেছেন (তাঁরা সংখ্যায় শত শত) তাঁদের সার্থকভাবে প্রতিরোধ করেছে। বিশেষ করে দ্বি-নির্বাচনের যে ঐতিহ্য তিনি ও ভার্জিনিয়ার তিন রাষ্ট্রপতি সেই সুদূর অতীতে স্থাপন করে গেছেন আমাদের রাজনীতিতে তার আবশ্যিক না হলেও অত্যন্ত প্রবল প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে অনেক রাষ্ট্রপতিই আত্মশ্লাঘায়, অহমিকায়, বন্ধুদাবিতে বা এই তিন কারণের যোগাযোগের জন্য তৃতীয়বার নির্বাচিত হবার গৌরব লাভ করবার জন্য সোৎসুক ছিলেন। অনেকেই শেষ সময় পর্যন্ত তৃতীয়বারের দাবি আঁকড়ে ধরে ক্ষমতার এই বিরাট আধার স্পর্শ করে ছিলেন। কিন্তু জনচিত্তে কোনই সন্দেহ ছিল না যে এ এক পবিত্র ঐতিহ্য, অত্যন্ত অস্বাভাবিক সময় ছাড়া পরিত্যাজ্য নয়।

১৯৪০ সনের বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে আমরা হয়তো সংবিধানের হাল্কা ব্যবস্থা মত শান্তভাবে গা ভাসিয়ে চলতাম। কিন্তু ইতিহাসের প্রথম রাষ্ট্রপতির উদ্ভব হ'ল যিনি ঐতিহ্য ভঙ্গ করে তার ফলাফল হৃষ্ট চিত্তে মেনে নিতে উৎসুক হয়ে তৃতীয়বার নির্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন কি চতুর্থবারের কিছু অংশও তাঁর ভাগ্যে ছিল, কিন্তু তারপরেই এল দ্বাবিংশতম সংশোধনী। তাঁর বন্ধুদের ও শত্রুদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস উভয়ক্ষেত্রেই হয়তো তাঁর মেয়াদী কার্যকাল মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বলে মনে করবে।

কংগ্রেস ১৯৩৭ সনের দ্বাবিংশতম সংশোধনীর প্রস্তাবনা করে এবং দুই কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রী দল একস্বরে তা সমর্থন করে। ১৯৫১ সনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অঙ্গরাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন এ লাভ করে। এই আইনের মূল পংক্তির বক্তব্য সম্বন্ধে কোন দ্বি-মতের অবকাশ নেই।

কোন ব্যক্তিই দুবারের বেশী রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হতে পারবেন না এবং যে ব্যক্তি কোন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হয়ে দুবছর অন্ততঃ কাজ করেছেন তিনি একবারের বেশী রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

অঙ্গরাষ্ট্রীয় সংবিধানগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বলা যায় এ ব্যবস্থা যে ব্যক্তি ছ'বছর ধরে রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেছেন তাঁর পুনঃনির্বাচন স্থায়ী-ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

১৯৪৭ সনে প্রতিনিধি পরিষদে ও সেনেটে দ্বাবিংশতম সংশোধনীর পক্ষে জোড়াল সমর্থন জানান হয়। ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার সেনেট সদস্য রেভারকম্ব সমস্যার মূলকেন্দ্র উন্মোচিত করে বলেন যে কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন তবে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে ও জনসাধারণের যথার্থ স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। সেনেট সদস্য উইলি সমর্থনের সুরে বলেছেন যে এক চতুর ও উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রপতি অতি সহজেই তাঁর কর্তৃত্ব বাড়াতে ও স্থায়ী করতে সক্ষম। প্রশাসনে, সেনাবাহিনীতে, বিচারালয়ে বা কংগ্রেসের যে যে মানুষ তাঁকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক তাঁদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট করে, পুন-নির্বাচনের জন্যে বাড়তি ভোট ক্রয় করে ও জনসাধারণের কাছে নিজেকে অপরিহার্য বলে প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়ে (যাকে কংগ্রেস পযন্ত বাধা দেয় না) তিনি অনায়াসেই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেন। অধুনা এই সব সমালোচকদের মতে সায় দিয়ে ডেভিড লরেন্স বলেছেন যে দ্বাবিংশতম সংশোধনী খারিজ করার জন্য যে প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে তা স্বৈরতান্ত্রিক সংশোধনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন, "যদি আমেরিকায় কোনদিন স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হয় তবে তা সম্ভবতঃ আসবে নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যরত রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে।" দ্বাবিংশতম সংশোধনীর মূলে আছে রাষ্ট্রপতিত্বের স্বৈরতান্ত্রিক বিবর্তনের ভয়।

পরিষদ সদস্য সাবাথ ও কেফাভার ও সেনেট সদস্য কিলগোর, পেপার ও লুকাস আলোচিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। যদিও তাঁদের বক্তব্য গৃহীত হয় নি তবু ইতিহাসের প্রতি তাঁদের আবেদন ছিল প্রাণস্পর্শী এবং মধ্যবর্তী সময়ে নতুন নতুন লোক তাঁদের যুক্তির দ্বারা ধীরে ধীরে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কয়েকবারই রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার তৃতীয় মেয়াদের বিরুদ্ধে এই ঢালাও নির্দেশকে "পুরোপুরিভাবে বাঞ্ছনীয় নয়" বলে অভিহিত করেছেন, তবু ১৯৫৯ সনে এ্যাটর্নি জেনারেল রোজার্সকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন কংগ্রেসকে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে আলোচ্য সংশোধনীর উপর নতুন কোন আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা থেকে

বিরত করতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় তাঁর পরিবর্তিত মতের ইঙ্গিত আমরা পাই। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান দ্বাবিংশতম সংশোধনীকে অষ্টাদশ সংশোধনীর সঙ্গে একই পংক্তিতে পর্যায়ভুক্ত করেন, স্পীকার রেবোর্ণ তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন। সেনেট সদস্য ন্যুবার্গার ও পরিষদ সদস্য সেলার ও উদল সংশোধনী খারিজ করার জন্যে প্রস্তাবও এনেছিলেন। দ্বাবিংশতম সংশোধনীর নিম্নলিখিত সমালোচনায় তাঁদের ও তাঁদের সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

(১) আমেরিকার জনসাধারণের কাণ্ডজ্ঞান ও বিচক্ষণতায় শোচনীয় আস্থা-হীনতার পরিচয় এ দিয়েছে। মনে হচ্ছে ধরে নেওয়া হয়েছে যে অস্বাভাবিক অবস্থায় চিরাচরিত রাজনৈতিক আচরণ বিধির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা জনসাধারণের নেই।

(২) এই যুক্তির সমর্থনে এই ঘটনার উল্লেখ করা যায় যে একবিংশতম সংশোধনীর মত এই সংশোধনীকে গণ-নির্বাচিত অনুমোদনমূলক কনভেনশনে পেশ করা হয় নি। কংগ্রেসের প্রজাতন্ত্রী নেতারা সন্দেহ করেছিলেন যে যাঁরা রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে দুটো বাড়তি মেয়াদ দান করেছেন সেই ভোটদাতারা এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হবেন, তাই তাঁরা অঙ্গরাষ্ট্রীয় আইনসভার কাছে অনুমোদন চাইবার যে পুরাণো নিয়ম চালু আছে তারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করে এই আইনসভাগুলোকে একে একে হাত করা হয়েছিল।

(৩) যে সংবিধানের পরিবর্তনশীলতা আমাদের এক অমূল্য সম্পদ ছিল, তার মধ্যে এই নতুন দুষ্পরিবর্তনীয়তার আমদানি হওয়ায় সংবিধানের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এর ফলে আমেরিকাবাসীদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অনাবশ্যকভাবে "কবরের প্রশাসনের" খপ্পরে পড়ে যাবে।

(৪) যদিও এই সুতীব্র দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ বহুদিন পরেই হবে, খুব শীঘ্রই আমরা নিজেদের প্রচণ্ড এক জরুরী অবস্থায় জড়িয়ে পরতে দেখব—ও সেই সময় কার্যরত রাষ্ট্রপতিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতাসীন করে রাখতে সচেষ্ট হ'ব। ১৯৪৭ সনে যাঁরা প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করে এই সংশোধনী গ্রহণ করেছেন তাঁদের ইচ্ছার আনুকূল্যে

আমাদের এ রকম যোগ্য প্রার্থীকে সরিয়ে রাখতে হবে যতই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে সঁপে দেবার জন্যে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি না কেন। তখন জর্জ ওয়াশিংটনের উপদেশ গ্রহণ না করার জন্য আমরা অনুতপ্ত হ'ব। ওয়াশিংটন এ ব্যপারে ভাল কিছুই না দেখতে পেয়ে লাফেট্কে লিখেছিলেন, "জরুরী অবস্থায় গণপূজার যোগ্যতম পূজারীকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না।"

(৫) এরই মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতিরও দ্বিতীয় মেয়াদী কার্যকাল প্রশাসনিক নেতৃত্বের পক্ষে খুব আরামদায়ক নয়। জ্যাকসনকে বাদ দিলে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত কোন রাষ্ট্রপতি (এমন কি জেফারসন ও দুই রুজভেল্টও নয়) তাঁর কার্যকালের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম বছরের সাফল্য অষ্টম বছর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি এবং তাঁর অমানিশার দিন তখনই আরম্ভ হয় যখন তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাও বুঝতে পারেন, যে পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রার্থী হওয়া তাঁর আর চলবে না। ১৮০৬ সনে নিউ হ্যাম্পশায়ারের উইলিয়াম পামার লিখেছিলেন :

এ সম্বন্ধে এখন আর দ্বি-মতের অবকাশ নেই যে জেফারসন পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এত তাড়াতাড়ি এই খবর প্রকাশ করায় অবিজ্ঞোচিত ও অনাবশ্যকভাবে তাঁর গুরুত্বকে ছোট করা হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই অস্তগামী সূর্য অপেক্ষা উদীয়মান রবিরশ্মিকে পছন্দ করেন।

এখন যখন প্রত্যেক রাষ্ট্রপতির সূর্যই দ্বিতীয় কাযকালের প্রথম দিন থেকেই অস্তাচলমুখী (বা গদ্যের ভাষায় নিশ্চিত মৃত্যুর চার বছর আগেই তিনি একটি ঠুঁটো জগন্নাথ) আমরা নিশ্চিতই দেখতে পাব রাষ্ট্রপতির জনসাধারণকে "প্ররোচিত না হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাওয়ায়" উদ্বুদ্ধ করার যে ক্ষমতা আছে, দিন দিন তা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পক্ষে এ খুব মনোগ্রাহী সম্ভাবনা নয়। যে রাষ্ট্রপতি তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছেন পুরাণো দিনে তাঁকে আমরা অনায়াসেই সহ্য করতে পারতাম, আজ আর এ বিলাসিতার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়বার পদারূঢ় রাষ্ট্রপতিদের ভবিষ্যতেও পাওয়া যেতে পারে এই সম্ভাবনা অতীতে ছিল বলেই কুলিজ ও ট্রুম্যানের মত ভিন্ন চরিত্রবিশিষ্ট ভদ্রজন, জ্যাকসন ও গ্র্যাণ্টের কথা নাই তুললাম, জনসাধারণকে ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর করে রেখে দিয়ে

দক্ষভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়বার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আমরা আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্বের উপর আঘাত হেনেছি।

(৬) পরিশেষে বক্তব্য, দ্বাবিংশতম সংশোধনীর ফলে সংবিধানে এমন সব শব্দ এসে গেছে যা মুহূর্তের উত্তেজনা ও তীব্র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যুগের সুচিন্তিত বিচক্ষণতার নয়। এ খবরটা এখন আর খুব প্রাসঙ্গিক নয় তবু বলি এ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের স্মৃতির উপর যেন প্রকাশ্য চপেটাঘাত বিশেষ। আমেরিকার জনসাধারণের মৃত ও জীবিত রাষ্ট্রপতিদের সমালোচনার অপরিত্যাজ্য অধিকার সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করছে না, কিন্তু বিক্ষোভ প্রদর্শনের ক্ষেত্র সংবিধান নিশ্চয়ই নয়। যদি কংগ্রেস কোন যুগ্ম প্রস্তাবনায় দুই মেয়াদী কার্যকালের ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রত তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত নিশ্চয়ই।

এই সমালোচনার চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তব্য দ্বাবিংশতম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রত্যাঘাত এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি সেগুলো সমর্থন করি। চতুর্থ বক্তব্যের বিরুদ্ধে একমাত্র বক্তব্য থাকতে পারে যে এ রকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না এবং এ রকম ভাবে কাউকে আমরা চাইব না। আমি কঠিন প্রত্যুত্তরে বলতে চাই—অপেক্ষা করুন আর দেখুন। পঞ্চম বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুটো বক্তব্য আছে যার মূল নিহিত আছে রাষ্ট্রপতি-পদ সম্বন্ধে দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন মতবাদে। প্রথম যুক্তি হচ্ছে পুনঃনির্বাচনের সুযোগ না থাকলে রাষ্ট্রপতি রাজনীতির উর্ধ্বে সর্ব মানবের মহৎ নেতার ভূমিকা পরিগ্রহ করতে পারেন (জর্জ ওয়াশিংটনের পরে কেউ তা পারে নি)। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের পুনঃনির্বাচনের পরে ফ্লাশিং, ন্যুইয়র্কের উইলিয়াম বি. গুডম্যান ন্যুইয়র্ক টাইম্‌স্‌ এ লিখেছিলেন ঃ

তাঁর হারাবার কিছুই নেই। তিনি পুনর্বার নির্বাচিত হতে পারবেন না। বহির্বিষয়ক ও আভ্যন্তরীণ নীতির এমন বিন্যাস এখন তিনি করতে পারেন যা প্রথম কার্যকালে পর্যাপ্ত নয় বলে গ্রহণ করতে সাহস পেতেন না। তাঁর দলের সেনেটীয় বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর কি ক্ষতি করতে পারে সে ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই তাঁর। তিনি কিন্তু দলের ক্ষতি করতে পারেন যদি নিজ নীতির স্বপক্ষে কংগ্রেসের সহযোগিতাপূর্ণ সমর্থন তিনি অর্জন করতে

পারেন। সে ক্ষেত্রে সে দলের উপর তাঁর প্রভাব ক্রমক্ষীয়মাণ সেই দলের সদস্যদের তোয়াজ করার দরকার হবে না তাঁর। জনসাধারণের কাছে তাঁর অবদান আর দলীয় স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে আসার দরকার নেই।

দ্বাবিংশতম সংশোধনীর ইচ্ছা হয়তো এ ছিল না তবু রাষ্ট্রপতিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে মুক্ত করেছে এ। যথার্থ জাতীয় নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে বিবর্তিত করেছে সংবিধান ফলে রাষ্ট্রপতি বেশ একাকী হয়েও পড়েছেন—স্বাধীনভাবে কাজ করার যে সুযোগ তাঁর করায়ত্ত হয়েছে তার দাম দিতে হয়েছে একাকীত্বে। আগের কোন রাষ্ট্রপতিই তাঁর মত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন না।

আমি স্বীকার করছি এই ভাষণের অন্তর্নিহিত দেশপ্রেম আমাকে অনুপ্রাণিত করে কিন্তু ইতিহাসের এই রূঢ় শিক্ষা কি করে ভুলব যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বিমুক্ত রাষ্ট্রপতিই (roi faine'ant) সাজানো রাজা তাঁর "স্বাধীন কর্মযুদ্ধ" ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে চালিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয়বার নির্বাচিত কোন রাষ্ট্রপতি যদি দলের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হন তবে তাঁর অবস্থা ঠুঁটো জগন্নাথের চেয়েও খারাপ হবে; তিনি মারা পড়বেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের সেখানেই শেষ হবে না, অনেকেই হয়ত তাকে অকৃতজ্ঞ বা দলত্যাগী মনে করবেন। যে দল তাঁকে দুবার রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছে সে দলীয় প্রার্থীকে তিনি পরের নির্বাচনে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন তা নিশ্চয়ই সে প্রত্যাশা করবে। যদিও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতির স্বপ্ন আমরা দেখতেই থাকব, তা স্বপ্নই থেকে যাবে।

দ্বিতীয় প্রত্যুত্তর: যদি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তবে তৃতীয়বার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যকলাপের বিরুদ্ধেই সতর্ক হতে হবে, দ্বিতীয়বার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কার্যতঃ যাঁরা দ্বাবিংশতম সংশোধনীকে সমর্থন করেন তাঁরা একে খুব কঠিন সিদ্ধান্ত কিছু মনে করেন না। তাঁরা বলেন যদি এই সংশোধনী রাষ্ট্রপতিত্বকে দুর্বল করে থাকে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য তাতে ভালই থাকবে। দ্বাবিংশতম সংশোধনীর যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে এই যে এর ফলে কার্যনির্বাহক বিভাগের কাছ থেকে ব্যবস্থাপক সভার হাতে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এইভাবে (কংগ্রেসের সাধারণ চেষ্টায় যা সম্ভবপর হয়ে উঠত না) সেই আপাত অপরিবর্তনীয় ঘটনাপ্রবাহ

পরিবর্তিত হয়ে গেছে। নিম্নোক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে সেনেট সদস্য রেভারকম্ব এই অব্যক্ত মূল যুক্তিকে ভাষা দেবার চেষ্টা করেছেন :

এটা বলা হয় যে কংগ্রেসের সদস্যরা ক্ষেপে ক্ষেপে নির্বাচিত হ'ন, সুতরাং কার্যনির্বাহকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিরুদ্ধে কংগ্রেসই পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ। আমি মনে করি যে যদি কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্বের মত শক্তিশালী পদাধিকারে অধিষ্ঠিত থাকেন তবে কংগ্রেসের পক্ষে তাঁর একক প্রচেষ্টার ফলে কার্যনির্বাহক বিভাগের যে ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে তা রোধ করা সম্ভব নয়। এই পদাধিকারের অন্তর্নিহিত শক্তি অসীম। ব্যাঙের ছাতার মত এ গজিয়ে উঠতে পারে অথবা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে, ফলে একজন বা একটি গোষ্ঠীর হাতে পরিপূর্ণ স্বৈরতন্ত্রের বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হয়ে আইনে না, স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হতে পারে। যদি এ অবস্থা ঘটে তবে মুক্ত ও স্বাধীন গণসরকারের ধ্বংসের উপর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমার মনে হয় স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা নয়, বা তৃতীয়বার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ছায়াও নয় পরন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্রপতিত্বের বাস্তবতা, ভিন্নার্থে যে কোন রাষ্ট্রপতির সারবত্তাই—দ্বাবিংশতম সংশোধনীর অভিযানের পক্ষে শক্তি জুগিয়েছে। সমস্ত বাদানুবাদ ও অমানিশার ভবিষ্যদ্বাণী শুব্ধ হয়ে যাবার পর যা সত্য হয়ে থাকবে তা হচ্ছে এই যে সংশোধনীর জন্য গর্ব ও আনন্দ অনুভব করেন হুইগরা। তাঁরা রাষ্ট্রপতিত্বকে ভয় করেন, পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন কংগ্রেসে আর যাঁরা এর পরিবর্তন দাবি করেন তাঁরা হচ্ছেন জ্যাকসনপন্থী। এঁরা কংগ্রেসকে সম্মান করেন কিন্তু নেতৃত্বের জন্য রাষ্ট্রপতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতিত্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় এই বই আপ্লুত সুতরাং দ্বাবিংশতম সংশোধনী বাতিল করা কেন দরকার সে বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আমার মনে হয় না এর পরিবর্তন হবে কিন্তু তাই বলে পরিবর্তন চাইব না এটা কোন যুক্তি নয়। কিন্তু বাতিল করার মুহূর্তে কার্যরত রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস যদি কোন নাটকীয় ঘোষণায় দ্বি-নির্বাচন নীতির অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আস্থা প্রকাশ না করেন তবে দুঃখিত হ'ব।

তারপর আমেরিকার জনসাধারণের উপরই এই দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত যে ১৯৪০ সনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে এই ঐতিহ্য মেনে চলা ঠিক হবে না একে ভেঙ্গে ফেলা হবে।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতিত্বের ভবিষ্যৎ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্বের দীর্ঘ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করার দরকার হবে না। অনেকে স্বপ্ন দেখেন রাষ্ট্রপতিরা ক্যালভিন কুলিজের মত হবেন, আবার অনেকে ভাবেন যে অজ্ঞতা ও ঈর্ষায় এ পদাধিকার দুর্বল হয়ে পড়বে। আগামী দিনের ঘটনাবলীতে স্বপ্ন এবং আশঙ্কা এ দুটোরই আতিশয্যের কোন সম্ভাবনা নেই। যে বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ রাষ্ট্রপতিত্বকে ক্ষমতা ও মর্যাদার বর্তমান আকর করে তুলেছে ভবিষ্যতে তার স্রোত অব্যাহতই থাকবে। আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ ক্রমশঃই বেশী করে পরস্পর নির্ভর হয়ে উঠবে, কম করে নয় এবং আমরা রাষ্ট্রপতিপদের দিকে সব সময়ে আশার সঙ্গে না হলেও উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে থাকব আমাদের সমস্যার গুরুভার লাঘব করবার জন্য। চীন থেকে পেরু পর্যন্ত মানবজাতির সমস্যায় ক্রমশঃই বেশী করে জড়িয়ে পড়বে আমাদের সরকার এবং এ পৃথিবীর জনসমষ্টি রাষ্ট্রপতিত্বের শীর্ষ পুরুষের দিকে বলিষ্ঠ ও আবেগপ্রবণ নেতৃত্বের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকবে। আপৎকালীন অবস্থার চেহারা দিন দিনই বেশী খারাপ হবে, কংগ্রেস হয়ে উঠবে অসংহত আর রাজনীতি দিন দিন বড় শহরের সমাবেশের রূপ ধরবে। পরবর্তী যুক্ত সম্বন্ধে একটা

ভবিষ্যদ্বাণী—অনায়াসেই করা যায়—এর ফলে আমাদের সরকার রাতারাতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির এক অস্থায়ী স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হবে।

আর একটা কথা অনুরূপ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়—হোয়াইটহাউসে আরও মহৎ ব্যক্তির পদধ্বনি শ্রুত হবে। মিনমিনে আর নরম স্বভাবের লোক রাষ্ট্রপতিপদের প্রার্থী হ'ক আমেরিকার জনসাধারণ আর তা চায় না। অদূর ভবিষ্যতে অদূর অতীতের মতই জনসাধারণ রাষ্ট্রপতিত্বের নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা প্রত্যাশা করবে আর দেখতেও পাবে। শক্তিশালী রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে গণতন্ত্রীদের তুলনায় যাঁরা খুব উৎসাহী ছিলেন না সেই প্রজাতন্ত্রীরা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন যে ক্ষমতার দণ্ড প্রবলভাবে এবং সম্ভবতঃ স্থায়ীভাবে ক্যাপিটল হিল থেকে হোয়াইটহাউসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমাদের ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতির চেহারা হবে জ্যাকসন ও লিঙ্কনের মত, মনরো আর বুকাননের মত নয়; রুজভেল্ট আর ট্রুম্যানের মত হার্ডিঙ্গ আর কুলিজের মত নয়।

আমার পাঠকদের মধ্যে কেউ যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন তবে তিনি এই দেশের জটিলতম সামাজিক সমস্যার এক সূচী তৈরী করে ফেলুন এবং ভেবে দেখুন যে এর কোনটার রাষ্ট্রপতিত্বের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া এমন সমাধান করা যায় কিনা যাতে আমেরিকাবাসীরা তৃপ্ত হবেন। আমার সূচী চারটি সমস্যা নিয়ে শুরু হবে—জাতিগত বৈষম্য সম্পর্কে বিষম সংকট, অপরাধপ্রবণতার অসহনীয় অভিব্যক্তি, শিক্ষায় অনগ্রসরতা আর নাগরিক জীবনের অসুস্থতা—আর শেষ হবে এই মন্তব্যে যে এ রকম প্রত্যেক সমস্যার সমাধান তখুনি সম্ভব হবে যখন রাষ্ট্রপতি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে এ দিকে মনোযোগ দেবেন। এ সব সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় তৎপরতার প্রয়োজন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি যথাযথ সমন্বয় সাধন না করেন, যদি উৎসাহ না দেন বা নেতৃত্বে পরাঙ্মুখ হ'ন তবে এ তৎপরতার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এর জন্যে আবার দরকার কংগ্রেসের বলিষ্ঠ আইন, কিন্তু ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস বলিষ্ঠতার সঙ্গে এদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে অসমর্থ। ফলে তাঁর করায়ত্ত সমস্ত আয়ুধ দিয়ে রাষ্ট্রপতি সব ব্যাপারের সহজ মীমাংসা করবেন জনমতকে প্রবর্তিত করে আর কংগ্রেসকে উৎসাহিত করে এবং সমস্ত শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করে, এ প্রত্যাশা আজকের মত জরুরী কোনদিন ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভিতরেও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব আজকের মত অপরিহার্য আগে ছিল না। দ্রুত বিস্তারশীল বিজ্ঞানের ব্যাপক ও ব্যয়বহুল কার্যকলাপের যথাযথ সমন্বয় ও নির্দেশনার উদ্দেশ্যে কি পন্থা গ্রহণ করা যায় সে প্রশ্নের ক্লান্তিজনক আলোচনার আজ আর শেষ নেই। ক্লান্তি বৃদ্ধিতে আমার উৎসাহ নেই কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই বড় বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা, বিশেষ করে বিজ্ঞানসেবীরা, যদি বুঝতে পারেন যে, যে কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধানে রাষ্ট্রপতির খুব বড় ভূমিকা আছে তবে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে। তিনিই মুখ্য সর্বাধিনায়ক আর তাছাড়া বৎসরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যে চার বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয় তার আশী ভাগই জাতীয় নিরাপত্তামূলক কার্যাবলীতে ব্যয়িত হয়; তিনি প্রধান কার্যনির্বাহক, এ পর্যায়ে তাঁর কর্তব্য অন্যান্য সমস্ত সরকারী বিভাগের মতই—অর্থাৎ আয় ব্যয় এর হিসাব রাখা, খবরাখবর করা, কর্মচারী নিয়োগ করা ও তাঁদের তত্ত্বাবধান করা। তদুপরি তিনি হচ্ছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি, আর আমাদের জাতীয় স্বভাব হচ্ছে, আজ হোক বা কাল হোক আমাদের বড় বড় সমস্যা ওয়াশিংটন, লিঙ্কন আর রুজভেল্ট যে যখন পদাধিকারে অধিষ্ঠিত তাঁর সামনে উপস্থাপিত করা। এই জটিল সমস্যার সমাধান আমার জানা নেই, বা এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা তাও আমার অজ্ঞাত। আমি কেবল এইমাত্র জানি যে সমস্ত সমন্বয় সাধন করা, তত্ত্বাবধান করা হবে রাষ্ট্রপতিত্বের গুরুদায়িত্ব, উৎসাহিত করা, নির্দেশ দেওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা নাই বা তুললাম। আমি আরও জানি যে জেমস্ কিলিয়ান (ছোট) কে ১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে আইজেনহাওয়ার বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে বিশেষ সহযোগী হিসাবে নিয়োগ করে যে বলিষ্ঠ সমাধান আমাদের একদিন না একদিন করতেই হবে তার অভিমুখে এক মৃদু পদক্ষেপ করেছেন। পরে এই হয়তো কার্যনির্বাহক বিভাগের নতুন এক বিভাগ নয়তো এক বৈজ্ঞানিক বিভাগ আর নয়তো দৃঢ় শৃঙ্খলায় একত্রিত কতগুলো আন্তঃবিভাগীয় কমিটিতে পরিণত হবে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে প্রথম ও তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এর ফলে রাষ্ট্রপতির মুখ্য ভূমিকা অব্যাহত থাকবে ও এর ক্ষমতা আসবে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। যদি আগামী দিনগুলিতে

ওয়াশিংটনে এক বিজ্ঞানের জারের উদ্ভব হয়, তবে রাষ্ট্রপতিই বিলীন হয়ে যাবেন।

আশা করি এই যুক্তি উত্থাপন করে আমি হোয়াইটহাউস থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলছি এ কথা কেউ মনে ক'রবেন না। রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার এখনই খুব বেশী। এর উপর নভোমণ্ডলে প্রতিযোগিতা বা নতুন শক্তির উৎসের সন্ধান বা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টার গুরুভার অনতিবিলম্বে তাঁর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র; আর তাছাড়া আমাদের সমাজজীবনে বড বড় কাজ এ ভাবে সম্পাদিতও হয় না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই এ কথা বলছি যে অসংখ্য কেন্দ্রীয় সংস্থার এবম্বিধ নানারকম কার্য-প্রণালীকে সমন্বিত করার যে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে তার উপরই নির্ভর করছে গবেষণা ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে আর্থিক ও কায়িক সম্পদের যুক্তিপূর্ণ ও মিতব্যয়ী পরিচালনার সুচারু বন্দোবস্ত। রাষ্ট্রপতিকে মুখ্য বৈজ্ঞানিক হতে বলছি না আমি; আমেরিকার স্বার্থ বা বিজ্ঞানের উন্নতি এমন কি রাষ্ট্রপতির নিজেরও উন্নতি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে না। আমি খালি এ ব্যাপারের এক সহজবোধ্য সমাধানের কথা বলছি; এখন থেকে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিকে ভবিষ্যতের রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রশাসনকে কি করে এক ফলপ্রসূ শক্তির আকর করে তোলা যায় সে বিষয়ে প্রচুর সময় ও চিন্তা ব্যয় করতে হবে। তাঁকেই সক্রিয়ভাবে হতে হবে অসংখ্য বৃত্তে আবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ক্ষেত্রকে সমন্বিত করার মূল মর্মকেন্দ্র। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই প্রশাসনের ভিতরে ও বাইরে অজস্রমুখী কর্মধারার প্রয়োজন, কিন্তু সমন্বয়মূলক কোন মূল কেন্দ্র না থাকলে বহুমুখীত্ব অরাজকতায় পরিণত হতে বাধ্য।

জাতীয় বিজ্ঞানপরিষদ, আণবিক শক্তি কমিশন, জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সম্পর্কিত প্রশাসন, উন্নততর গবেষণামূলক কর্মপরিষদ এবং অন্যান্য সমস্ত বড বড সংস্থা ও কমিটি সময়ে সময়ে আমরা স্থাপন ক'রব সে সমস্তের মর্মকেন্দ্র আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকেই হতে হবে।

যেহেতু ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি বর্তমান রাষ্ট্রপতি থেকেই বেডিয়ে আসবেন আমাদেব এই আলোচনায় আর একটু অগ্রসর হবার প্রয়োজনীয়তা সেই জন্যই এই পদাধিকারের যে উজ্জ্বল চিত্র এই বইতে আঁকা হয়েছে তার সবটাই

ঠিক নাও হতে পারে। রাষ্ট্রপতিত্বের নির্ভরতা ও শক্তি সম্বন্ধে তীব্র আশা পোষণ করে আমি হয়ত যে সমস্ত সার্থকমনা সরকারী কর্মচারী ও তীক্ষ্ণধী রাজনীতিবিদ উৎসাহে ও বিজ্ঞতায় এর দুর্বলতার মূলগুলোকে উন্মোচিত করেছেন তাঁদের যুক্তিকে হাল্কাভাবে নিয়েছি। এখন এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা যাক। এ কিন্তু আমেরিকার প্রশাসনিক বিন্যাস সম্বন্ধে কোন আলোচনা নয়, আমেরিকার সমাজজীবনের ত নয়ই। আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের প্রাপ্য সমাজব্যবস্থাই আমাদের আছে : আমি আরও ধরে নিচ্ছি যে আমাদের সরকারের মূল কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। রাষ্ট্রপতিত্বের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রূপের উপরই আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি এবং তারপর শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বাস্তব ও কাল্পনিক যে সমস্ত দোষত্রুটি এর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন তার দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হচ্ছি। এই ত্রুটিবিচ্যুতির হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রস্তাবাবলী অধুনা আলোচিত হচ্ছে তাদের যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধেও কিছু ব'লব।

এদের মধ্যে জটিলতম হচ্ছে সুস্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জোড়াতালি দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করা আর অসুস্থ রাষ্ট্রপতির জায়গায় আর একজনকে অধিষ্ঠিত করার অনাবিষ্কৃত যথাযোগ্য পদ্ধতি। এই আলোচনায় দুটো পূর্ণ অধ্যায় ব্যয়িত হয়েছে। এক নির্ভীক ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া এ ব্যাপারে আমার আর কোন বক্তব্য নেই; যে শোচনীয় সঙ্কটের কথা ভেবে আমাদের বুদ্ধি প্রায় অর্ধেক লোপ পায় সে রকম কিছু না ঘটলে আগামী বছরগুলোতে এ ব্যাপারে কিছুই আর করা হবে না।

রাষ্ট্রপতিত্বের তৃতীয় বৃহত্তম ত্রুটি যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে পদাধিকারীর অসহনীয় কর্মভার। তিনি আমাদের হয়ে যে সব বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রীয় কর্মধারা পরিচালনা করেন তার কথা আমি এখানে বলছি না কারণ, এর কোনটাকেই কি করে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোন কার্যাধ্যক্ষের হাতে নিরাপদে ও কার্যকরীভাবে সপে দেওয়া যায় আমার জানা নেই। যুদ্ধ, শান্তি, রাজনীতি, জনমত, অনুষ্ঠান ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত ক্ষমতা ত্যাগ করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা গেলে সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দেবে। আমি এ সমস্ত কার্যাবলীর রুটিনের কথাই বলছি : আইনে এবং

প্রথায় যে সমস্ত কাজ যান্ত্রিকভাবে তাঁকে করতে হয়—পরামর্শ দেওয়া, নিযুক্তি-করণ, বক্তৃতা, সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ ও সর্বসাধারণের সমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করা, চিঠির উত্তর দেওয়া ও সই করা—সে সবের বিষয়েই আমার বক্তব্য। তাঁর মূল দায়িত্বকে খর্ব না করে ছোটখাট ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি অনেক কিছুই করা হয়েছে এবং ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যে তাঁদের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পেরেছেন এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তবু অনেক কিছু করা বাকী। আমরা আশা করব ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস ও কার্যনির্বাহক সংস্থা মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতিত্বকে পুঙ্খানু-পুঙ্খতার পক্ষাঘাত থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হবেন। ১৯৫০ সনে কংগ্রেস এক সংক্ষিপ্ত আইনে রাষ্ট্রপতির উপর আইনতঃ ন্যস্ত দায়িত্বভারের আংশিক বণ্টনের বন্দোবস্ত করেছিল, আইজেনহাওয়ার এই ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে শত শত ছোটখাট দায়িত্ব ছেটে ফেলেছিলেন। বলা বাহুল্য এগুলো রাষ্ট্রপতির উপর চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার আমাদের ছিল না। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি ভবিষ্যতে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি তাঁর মুখ্য সহযোগীদের হাতে ক্ষমতা বণ্টন করার চেষ্টা করেই যাবেন।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার লাঘব করার প্রসঙ্গে উড্রু উইলসনের সাবধানবাণী স্মর্তব্য: সাধারণ স্বাস্থ্য ও সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভার লাঘব করা না হলে রাষ্ট্রপতি হিসাবে বেঁচে থাকতে পারবেন না। সুতরাং সব সময়েই মুখ্য কার্যাধ্যক্ষের অন্বেষণে আমাদের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যায়ামবীরদের শরণাপন্ন হতে হবে, সংখ্যায় তাঁরা অগুণতি নন। আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে যে রুটিন মাফিক কাজই অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলেও রাষ্ট্রের বৃহৎ বৃহৎ দায়িত্ব পালনে পদাধিকারীকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম। যদি উপরাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ভ্রমণ ও ছোটখাট উৎসবের দায়িত্ব অর্পণ করেন তবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায় সার্থক হতে পারবেন না। যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কংগ্রেস সদস্যদের বক্তব্য শুনতে ইচ্ছুক না হন তবে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে তিনি পারবেন না এবং প্রতিরক্ষা বাজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে না পারলে শক্তিশালী মুখ্য সর্বাধিনায়ক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমাদের মতই কঠিন ও অসৃজনশীল শ্রমের হাত থেকে তাঁর মুক্তি নেই। ১৯৫০ সনের যে আইনের কথা এইমাত্র বলেছি

সেই আইন প্রণয়নকালে কংগ্রেস সদস্যরা বলেছিলেন : তাঁর হয়ে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য তিনি যাঁদের নিয়োগ করবেন তাঁদের কাজের ফলে রাষ্ট্রপতির মূল দায়িত্ব কোনপ্রকারেই কমে যাচ্ছে না। ট্রুম্যানের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে রাষ্ট্রপতি ছোটখাট ব্যাপার এড়িয়ে যেতে পারেন, মূল সমস্যা এড়াতে পারেন না।

কার্যনির্বাহক সংস্থার সমস্যাও কম নয় যদিও ১৯৩৯ সনের এলোপাথাড়ি বন্দোবস্তের চেয়ে বর্তমান অবস্থা প্রভূতপরিমাণে উন্নত। রাষ্ট্রপতি এখনও এই সংস্থার প্রশাসনিক ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন নি। কার্য-নির্বাহক সংস্থার বিভিন্ন প্রশাখা স্থাপনে পুনঃ সংগঠনে বা অবলুপ্তিতে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা উচিত এবং প্রত্যেক প্রশাখার আভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার ক্ষমতা ও তাঁর থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান পার্সোনেল অফিসার (Chief Personnel Officer) হিসাবে যে অসংখ্য দায়িত্ব তাঁর আছে সে সব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কার্যনির্বাহক বিভাগের ভিতরে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত এখন পর্যন্ত হয় নি। তৃতীয়তঃ একটি বা কয়েকটি কর্মচারী সংস্থা যে তাঁর বহুমুখী কর্মধারাকে সমন্বিত করায় সাহায্য করবে সে আশাও এখন পর্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেছে।

কার্যনির্বাহক সংস্থার আসল সমস্যা কিন্তু সম্ভাবনার স্তরেই আছে এখনও বাস্তব হয়ে উঠে নি। তা হচ্ছে এই আশঙ্কা যে রাষ্ট্রপতি তাঁর যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে পড়বেন। রাষ্ট্রপতিত্বের আনুষ্ঠিকতাকে এমন স্তরে নিয়ে ফেলা সম্ভব যার ফলে পদাধিকারী নিজগৃহে বন্দী হয়ে থাকবেন—অতি বিস্তৃত ও অতি দুষ্পরিবর্তনীয় এক সংস্থার শিকার। যদি এ রকমটা ঘটেই তবে তা যে দীর্ঘস্থায়ী হবে আমি এমন মনে করি না। এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন সর্বকালের জন্য দেখিয়ে গেছেন যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি আইন ও প্রথার নিষেধের বেড়াজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার সহজ-সরল বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম। তবু এক জ্যাকসন এসে ওয়াশিংটনের আকাশে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার সৃষ্টি করবেন এ প্রত্যাশা না করে আমরা বরং রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ নানাবিধ কর্মসংস্থার উপর তাঁর কর্তৃত্ব যে সব ক্ষেত্রে খর্ব হয়ে যাবার সম্ভাবনা সে সমস্ত ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দোব। অনেকটাই নির্ভর করবে তাঁর অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতাদের উপর। স্বীয় এলাকায় একমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয়

সমস্যা ছাড়া অন্য ব্যাপার থেকে রাষ্ট্রপতিকে অব্যাহতি দেবার দায়িত্ব তাঁদের, সমস্যা তাঁর সামনে সহজবোধ্যরূপে উপস্থাপিত করার দায়িত্বও তাঁদেরই আর বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাবনার মধ্য থেকে একটা বেছে নেবার স্বাধীনতা রাষ্ট্রপতিকে আবার তাঁরাই দেবেন। বলা বাহুল্য কার্যনির্বাহক সংস্থার কর্মধারা রাষ্ট্রপতিই ঠিক করে দেবেন। চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সাপেক্ষে রুটিন মাফিক কার্যাবলী হতে অব্যাহতি পাবার অধিকার তাঁর থাকবে, তবে এও তাঁর মনে রাখতে হবে যে তিনি সরকারের দায়িত্বশীল কর্ণধার। তাঁর সহযোগীদের পরামর্শ ও মতামতের দ্বারা অস্বাভাবিকভাবে যাতে প্রভাবান্বিত না হন সে দিকে সজাগ দৃষ্টি তিনি রাখবেন, কারণ তা না হলে তিনি দ্রুত বাস্তবসম্পর্কচ্যুত হয়ে যাবেন। সর্বোপরি, যে সমস্ত ব্যাপারে চিন্তা উত্তেজিত হয়ে ওঠে বা ভাবপ্রবণতার আত্মপ্রকাশ হয় সে সমস্ত ব্যাপারে রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীরা যাতে তাঁকে পরামর্শ দিতে সমর্থ হয় তার জন্যে দরজা খোলা তাঁকে রাখতে হবে। অবাঞ্ছবোচিত দর্শন-প্রার্থী, আক্রমণমুখী সংবাদপত্র ও অবাধ সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে এ রকম তিনটি দরজা যা বন্ধ না করে দেবার মত দূরদৃষ্টি ও সাহস রাষ্ট্রপতির থাকা দরকার। রাষ্ট্রপতিত্ব এমন কোন ব্যাপক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হলে চলবে না যার ফলে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বজনিত ক্লেশ ও মর্যাদার হাত থেকে রাষ্ট্রপতি রেহাই পেতে পারেন।

কার্যনির্বাহক সংস্থার কোন স্থায়ী আঙ্গিক থাকা বাঞ্ছনীয় হবে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিরই এমন ক্ষমতা থাকা দরকার যার ফলে তিনি প্রয়োজনীয় অদল বদল সব সময়েই করতে পারেন। এমন কি বাজেট ব্যুরোকেও তাঁর স্পর্শমুক্ত করলে চলবে না। "রাঙা রাণী"র মত রাষ্ট্রপতিও নিজজায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য যতটা দৌড়ঝাঁপ দেওয়া উচিত দেবেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য গোটা ছয়েক পুনর্বিন্যাস তাঁকে করতেই হবে। এই প্রধান ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার। কার্যনির্বাহক সংস্থার বিস্তৃতির একটা বাইরের দিকের সীমা আছে যা লঙ্ঘন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রাষ্ট্রপতি যাতে প্রশাসনের তদারকি করতে পারেন তার জন্যে একে যথেষ্ট পরিমাণে বড নিশ্চয়ই হতে হবে, কিন্তু এত বড় হবে না যার ফলে তদারকিতে বাধা উপস্থিত হয়। পর্যাপ্ত সংখ্যায় কার্যাধ্যক্ষ, সংস্থা ও কমিটি এর থাকবে যাতে রাষ্ট্রপতি কোন সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা বোধ করবেন না,

কিন্তু এত বেশী সংখ্যায় থাকবে না যার ফলে এরাই তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। হোয়াইটহাউসে ও এর আশেপাশের প্রশাসনে সম্ভবতঃ কমিটি কেন্দ্রিকশাসনের শেষ সীমা দেখা যাচ্ছে।

অন্ততঃ তেত্রিশ বছর ধরে ক্যাবিনেট একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে—জর্জ গ্রাহামের ভাষায় এক রক্তক্ষয়ী রক্তহীন রোগী। কেবল কড়া নজির ও অতীত মর্যাদা একে নিঃশব্দ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। রাষ্ট্রের বড় বড় সমস্যায় উচিত পরামর্শ পাবার আশায় রাষ্ট্রপতি আজ আর এর উপর নির্ভর করতে পারেন না। আনুষ্ঠানিক সংগঠনেও এ আর রাষ্ট্রপতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ সহযোগীদের মিলনক্ষেত্র নয়। এ হচ্ছে অনাড়ম্বর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বিশেষ। এমন এক সময়ের যখন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অসঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আছে বলে মনে করা হ'ত এবং তাঁরা তাঁদের হাতে প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখতেন।

অবশ্য আইজেনহাওয়ার ক্যাবিনেটকে পূর্ণ দায়িত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টার ক্রটি রাখেন নি। বাজেট অধ্যক্ষ ও অসামরিক নিয়োগ কমিশনের সভাপতি প্রমুখ দায়িত্বপূর্ণ কার্যাধ্যক্ষদের নিয়মিতভাবে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। অন্যান্য রাষ্ট্রপতিরা অস্পষ্টভাবে যার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতেন তিনি কার্যে তা রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন—কাজের সুবিধার জন্য, কাগজপত্র ঠিক রাখার জন্য ও কোন সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এক ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চেয়েছিলেন। একটি উপক্যাবিনেট স্থাপন করে ক্যাবিনেটকে সাহায্য করা ছাড়াও তিনি বিশেষ সমস্যার আলোচনা করার জন্য ক্যাবিনেট কমিটিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর কার্যকালে এদের কার্যের পরিধি বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য দান করা থেকে আরম্ভ করে ধূমপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টেলিভিশনে এর কোন বৈঠকে উপস্থাপিত করে তিনি এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচকিত করে দিয়েছিলেন। ফল কিন্তু এ রকম উল্টোই হয়েছিল, জাতি বুঝতে পেরেছিল যে এই সংস্থার কোন কার্যকারিতা নেই—যেমন করে রেডিয়োর বোতাম টিপে অনুষ্ঠান পরিবর্তন করা যায়, ক্যাবিনেটকেও তেমনি করে উল্টে দেওয়া যায়। ট্রুম্যান জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাকে ব্যবহার করতেন সামরিক ও বহির্বিষয়ক

ব্যাপারে, সাহায্যের প্রয়োজনে আইজেনহাওয়ারও তাই করতেন (এবং একে টেলিভিশনের সামনে তুলে ধরা হয় নি)। আর ক্যাবিনেটকে ছেড়ে দিতেন আভ্যন্তরীণ, প্রশাসনিক ও রাজনীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে সঙ্কীর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্যে। যে গোষ্ঠী জাতীয় নিরাপত্তার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বা যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে অসমর্থ তাঁকে অতীতের ক্যাবিনেটের সঙ্গে তুলনা করে রাষ্ট্রের এক মহৎ সংস্থা বলে অভিহিত করার চেষ্টা নিরর্থক।

ক্যাবিনেটে পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। আইজেনহাওয়ার বহুদিন ধরে প্রবাহিত ভাঁটার স্রোতে জোয়ার আনতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এটা খুবই সম্ভব যে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই জনস্রোতকে প্রার্থিত দিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির যথাযথ পরামর্শ দরকার! হোয়াইটহাউসে ও সরকারে প্রশাসনিকনীতির সমন্বয় করার জন্যে তাঁর দরকার নানা সংস্কার। তবু এটা পরিষ্কার যে এই দুইটি কর্তব্যে ক্যাবিনেট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত কৃতকার্য হতে পারে না। রাষ্ট্রপতির আসলে দরকার কতগুলি বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব বিশিষ্ট ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট কেন্দ্রিক কমিটির; এদের প্রত্যেকের থাকবে এক একটি সেক্রেটারিয়েট যার প্রধান হবেন হয় রাষ্ট্রপতি নয়তো তাঁর সহযোগী। অনেক দিন ধরে চালু থাকার জন্যে ক্যাবিনেটকে গুটিয়ে ফেলা শক্ত, এর সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণিত করে একে একটি প্রিভিকাউন্সিলে রূপান্তরিত করলে ভাল হবে। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এ মিলিত হবে—যে সমস্ত উপমন্ত্রণা পরিষদে এর সদস্যরা সংশ্লিষ্ট থাকবেন তাদের মিলনক্ষেত্র হবে এই প্রিভিকাউন্সিল। যদিও কল্পনার বল্গা আল্গা করে দিয়েছি তবু আমার বিশ্বাস ক্যাবিনেটের ভবিষ্যৎ এই দিকেই।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এবং প্রতিশ্রুতিও সম্পন্ন কর্তব্যের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাই রাষ্ট্রপতিত্বের সাধারণ স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে ফেলছে। জাতীয়প্রশাসনের বিশ লক্ষেরও বেশী কর্মচারীর নীতিবোধ, আনুগত্য, দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি দরদ বোধের জন্য রাষ্ট্রপতিকেই মুখ্যতঃ দায়িত্ব নিতে হয়, এ কথা প্রথম অধ্যায়েই বলেছি। তিনিই প্রধান কার্যনির্বাহক সরকারের দায়িত্বের মুখ্য পরিচালক এবং সেই পদাধিকারী যিনি সংবিধানের বিধানবলে আইন যথাযথভাবে প্রতিপালিত

হচ্ছে কিনা তা দেখবেন। তবু প্রশাসনের উপর তাঁর কর্তৃত্ব তাঁর দায়িত্বের গুরুভারের তুলনায় বেশ কম। অনেক স্বয়ং স্বাধীন সংস্থার হাতে নানারকম প্রশাসনিক দায়িত্ব আইনের দ্বারা সমর্পিত আবার সময়, অবস্থা বৈগুণ্য ও রাজনৈতিক দলাদলির ফলে অনেক প্রশাসনিক কর্তব্যই কতগুলো ব্যুরো ও সংস্থার হাতে চলে গিয়েছে যাদের উপর হস্তক্ষেপ করলে রাষ্ট্রপতির সমূহ বিপদ। কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটি কংগ্রেসেরই তোয়াক্কা করেন না, তারাই এ রকম নানাবিধ সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর বিভাগীয় প্রধানদের তুলনায় অনেক বেশী নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। আইন করে অনেক সময় তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে প্রত্যক্ষভাবে গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে; আর সেই সঙ্গে ব্যয়বরাদ্দের দাবি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা বা রাষ্ট্রপতি নিজে স্বাধীনভাবে কোন খরচই করতে পারেন না। যেখানেই রাষ্ট্রপতি শৃঙ্খলা স্থাপন বা তদারকি করতে যান সেখানেই তিনি বহুধাবিভক্ত কর্মধারা, ঐতিহ্য, দলীয় সংঘাত, পেশাগত স্বার্থ ও কর্মোদ্যোগহীনতার নাগপাশে বন্দী হয়ে পড়েন।

এ ক্ষেত্রেও সম্প্রতি কিছু উন্নতি হয়েছে যদিও প্রশাসনিক স্ফীতির সঙ্গে তাল রেখে এ উন্নতি হয়েছে কিনা তা তর্কের বিষয়। কার্যনির্বাহক সংস্থার সঙ্গে বাজেট ব্যুরোকে যুক্ত করা একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ কারণ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদি এর সাহায্য না পাওয়া যেত তবে রাষ্ট্রপতিত্ব অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। এখানেও অনেক কিছু করণীয় আছে, প্রথম হুভার কমিশন জাতিকে সেই কথাই প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁরা এই সমস্যা অনুভব করেছেন ও পরে ঘরে বসে এর সম্বন্ধে কিছু লিখতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁরা স্বীকার করেছেন যে নিম্নলিখিত আয়াসসাধ্য পন্থা গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে সার্থক হয়ে উঠবেন।

কার্যনির্বাহকবিভাগকে পুনর্গঠিত করার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে আইন করে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের অসম্মতি জানাবার ক্ষমতা থাকবে। তারপর তিনি প্রশাসনের সর্বত্র তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন।

যাঁদের অস্তিত্বের কোন যুক্তিসহ রাজনৈতিক কারণ পর্যন্ত নেই সেই সমস্ত স্বাধীন কোষগুলোকে সংখ্যায় কমিয়ে আনতে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য

করবে, দু'পক্ষ মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ তদারকির এক্তিয়ারভুক্ত কার্যাধ্যক্ষদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলবে।

আইন প্রয়োগকারীদের অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়ার প্রলোভন থেকে আইনকে বাঁচিয়ে রাখবে কংগ্রেস। রাষ্ট্রপতি নিজেই প্রশাসনের সর্বত্র নীতির সমন্বয়ের জন্যে বিভিন্ন উপদল ও পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন।

স্বাধীন নিয়ামক কমিশনগুলো সম্বন্ধে একেবারে নতুন ক'রে ভেবে দেখতে হবে এবং তারপর এদের কেবল কার্যনির্বাহমূলক দায়িত্বকে আরও পরিষ্কারভাবে রাষ্ট্রপতির খবরদারির মধ্যে আনতে হবে।

কার্যনির্বাহক বিভাগের সঙ্গে এই কমিশনগুলোকে একেবারে একত্রিত করলে ভুলের ফসলই বাড়বে, কিন্তু "সরকারের মুণ্ডহীন চতুর্থ প্রশাখায়" আরও ফলপ্রসূ নির্দেশনার জায়গা রয়েছে।

জাতীয় সরকারের কর্মচারী সম্পর্কিত প্রশাসনের সর্বত্র আমূল পরিবর্তনের দাবি রাখে। একদিকে থাকবে কার্যনির্বাহক সংস্থার মধ্যেই এক সংস্কৃত অসামরিক নিয়োগ কমিশন; আর একদিকে বিভিন্ন বিভাগ ও কমিশনপ্রধানদের হাতে কর্মচারী নির্বাচন করা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে কার্যধারার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

এই ঘোলাটে ব্যাপারে আদর্শ বন্দোবস্তের কথা যাঁরা বলেন তাঁদের কথা শুনলে আমাদের চলবে না; যে ব্যক্তির কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা তদারকি প্রত্যাশা করি তাঁর কাছে খুব বেশী চাওয়া উচিত হবে না। উদ্যমহীনতা আর প্রথানুরক্তি প্রত্যেক মানবিক সংগঠনেই দেখা যায় এবং সময়ে সময়ে তা ভাল ফলও দেয়। প্রশাসকের পেশাগত অভিজ্ঞতা আর রাজনৈতিক নেতার নির্বাচন সচেতনতার মধ্যে লক্ষ্য নিয়ে সংঘাত অনিবার্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অনেক ব্যাপারে সঙ্গতভাবেই অনেক সরকারী কাজ সামগ্রিক পরিচালনা ব্যতিরেকেই সম্পন্ন করতে হয়। প্রশাসনের নিশ্ছিদ্র পিরামিডের কল্পনা আমাদের সম্মোহিত করতে পারে কিন্তু ত্রুটিহীন প্রশাসনই সব সময়ে ভাল ফল দেয় এ চিন্তা সঠিক নয়; প্রতিযোগিতা আর দ্বন্দ্বেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যতদিন কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির বন্দোবস্ত চালু থাকবে ততদিন প্রশাসনের উপর কংগ্রেসের সক্রিয় কর্তৃত্ব থেকেই যাবে এবং আমরা জানি যে তার ফলে কল্যাণ আসতে পারে। সবচেয়ে

জরুরী এ কথাটা মনে রাখা যে ভাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করার নিরাকার দায়িত্ব ছাড়াও রাষ্ট্রপতির আরও অন্যান্য দায়িত্ব রয়েছে এবং এর অনেকটাই হস্তান্তরযোগ্য নয় বা অগ্রাহ্য করার মত নয়।

তাঁর আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং প্রধান কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি যদি অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অপরিসীম সাফল্য লাভ করেন তবে ধরেই নিতে হবে যে মুখ্য কূটনীতিক বা সর্বাধিনায়কের গুরুদায়িত্বে তিনি অবহেলা প্রকাশ করছেন।

প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সময় এসেছে। যদি তাঁর কর্তৃত্ব না বাড়াতে পারি তবে দায়িত্ব কমিয়ে ফেলা উচিত হবে। প্রশাসনের প্রত্যেক ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমরা এখনো তাঁকেই দোষী করি এটা ঠিক নয়। আইন ঠিকমত প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা দেখার যে চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁর আছে সংবিধানসম্মত উপায়ে বা কার্যকরীভাবে তা তিনি কখনোই ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সততা ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত তিনি রাখবেন, জাতির কার্যবিধি পরিচালনার জন্য দক্ষ লোক নিয়োগ করবেন, তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব ব্যাপকভাবে বণ্টন করে দেবেন ও সহযোগীদের বিশ্বস্ত ভাবে সমর্থন করবেন, মুখ্য সহযোগীদের মাধ্যমে স্পষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবেন ও শালীনতাবোধ এবং গণতন্ত্রের ব্যত্যয় কারীদের কঠিন শাস্তি দেবেন—এ ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অনুচিত হবে। প্রধান কার্যনির্বাহকের ভূমিকা পরিগ্রহকারী রাষ্ট্রপতির প্রতি আমাদের আরও সহনশীল হতে হবে।

ওয়াশিংটনের প্রশাসনের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। এই বিতর্ক প্রবল উৎসাহের সঙ্গে এখনো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু আলোচনা সঠিক পথে চলছে না। সমালোচনার অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এই রূঢ় সত্য মনে রাখা হচ্ছে না যে অনেক আগেই আমরা একক সরকারের বিকল্প হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের অপরিবর্তণীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিতর্কের অনেক অংশই আবার খুব দুর্বল কারণ এ রকম সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব তাঁর উর্ধ্বে এ সমালোচনা চালানো হচ্ছে না। তবু অনেকটাই বেশ প্রাসঙ্গিক এবং দুই বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতির আশা ত্যাগ করা উচিত হবে না।

প্রথমতঃ কংগ্রেসের উপর রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব অনেকটা খাপছাড়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। যদিও আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপক স্বীকৃতি রয়েছে তবু চল্লিশ বছর আগের অনুসৃত পদ্ধতির তুলনায় আজও তাঁর কংগ্রেস সদস্যদের বিশেষভাবে প্ররোচিত করার ক্ষমতা একতিলও বাড়ে নি; আইনের খসড়া তৈরী করা, কংগ্রেসে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা, ও আইনবিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করার ক্ষমতা অবশ্য আগের তুলনায় বেড়েছে। প্রশাসনের মত এ ক্ষেত্রেও জনসাধারণের প্রত্যাশা আর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে এক বিস্তৃত ব্যবধান রয়েছে। রাষ্ট্রপতির একটি নির্দিষ্ট কার্যসূচী থাকতেই হবে এবং তা আইনে রূপান্তরিত করতে তিনি সচেষ্টও হবেন, কিন্তু অনিচ্ছুক কংগ্রেসের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।

কংগ্রেসের উপর রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বকে সুগঠিত করতে ও তাঁর প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে গোটা বারো বা তারও বেশী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রস্তাব বেশ বেহিসাবী আবার কিছু সুরে বেশ নরম। পরিষদ সদস্য পেণ্ডেলটনের পুরাণো প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে সেনেটের কেফাভার দুই কক্ষেই বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তরের সময়ের ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ জানিয়েছেন। অধ্যাপক কর্‌উইন মনে করেন যে রাষ্ট্রপতি যদি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্য থেকে কিছু ক্যাবিনেটে নিয়ে আসেন তবে এক উল্লেখযোগ্য ঐক্যসূত্র রচিত হবে। ১৯৪৬ সনের লাফলেট-মনরোনি কমিটি সুপারিশ করেছিল যে ক্যাবিনেট কার্যাধ্যক্ষ এবং কংগ্রেসীয় নেতাদের এক যৌথসংস্থায় জাতীয়নীতি নির্দ্ধারিত হোক এবং এর দ্বারাই তা কার্যকরী করা হোক। কিছু কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দায়িত্বশীল দলীয় সরকারের চিন্তায় বিভোর; অন্যেরা আবার প্রত্যেক বড় বিভাগ ও এজেন্সির কার্যালয় ও কমিটির প্রতিফলন সমান্তরালভাবে কংগ্রেসে দেখতে চান।

প্রস্তাবগুলো সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত সন্দেহ নেই এবং এদের মধ্যে যৌথপ্রস্তাবের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহক তথা ব্যবস্থাপকসংস্থা স্থাপনার প্রস্তাবনা কার্যকরী হবার দাবি রাখে। অধিকাংশই অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিদীপ্ত বা সহজসাধ্য মনে হলেও আসলে বেশ জটিল এবং গ্রহণ করা হলে এদের মধ্যে কিছু আবার প্রত্যাশিত ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তই স্থাপন করবে। বিশেষ করে

রাষ্ট্রপতির যে নেতৃত্ব অনেক পরিশ্রমের ফলে প্রথা নিবদ্ধ হয়ে গেছে তার বিপুল ক্ষতি খুবই সম্ভব।

এই দুই মহৎ রাজনৈতিক বিভাগের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করণীয় নেই? এর উত্তর হবে যে সমস্ত তথ্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে তা অস্বীকার করে কিছু করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ আমাদের জাতীয়জীবনে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্কে যে স্বভাবজ স্নায়ুক্ষয়ী দ্বন্দ্ব রয়েছে, এলোপাথাড়ি প্রতিবিধানের নিদানে তা না কমে বরং বেড়েই যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ডব্লু. ওয়াই. ইলিয়ট্, টমাস. কে. ফিনলেটার ও ডেভিড লরেন্স অনুমোদিত ব্যবস্থাপক বিভাগ কেন্দ্রিক সরকার (পার্লামেণ্টারি), এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, রোগীরাও এ রকম নিদানের বশবর্তী কখনো হবে না। তৃতীয়তঃ আমাদের পদ্ধতির সুকঠোর রক্ষাকবচ আর বৃটিশ পদ্ধতির সুললিত সামঞ্জস্য দুই জগতের এই ভালটুকু খালি বেছে নেব তা সম্ভব নয়। উপমা সম্প্রসারিত করে বলা যায় পিতামাতার ভালটুকুই শুধু নিয়ে কোন সন্তান আবির্ভূত হয় না। পরিশেষে বক্তব্য, বিবাদ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ক্লেশকর যে চিত্র আমরা দেখি তার মূল সংবিধানের বাইরে অনেক গভীরে নিহিত। যাঁরা মনে করেন এই ক্লিষ্টতা অসুস্থতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যার নিরাময় করা সম্ভব তাঁরা সরকারী শাসনব্যবস্থার বাইরে রাজনীতি এমন কি সমাজজীবনকে পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব নিচ্ছেন ধরে নিতে হবে—অর্থাৎ কিনা অন্যভাবে বললে বিজ্ঞ-ব্যক্তিদের "হাত পা ছড়িয়ে অপ্রতিরোধ্যকে স্বীকার করে নেওয়া" উপদেশ মেনে নেওয়াই তাঁদের ভাল।

এই শতাব্দীর সার্থক রাষ্ট্রপতিদের পরিচিত পথ অনুসরণ করলেই কার্যনির্বাহক তথা ব্যবস্থাপক বিভাগের সম্পর্কের স্থায়ী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলায় আমরা সাহায্য করব। এই পথ অনুসরণ করেই, এমন কি ক্ষুদ্র দলাদলির পাঁকের মধ্য থেকেই আমরা এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছি যার ফলে ১৯০০ সনের তুলনায় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সহযোগিতার পথ অনেক বেশী প্রশস্ত হয়ে গেছে। ক্ষেপে ক্ষেপে, সংকটের পর সংকটের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরের সুধীজনেরা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতিরাও পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এই শিক্ষা অনন্তকাল ধরে চলবে কারণ

কালের পরিপ্রেক্ষিতে চালাকি নয়, পরন্তু সুস্থ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই যে সহযোগিতার প্রত্যাশা আমরা করি তা সার্থক হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যবর্তী পথের অপর দিকেই এখন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি বেশী পরিমাণে নিবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি যখন আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দাবি করছেন, কংগ্রেস সেই সময়েই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতার দাবি নিয়ে সমুপস্থিত এবং কংগ্রেস যে রাষ্ট্রপতির তুলনায় সম্প্রতিকালে সীমা বেশী লঙ্ঘন করেছেন এই অভিযোগের স্বপক্ষে বেশ যুক্তি আছে। প্রশাসনিক ব্যাপারে স্বাধীন ব্যবস্থাপক বিভাগের স্বতঃসিদ্ধ কর্তৃত্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারী কার্যে নীতিপরায়ণতা, আনুগত্য, দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে কংগ্রেসেরও উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক; এ নিজেই ঠিক করবে আইন বিশ্বস্তভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা। কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে মতদ্বৈধ হলে কংগ্রেস সমান জোর দিয়েই নিজের সাংবিধানিক অধিকার দাবি করতে পারে এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু কার্যনির্বাহক বিভাগের কোন অংশের দায়িত্ব নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে আসার কোন নৈতিক এমন কি সম্ভবতঃ সাংবিধানিক ক্ষমতাও কংগ্রেসের নেই। অনুসন্ধান করা, গলদ প্রকাশ করা, উৎসাহিত করা এবং সতর্ক করে দেওয়ার ক্ষমতা এর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু নির্দেশ দেওয়ার কোন ক্ষমতাই নেই অথচ বিভিন্ন সংস্থা ও কার্যাধ্যক্ষকে সরাসরি নির্দেশই কংগ্রেস খুব বেশী করে আজকাল দিচ্ছে। ফলে সরকারী কাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, প্রতিবাদ, অব্যবস্থিতচিত্ততা ও নীতিহীনতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সমগ্রভাবে কংগ্রেস কেবল অকর্মণ্যতা দোষে দুষ্ট। কংগ্রেসের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে কমিটিতে, উপ-কমিটিতে এবং একাকী নেকড়ের মত রাজনৈতিক শালীনতা ও সাংবিধানিক সততার সীমা লঙ্ঘন করে সব ব্যাপারেই অনুসন্ধিৎসু নাক গলাতে অভ্যস্ত। সেনেটের ম্যাকার্থি যখন অস্বাভাবিক হঠকারিতার সঙ্গে কার্যনির্বাহক বিভাগের গুপ্তখবর বার করার অধিকার দাবি করেছিলেন সেই সময় কার্যনির্বাহক বিভাগের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অসঙ্গত কংগ্রেসীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল নিন্দাধ্বনি উত্থিত হয়েছিল। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল যে ম্যাকার্থি ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা হয়ত কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির পারস্পরিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রথানিবদ্ধভাবে যে অস্পষ্ট কিন্তু দ্রষ্টব্য ভেদরেখা

আছে তার স্থায়ী ক্ষতি সাধন করবেন। এই সেনেট সদস্যর গৌরব রশ্মি ম্লান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতির উত্থান ঘটেছে ও তার ফলেই এই বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে পুরানো ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু লোক মনে করেন যে আইজেনহাওয়ার বেকায়দায় পড়েই এই ভেদরেখাকে বেশী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অথবা বেকায়দায় পড়ে গেছেন এমন লোকদের রক্ষা করতে আইজেনহাওয়ার অনিচ্ছুক থাকার জন্যই এ ব্যাপারটা ঘটে গেছে; প্রশাসনের বিশৃঙ্খলা দূর করতে একটা বিশেষ সীমা অতিক্রম করে যে বেশী অগ্রসর হওয়া যাবে না এ উপলব্ধি অনেক কংগ্রেস সদস্যর হয়েছে বলে শুনতে পাচ্ছি। আমরা অবশ্য পরিষ্কারভাবে জানি যে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সহযোগীদের দায়িত্ব হচ্ছে কংগ্রেসকে কার্যনির্বাহক বিভাগের সীমার বাইরে রাখা। ব্যবস্থাপক বিভাগের প্রত্যেক পরিষদই কাণ্ডজ্ঞান ও সাহসের পরিচয় দিয়ে নিজ নিজ লুণ্ঠনবাজদের সংযত রাখবেন এ চিন্তা চিত্তাকর্ষক কিন্তু যতদিন না আত্মসংযমের কংগ্রেসীয় স্বর্ণযুগের অভ্যুত্থান হচ্ছে ততদিন শক্তিই শক্তিকে সংযত রাখতে পারে—এই সত্যেই আমরা আস্থা স্থাপন ক'রব। যাঁরা সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে দুর্নামের পথে বেপরোয়া পদক্ষেপ করছেন বা যথার্থই কোন মন্দ কাজের বিচার প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁদের আইনসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগে সাংবিধানিক সীমারেখার মধ্যে সংযত রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। কংগ্রেসের ক্ষমতা স্বীকার তিনি নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু স্বীয় ক্ষমতা জাহির করতেও ভুলবেন না।

নিম্নলিখিত পরীক্ষিত নিদান প্রয়োগ করে তিনি এ ব্যাপারে সাফল্যলাভ করতে পারেন; অধীনস্থ কর্মচারীদের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের আছে এরকম বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিরা কাজ কিভাবে করা হচ্ছে সে বিষয়ে অবশ্যই জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। এর ফলে এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়ঃ—অনুসন্ধানকারী ও অধঃস্তন কর্মচারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি স্বীয় অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের পটভূমিকায় কংগ্রেসীয় কমিটিগুলোকে যথাসাধ্য প্রশ্নের জবাব দেবেন। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে মেজর পেরেসকে কে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেনেটর ম্যাকার্থির এই প্রশ্ন করার অধিকার আছে তা আমরা স্বীকার করছি না; প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে কে—দায়িত্বশীল প্রধান কার্যাধ্যক্ষ এবং তাঁর অনুচরেরা না একদল হতভম্ব ও পরিশ্রান্ত কর্মচারী? যাঁদের কৃতকার্যের

জন্যে তিনি সংবিধানানুযায়ী ও আইনতঃ দায়ী—তাঁদের আনুগত্যের উপর দাবি, দায়িত্বশীল এই প্রধানই অবশ্য রাখবেন, লণ্ডভণ্ডকারী কোন সেনেট সদস্য নয়। একজন শীর্ষ প্রশাসকের তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের হয়ে কথা বলার বা তাঁদের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং সংযত করার যে ক্ষমতা আছে তারও রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক একটা সীমারেখা আছে। তবুও আমাদের সাংবিধানিক ক্ষেত্রে যতদিন না এই সার্থক পুরানো নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যবর্তী পথের এই প্রান্তে শান্তির জয়ধ্বনি শোনা যাবে না।

কংগ্রেসের গলদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে জাতীয় আইনসভার আভ্যন্তরীণ শক্তি যদি বাড়ে তবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ব্যবহারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হবে। তাঁর বন্ধুরা কংগ্রেসের কার্যব্যবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাব করেছেন তার অধিকাংশ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতির ভয় পাবার কোন কারণ নেই বরং তাতে তাঁর ভালই হবে। প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁর আইন-সম্মত অধিকারের ক্ষেত্রে কোন অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা কংগ্রেস সমগ্র-ভাবে সৃষ্টি করেনি। ছোট ছোট উপদল এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তিবর্গ বে-আইনি দেনাপাওনার জন্য দর কষাকষি করেন, সহযোগেচ্ছু বন্ধুবান্ধব খুঁজে বার করেন এবং অসমীচীন প্রশ্ন করেন; ছোট ছোট উপদল ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিবর্গ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষতিসাধন করেন ও কংগ্রেসকে দুর্নামের ভাগী করেন। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা যাতে বারে বা বেয়াড়া সদস্যদের কংগ্রেস যাতে বশে আনতে পারে এবং বাধাপ্রদানকারীদের সংযত করতে পারে এ রকম কোন পন্থা গ্রহণ করলে কংগ্রেসের ও রাষ্ট্রপতির দু পক্ষেরই ভাল হবে। দক্ষতার দিকে পদক্ষেপ করলে (যেমন কমিটিগুলোর সংখ্যা কমিয়ে) রাষ্ট্রপতি নিঃসন্দেহে খুসী হবেন। এক অদক্ষ ও কর্মভারে অবনত কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির কল্যাণ হবে না। আমাদের সকলের মত তাঁরও কংগ্রেসের সংস্কারের মধ্যেই প্রভূত স্বার্থ নিহিত আছে।

কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত গলদ যত্ন সহকারে লক্ষ্য করতে হবে, বিশেষতঃ এ ত্রুটি সংশোধিত হলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব বেড়ে যাবে, কংগ্রেসেও তাঁর প্রভাব বাড়বে। তাঁর অনুমোদনের জন্য প্রেরিত ব্যয়মঞ্জুরীর বিস্তৃত খসড়ায় আলাদাভাবে কোন এক

নির্দিষ্ট খাতে ভেটো দেবার কোন অধিকার না থাকার সম্বন্ধেই আমি বলছি। সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে রাষ্ট্রপতি কখনো কখনো সন্দেহজনক বরাদ্দ ও ঘাটতি পূরণে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। ক্ষমতা থাকলে ভেটো দিতেন প্রকাশ্যে এই ঘোষণা করে হয়ত তিনি তার বিবেককে বশীভূত করেন এবং ক্রোধের নিবৃত্তি ঘটান কিন্তু অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্যই তাঁর প্রতিবাদে কান না দিতে অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। আইটেম ভেটোর (Item Veto) প্রস্তাবকরা অভিযোগ করেন যে চল্লিশ জন রাজ্যপালের যে ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রপতির তা নেই; তাঁরা দাবি করেন রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দিলে ভাল বই মন্দ হবে না এবং আরো বলেন যে হয় সংবিধান সংশোধন করা হোক নয়ত কংগ্রেস নিজেকে বঞ্চিত করে এ রকম আইন প্রণয়ন করুক। একদিকে কংগ্রেসে তাঁর নেতৃত্ব জোরদার হবে, কারণ জাতীয় স্বার্থে মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ করা যে আঞ্চলিক স্বার্থে অমিতব্যয়ী হবার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় এই সুতীক্ষ্ণ যুক্তি প্রকাশ্যে তিনি কংগ্রেস সদস্যদের সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন, আবার অন্যদিকে প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করতে পারবেন কারণ, অন্ততঃ, কার্যনির্বাহক বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপারে তাঁর যে দায়িত্ব আছে তা পূরণ করবার পূর্ণ ক্ষমতা অবশেষে তাঁর হাতে এসে যাবে। যে কর্মপন্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ সাহসের সঙ্গে উপস্থাপিত করবেন তার জন্যে বাড়তি খরচ করতে কোন সরকারী এজেন্সি আর সক্ষম হবে না।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে 'আইটেম ভেটোর' বিরুদ্ধে এই প্রবল যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস সদস্যদের উপর ব্যক্তিগতভাবে চাপ দেবার ক্ষমতার পথ খুলে যাবে ও দর কষাকষি করার মনোবৃত্তি বেড়ে যাবে। এই যুক্তির স্বপক্ষে বক্তব্য নিশ্চয়ই কিছু আছে এবং আমরা রাষ্ট্রপতির হাতে নতুন এই ক্ষমতা দেওয়ার জন্যে সংবিধান সংশোধন করার আগে নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট আইটেম কেটে দেবার বা কমিয়ে দেবার অধিকার দিয়ে কোন ব্যয়বরাদ্দসূচক খসড়ার বিবেচনা কংগ্রেস কেন করবে না তা দুর্বোধ্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির এবম্বিধ ভেটো কংগ্রেস যৌথ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে বাতিল করার ক্ষমতা নিজ হাতে রেখে দিতে পারে।

এ রকম ব্যবস্থা যে সংবিধানের বিধান বা নীতিকে পর্যুদস্ত করবে না এ আশ্বাস আমরা অনেক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে লাভ করেছি। যদি অধিকাংশ অঙ্গরাষ্ট্রের রাজ্যপালদের এ ক্ষমতা কংগ্রেস সরাসরি দিতে পারে ; আচ্ছাদনের অন্তরালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকেও নিশ্চয়ই এখন দিতে পারে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যদি আমরা অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি যে এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকা দরকার এবং এর অপব্যবহার হবে না তবে পরে অঙ্গরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সংবিধানে এর অনুলিখনের বন্দোবস্ত করতে পারি। সাধারণ খসড়ার আইটেমে ভেটো দেবার ক্ষমতা তাঁকে দেবার আগে আমাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে দেখতে হবে। যদিও খসড়ায় সর্ত (Rider) জুড়ে দেবার প্রচলিত পদ্ধতি আমাদের বিরক্তির খোরাক জোগায়, তবু একথাও মনে রাখতে হবে যে কংগ্রেসেরও চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের জন্য আয়ুধ দরকার এবং এই পুরানো বন্দুক কংগ্রেস চিরতরে ত্যাগ করবে এ প্রত্যাশা করা আমাদের উচিত হবে না।

অনেক আমেরিকাবাসী, এবং সকলেই কিছু মিনিভার চিভি নয়, মনে করবেন যে আমি হয় স্বেচ্ছায় নয়ত অজ্ঞতাবশে রাষ্ট্রপতিত্বের সবচেয়ে বড় গলদ এড়িয়ে গেছি ; রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত ব্যাপক ক্ষমতা, গত পঁয়ত্রিশ বছরে এর বিস্ময়কর বিস্তার এবং সংবিধানের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানসে হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ কংগ্রেসী প্রচেষ্টায়াসে গলদ দেখা গেছে। আমার ইচ্ছা তা নয় এবং এই অভিযোগ ও পরিপূরক সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমি অজ্ঞও নই। আমেরিকার রাজনীতির বিশেষ অমনোযোগী ছাত্রও প্রবল প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রপতিত্বের বিপক্ষে জড়ো করা বিস্তৃত তথ্য সম্বন্ধে এবং পুরানো ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে অবলম্বনীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন না। কোরিয়ায় ট্রুম্যানের প্রারম্ভিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেনেট সদস্য ট্যাফ্‌ট্‌ এর চ্যালেঞ্জ, ইউরোপে সৈন্য পাঠাবার যে ক্ষমতা আইজেনহাওয়ারেরর ছিল পরিষদ সদস্য কাউদার্তের তার উপর সর্ত আরোপ করার অপচেষ্টা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ও বোঝাপরা করার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে সেনেট সদস্য ব্রিকারের জেহাদ ঘোষণা, জেলা কোর্টে ইস্পাত দখলীকরণ মামলায় বিচারক পাইনের—রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে হুইগ মতবাদের পুনর্মূল্যায়ন, সংবিধানের ধারার উপর সেনেট সদস্য ম্যাকার্থির উচ্ছৃঙ্খল আঘাত—হোয়াইটহাউসের উপর

এ সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা সব সময়েই আসছে। শুল্ক ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ, অর্ডিনান্স-প্রণয়ন করা, চাকুরী দান সম্পর্কিত ক্ষমতা এবং আইন প্রণয়ণে প্রভাব বিস্তার করায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে না হলেও এদের যথাযথ সীমা সম্বন্ধে প্রত্যেক কংগ্রেসেই চ্যালেঞ্জ ওঠে। প্রবল রাষ্ট্রপতিত্বের বিরুদ্ধবাদীরা দেশকে দ্বাবিংশতম সংশোধনী গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে—তাঁদের মতবাদের অনুকূলে দৃঢ় আঘাত হেনেছেন।

তাঁদের মতবাদ সুচিন্তিত এবং সৌভাগ্যসূচক নয়। একে সুচিন্তিত বলা যাবে না, কারণ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কমে গেলে আমাদের শত্রুদের সামনে যথেষ্ট দুর্বল ক'রে তুলবে; ঘরে প্রাচুর্য ও দৈন্যের অদৃশ্য শক্তিগুলিকে অসুবিধাজনক-ভাবে অনুপ্রাণিত করবে এবং বাইরে—অশান্তি ও আক্রমণের দৃশ্য শক্তিগুলোকে সবল করে তুলবে। যে দেশের উপর শিল্পসভ্যতা তার বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে সুবিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং যে দেশের পক্ষে সক্রিয় কূটনীতিই হচ্ছে বেঁচে থাকবার পক্ষে ন্যূনতম মূল্য সে দেশে শক্তিকে মানুষ ভয় করবে না, ভয় করবে শক্তিহীনতাকে।

এ মতবাদ দুর্ভাগ্যপ্রসূত কারণ হুইগরা ছোটখাট দ্বন্দ্বে কখনো কখনো জয়লাভ করলেও আমেরিকার ইতিহাসের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন না। প্রবল রাষ্ট্রপতিত্ব যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে তা অপ্রতিরোধ্য এবং যে সব শক্তি একে বল জুগিয়েছে তারা অপ্রমত্ত। নতুন অর্থনীতি ও নতুন আন্তর্জাতিকতার স্বপক্ষে আমরা আমাদের রায় দিয়েছি—এবং এ কাজে আমরা এই রাষ্ট্রপতিত্বকে আমাদের সাংবিধানিক পদ্ধতির সুষ্ঠু বিবর্তনের আবশ্যকীয় অঙ্গ করে ফেলেছি। যদি এক শক্তিমান, একতাবদ্ধ ও উৎসাহী কার্যনির্বাহকের নেতৃত্ব লাভের সৌভাগ্য না থাকে তবে কোন সরকারই আমাদের মত আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না বা বিদেশে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না।

একথা আমি এখানে বলছি না, এবং বলা বাহুল্য সারা বইতে কোথায়ও তা বলিনি, যে রাষ্ট্রপতিত্বের শক্তি আর মহত্ত্ব একই জিনিস। যদি তাঁর পন্থা সংবিধান সম্মত না হয় বা লক্ষ্য গণতান্ত্রিক না থাকে, যদি তিনি ন্যায়ের পথে, সম্ভ্রমের পথে বা জানা পথে না আসেন এবং এমন পদ্ধতি অনুসরণ না করেন যার স্বপক্ষে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সন্দেহাতীতভাবে এবং অবিরত

রায় দিয়েছে তবে শক্তিমান রাষ্ট্রপতি আর মন্দ রাষ্ট্রপতিতে কোন তফাৎ থাকবে না, তিনি হবেন জাতির পক্ষে অভিশাপস্বরূপ। অতীতের মহৎ রাষ্ট্রপতিদের আমরা শ্রদ্ধা করি তাঁরা শক্তিমান ছিলেন বলে নয়, করি এইজন্যে যে তাঁরা এক মহত্তর আমেরিকা গঠন করার জন্য বিজ্ঞতার সঙ্গে এই শক্তি ব্যবহার করেছিলেন। এঁদের শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে আমাদের এই উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে যে পতন ও অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এঁদের মতো রাষ্ট্রপতিত্বই আমাদের অন্যতম মুখ্য রক্ষাকবচ।

বস্তুতঃ আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য—যে লড়াই চলেছিল সেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে—রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতার প্রশ্ন খুব বড় বলে মনে হলেও—দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরুত্ব পেয়েছিলেন মাত্র। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিত্ব সম্পর্কিত ব্যাপারে উত্তেজিত হয় খুব কম লোকই। যখন তাঁরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে কথা বলেন আসলে তাঁরা তখন আমেরিকার জীবনযাত্রা প্রণালী ও এর গতিপথের কথাই বলেন। সবল রাষ্ট্রপতিত্ব ১৯৬০ সনের আধার ও প্রতীক আর দুর্বল রাষ্ট্রপতিত্ব ১৯২০ সনের আধার এবং প্রতীক। জন. টি. ফ্লিন এবং ক্লারেন্স মানিয়ম আর আমেরিকার বিপ্লবের মেয়েদের মত যাঁরা সত্যি সত্যি—আবার ঘরে ফিরে যেতে চান তাঁরা ঠিকই মনে করেন যে রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতা হ্রাসের মধ্যেই তাঁদের প্রাথমিক সাফল্য নিহিত আছে। আমাদের পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে ব্রিকার সংশোধনীর মত রাষ্ট্রপতির উপর কোন আক্রমণ সংবিধানের সীমারেখা পেরিয়ে পৃথিবীতে আমেরিকার মর্যাদার উপরই এক আক্রমণ। এই সংশোধনীর সমর্থকেরা রাষ্ট্রপতিত্বের সম্ভাব্য স্বৈরতন্ত্রী বিবর্তনের আশঙ্কায় হয়ত খুবই উদ্বেগাকুল কিন্তু তাঁরা নতুন আন্তর্জাতিকতার সাম্প্রতিক রূপান্তরেই আরো বেশী উদ্বিগ্ন। পক্ষান্তরে প্রবলতর রাষ্ট্রপতিত্বের পক্ষে যাঁরা কথা বলেন তাঁরা আসলে বৃহত্তর সরকারী প্রশাসন ও সমাজজীবনের উপর বৃহত্তর সরকারী কর্তৃত্বেরই পক্ষপাতী।

ব্যাপকতম ক্ষমতায় মণ্ডিত রাষ্ট্রপতিত্বের প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। রাষ্ট্রপতিকে আরো বেশী ক্ষমতা দেবার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে, বর্তমান ক্ষমতার অপব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের হতে হবে সচেতন আর সংবিধানের বর্তমান ভারসাম্য যে সীমাহীন আত্মপ্রশংসার কোন হেতু নয় সে বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজ

নিজ উৎসাহ, কাণ্ডজ্ঞান বা শৈথিল্যে যেমন বর্তমান সমাজব্যবস্থার দিকে তাকাই—ঠিক তেমনি নিস্পৃহভাবে রাষ্ট্রপতিত্বর দিকে তাকাতে নিশ্চয়ই পারি। কারণ বর্তমান আমেরিকার শক্তি আর রাষ্ট্রপতিত্বের শক্তি একই জিনিস। যাঁরা আমেরিকার উপর ভরসা রাখেন না এবং আমাদের কার্যধারায় যাঁরা আতঙ্কিত তাঁরাই ক্রুদ্ধস্বরে শক্তিমান রাষ্ট্রপতিত্বকে বাতিল করে দেন। এই আমেরিকাকে যাঁরা স্বীকার করেন, অনাগত ভবিষ্যতকে যাঁরা ভয় করেন না —তাঁরা ধীরভাবে সবল রাষ্ট্রপতিত্বকেও স্বীকার করে নেন।

এই বইএর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে আমেরিকার সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে আমার গভীর ভরসা আছে। রাষ্ট্রপতিত্বের ত্রুটি ও সমস্যার এই চূড়ান্ত আলোচনায় এক অবিচল মন বলে যাচ্ছে, "রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজ করতে দাও", আমি খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করছি যে পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করেন তাঁরাই আত্মপ্রসাদ লাভ করার সুযোগ পাচ্ছেন আর যাঁরা অতীতের দিকে তাকিয়ে আছেন, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলরা বা ভবিষ্যতের দিকে যাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ অর্থাৎ বিপ্লব-পন্থীরা তাঁরা এ চিন্তায় কোন শান্তি পান না। যেহেতু আমেরিকাবাসীদের বহুলতম অংশ আজ এই মতবাদে সায় দিচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি যে কোন ব্যক্তিগত অভিমত আমি প্রকাশ করছি না। ১৯৬০ সনের জীবনের বাস্তবরূপ যদি আমরা স্বীকার করি (না করে উপায় নেই) এবং তথাকথিত আদর্শবাদীদের ভ্রমাত্মক উপ পরামর্শ যদি অগ্রাহ্য করি (আমরা করে থাকি) তবে এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হব যে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পরম পরাকাষ্ঠা আমরা এখানে দেখেছি। স্মরণশক্তি ও অভীপ্সার মানদণ্ডে বিচার করলে বলা যায় যে রাষ্ট্রপতিত্বের স্বাস্থ্য বেশ অটুট এবং সেইজন্যই অতি উৎসাহী বা কাপুরুষদের কথার প্রতিধ্বনি করে আমরা এর ত্রুটিবিচ্যুতিতে মুষড়ে পড়ব না। এদের মধ্যে কিছু কিছু কোন ত্রুটিই নয়, কিছু আমাদের শাসন পদ্ধতির আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে, কিছু আবার শোধরাতে গেলে আরও—বড় গলদের সৃষ্টি হবে।

এর মানে কিন্তু এই নয় যে আমরা রাষ্ট্রপতিত্বকে অবিকল স্বীকার করে যাব। বরং ছোটখাট পরিবর্তন আমরা করব এবং গোটা বারো প্রস্তাব আমি এই উপলক্ষ্যে আগেই করেছি—আর বাদবাকি সাংবিধানিক বিবর্তনের হাতে

ছেড়ে দোব। আমরা নির্বাচনী কলেজকে বর্জন করব কিন্তু নির্বাচনী পদ্ধতির বেয়াড়া তবু ফলপ্রসূ দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করব। যদি যুদ্ধ বাধে তবে ব্যাপক সমর প্রস্তুতি নিশ্চয়ই ক'রব তথাপি দক্ষিণের অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে যে আপৎকালীন ক্ষমতায় লিঙ্কন ঘিরে ফেলেছিলেন, উইলসন বণিকদের শস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন এবং রুজভেল্ট ডেষ্ট্রয়ার সংক্রান্ত কাজকারবার করেছিলেন জরুরী রাষ্ট্রপতির সেই আপৎকালীন ক্ষমতাকে অটুট এবং অব্যাহত নিশ্চয়ই রাখব। আমরা কার্যনির্বাহক তথা ব্যবস্থাপক বিভাগের যৌথ সংস্থা ও আইটেম ভেটো (কোন নির্দিষ্ট-বিধানের উপর নেতিবাচক ভোট) নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাব কিন্তু কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থানের কোন আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা থেকে বিরত হ'ব। রাষ্ট্রপতি লাভবান হবেন এরকম সহযোগী নিশ্চয়ই তাঁকে দেব কিন্তু কার্যনির্বাহক বিভাগের জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় উপরাষ্ট্রপতি গ্রহণ করার আপাত সরল সমাধান অগ্রাহ্য ক'রব। রাষ্ট্রপতির প্রশাসন নিয়ে সামান্যধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাব কিন্তু উঁচু পদে বিশেষ করে সর্বোচ্চ পদে নির্ভুল ঐকতানের মোহ-স্বপ্ন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখব। কারণ, যদি কথা বলতে পারত তবে রাষ্ট্রপতিত্ব হুইটম্যানের মত ব'লত।

আমি কি নিজেই নিজের প্রতিবাদ?
বেশ, তবে তাই আমি নিজেই নিজের প্রতি প্রায়।
(আমি বিরাট, তাই অসংখ্য মত অসংখ্য ধরি)

রাষ্ট্রপতিত্বকে নিজ কাজ ক'রতে দাও, এইতো বাণী এই অধ্যায়ের; কেন যে এত আস্থার সঙ্গে এই বাণীকে নানা অধ্যায়ে ভাষা দিয়েছি আশা করি তা আর অস্পষ্ট নেই। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত প্রবল-ভাবে ব্যক্ত করার জন্য এর নিম্নলিখিত অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচ্য:

ক্ষমতা ও অক্ষমতার মধ্যে এক সার্থক ভারসাম্য এ প্রতিষ্ঠা করেছে। যে পৃথিবীতে স্বাধীনতার দাম দিতে হয় ক্ষমতায়, রাষ্ট্রপতিত্ব সেই পৃথিবীতে, অধ্যাপক মেরিয়াম ও তাঁর সতীর্থদের ভাষায়, তাঁদের পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা ভুল করে মনে করেন যে গণতন্ত্র ব্যর্থ হবে, কারণ না পারে এ তাড়াতাড়ি কাজ করতে, না পারে সাহসের সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করতে। ক্ষমতার যে শোচনীয় অপব্যবহার আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই সেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রপতিত্ব সাংবিধানিক সততার এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল

বক্তব্যের অনুসরণে বলা যায় যে রাষ্ট্রপতিত্বের ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা আমরা দেখি স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতির স্বার্থক সমন্বয়ে। ক্ষমতা এবং সংযমের সার্থক সমন্বয়ই হচ্ছে সাংবিধানিক সরকারের মূল লক্ষ্য এবং রাষ্ট্রপতিত্বের ভেতরে যে সমন্বয় আমেরিকাবাসীরা সাধন করতে পেরেছেন তার জন্য কিছু কৃতিত্বের দাবি তাঁরা রাখেন।

প্রশাসন, কংগ্রেস ও জনসাধারণের অবিচল নেতৃত্বের এ এক কেন্দ্র বিন্দু। স্বাতন্ত্র্য আর বৈরিতার সাংবিধানিক পীঠভূমিতে রাষ্ট্রপতিত্ব একতা আর ঐকতানের প্রতীক। বিচ্ছিন্নতা যে সমাজের বৈশিষ্ট্য সেখানে রাষ্ট্রপতিত্ব সিড্‌নি হাইম্যানের ভাষায় বহুমুখী সামাজিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক সাধারণ মিলন কেন্দ্র। মহাদেশীয় প্রজাতন্ত্রের ক্লান্তিহীন প্রগতি রাষ্ট্রপতিত্বকে আমাদের এক যথার্থ জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

অনেকে এ ভূমিকা কংগ্রেসের হাতে তুলে দিতে চান, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে কম আক্রমণাত্মক রাষ্ট্রপতি ক্যালভিন কুলিজের ভাষায়, "কংগ্রেস দুর্বল মুহূর্তে সংঘবদ্ধ সংখ্যালঘু উপদলের সুবিধাবাদের নিকট নতি স্বীকার করে। সেইজন্যেই রাষ্ট্রপতি আরো বেশী করে সারা দেশের হয়ে কথা বলেন।" বার্কের ভাষায় কংগ্রেস যতবেশী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও স্থানীয় স্বার্থের আদর্শচ্যুত উপলক্ষ্য হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতিত্ব ততবেশী জাতীয় স্বার্থের উজ্জ্বল বর্তিকা হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রপতিত্ব মানুষ হিসাবে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন অভিযান ও আদর্শের অমূল্য প্রতীক। খুব কম দেশই এত সহজে অথচ মর্যাদায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও চারিত্রিক উৎকর্ষের প্রতিবিম্ব হিসাবে এক রাষ্ট্রীয় পদাধিকার অবলম্বন করতে সক্ষম হয়েছে। জনসাধারণের কাছে এর চেয়ে শ্রদ্ধার বড আসন কেবল সংবিধানের কিন্তু সংবিধানের তো আর প্রাণ নেই। ১৯৫৫ সনের রয়াল সোপ অপেরার শেষে এক বিশিষ্ট এবং অতৃপ্ত ইংরেজ লিখেছিলেন, "বৃটিশ রাজ-তন্ত্রের চেয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিত্ব আজ অনেক বেশী মহিমান্বিত পদাধিকার এই সহজ সত্য স্বীকার করতে হবে।" সত্যের খাতিরে এবং ভদ্রতার মুখরক্ষার্থে আমাদের তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করতে হবে কিন্তু আমাদের "প্রজাতন্ত্রী রাজা"কে নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট না থাকার কোনও কারণ নেই।

সময়ের কঠিন মানদণ্ডে এ পরীক্ষিত হয়েছে। যৌবনধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা আমাদের এত বেশী যে আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই সরকারের মুখ্য

অঙ্গগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে বহুদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আজ পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির কাছে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত কার্যনির্বাহক এবং কেউ যদি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের আগের পুরানো মানমর্যাদার দিনের দিকে ফিরে তাকান তবে দেখতে পাবেন, এ সমাধান আগেও কাজ করেছে। হেনরি জেমস্ ফোর্ড বিচক্ষণতার সঙ্গে সুন্দরভাবে লিখেছেন ঃ

আমেরিকার গণতন্ত্র জ্যাকসনের সময় থেকে চালু রাষ্ট্রপতিত্বকে গ্রহণ করে জাতির সবচেয়ে পুরানো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এর রূপ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীকৃতিদান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন মানুষের উচ্ছলিত নির্বাচনী প্রচেষ্টা, অবশ্য আধুনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অন্য কোন জাতি যে নীতিকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, সেই নীতিকে সার্থক করতে সক্ষম হয়েছে যে জাতি সে প্রমাণ করে দিয়েছে যে অন্যের তুলনায় সাংবিধানিক নীতিবোধের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত সে।

পরিশেষে, এ হচ্ছে স্বাধীনতার বেদীমূল। কার্যনির্বাহক বিভাগের ক্ষমতা একান্তরূপেই অগণতান্ত্রিক বলে যে সমস্ত ক্ষুদ্রমনা নীতিবাগীশরা মনে করেন রাষ্ট্রপতিত্ব তাঁদের বিরুদ্ধে এক মূর্ত তিরষ্কার। কারণ, আমেরিকার জাতীয় জীবনে অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বিরাট এই গণতন্ত্রের দাবি ও প্রত্যাশা পূরণে এ বেশী সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। যে সমস্ত অগভীর বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে লর্ড এক্টন্ ক্ষমতার নীতিহীনতা সম্বন্ধে শেষ কথা বলে গেছেন, রাষ্ট্রপতিত্ব তাঁদের কাছেও এক মূর্তিমান ভৎর্সনা বিশেষ, কারণ এর ইতিহাসে একটনের উপজীব্য বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাবে না। এই পদাধিকারের বিপুল শক্তি হেনরি এডাম্স্ বিদ্রূপ করে লিখলেও কিছু হলাহল নয়, পরন্তু এ উঠে গেছে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে, দুর্নীতিতে নেমে আসেনি। এর প্রধান কারণ, যাঁরা এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা ক্ষমতার উৎস সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং সেই জ্ঞানে বলীয়ান ছিলেন।

তাঁদের গণতন্ত্রের জয়যাত্রা কি ভাবে শুরু করা হবে তা আমেরিকার জনসাধারণই সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারেন নিশ্চয়ই। তারা রাষ্ট্রপতিত্বকেই করেছেন তার বিশিষ্ট বাহন।

তীর্থমুখী তাঁদের 'এই পদযাত্রার প্রস্তুতি পর্বে তাঁরা এই ভেবে গর্ব ও সান্ত্বনা বোধ করতে পারেন যে এ তাঁদের একান্ত বিশিষ্ট সম্পদও।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিত্ব

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিত্ব সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ পংক্তিসমূহ

উপধারা—৩ ধারা—১

অভিশংসন ক্ষমতা একমাত্র সিনেটেরই থাকিবে। বিচারকালীন তাঁহাদিগকে শপথ লইতে হইবে। যদি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিচার করতে হয়; প্রধান বিচারপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাহাকেও অভিযুক্ত করা হইবে না।

অভিশংসনের ফলে পদচ্যুতি কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যে কোনো বা বিশ্বাসযোগ্য কার্যে অযোগ্য বলে অভিহিত হওয়ার চাইতে কোনো গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে না; কিন্তু সাধারণ আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার ও শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

উপধারা—৭

প্রতি বিল সিনেট ও প্রতিনিধিসভায় প্রস্তাবিত হইবার পর এবং আইনবদ্ধ হইবার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থিত করা হইবে; অনুমোদন করিলে তিনি তাহা স্বাক্ষর করিবেন; অন্যথায় তিনি তাহা প্রস্তাবিত সভায় আপত্তি লিপির সহিত ফেরৎ পাঠাইবেন। সেই সভা এই সকল আপত্তি তাহার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিবে এবং পুনরালোচনার ব্যবস্থা করিবে। পুনরালোচনার পর যদি সেই সভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা সেইটি মঞ্জুর করেন, তাহা অপর সভায় উত্থাপিত করা হইবে; এই শেষ সভায় আলোচনার পরও যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা তাহা মঞ্জুর করেন তাহা হইলে বিলটি আইনবদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে উভয় সভার ভোট 'হাঁ ও না' এর দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং ভোটদাতা ব্যক্তিদিগের নাম নিজ নিজ পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে হইবে। যদি কোনো বিল প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপিত করিবার দশদিনের ভিতর (রবিবার ব্যতীত) ফিরিয়া না আসে তাহা যেন প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইনে পরিণত হইবে।

কিন্তু কংগ্রেসের কার্য স্থগিতকালীন যদি বিল ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে বিলটি আইনবদ্ধ হইবে না।

প্রতি আদেশ, প্রস্তাব বা ভিটো যাহার জন্য কংগ্রেসের সর্বসম্মতি আবশ্যক হইতে পারে (কার্যস্থগিত প্রশ্ন ব্যতিরেকে); তাহা প্রেসিডেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে এবং বিল মঞ্জুর করার পূর্বোক্ত প্রণালীসমূহ এই ক্ষেত্রেও পালিত হইবে।

ধারা—২ উপধারা—১

[শাসনকার্যের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের হস্তে থাকিবে। তাঁহার কর্মের মেয়াদ হইবে চার বৎসর; এবং এই মেয়াদের জন্য মনোনীত ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের সহিত তিনি নিম্নলিখিতভাবে নির্বাচিত হইবেন।]

[ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্র কংগ্রেসে স্থিরীকৃত সদস্য ও প্রতিনিধির সমসংখ্যক নির্বাচক নিযুক্ত করিবেন কিন্তু কোনো সদস্য অথবা প্রতিনিধি বা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নিযুক্ত কোনো কর্মচারী নির্বাচকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।]

[নির্বাচকগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রে মিলিত হইবে এবং ব্যালট্ দ্বারা দুইজনের পক্ষে ভোট দিবেন; দুইজনের মধ্যে অন্তত একজন সেই বিশেষ রাষ্ট্রের অধিবাসী হইবে না। নির্বাচকগণ সকল ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ভোট সংখ্যার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। এই তালিকা তাঁহারা নিদর্শন-পত্রের সহিত স্বাক্ষর করিবার পর যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্রস্থলে সিনেটের প্রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। সিনেটের প্রেসিডেণ্ট সদস্য এবং প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে সমস্ত নিদর্শন-পত্র খুলিবেন এবং তৎপরে ভোট গণনা করা হইবে। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্টের পদে নির্বাচিত করা হইবে যদি এই সংখ্যা নিযুক্ত নির্বাচকদিগের সংখ্যার অধিকের বেশী হয়, যদি একাধিক প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হন তাহা হইলে প্রতিনিধিসভা অবিলম্বে ব্যালট্ দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে একজনকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করিবে, যদি কাহারও অর্ধেকের বেশী ভোট না থাকে তাহা হইলে প্রতিনিধিসভা তালিকার প্রথম পাঁচজনের ভিতর একজনকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করিবে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মনোনয়নে রাষ্ট্র দ্বারা

ভোটসংখ্যা নির্ণীত হইবে ; প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকিবে : এই উদ্দেশ্যে কোরাম্ গঠিত হইবে, মোট রাষ্ট্র সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের এক বা একের অধিক সদস্য লইয়া, এবং মনোনয়নের জন্য মোট রাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশি সংখ্যা আবশ্যক হইবে। তেমনি প্রতি ক্ষেত্রে নির্বাচনের পর নির্বাচক-দিগের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভাইস-প্রেসিডেণ্ট-এর পদে মনোনীত হইবেন। কিন্তু যদি একাধিক ব্যক্তি সমসংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সিনেট ব্যালটের দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিবে।]

[কংগ্রেস নির্বাচক মনোনয়নের তারিখ এবং তাঁহাদের ভোট দিবার তারিখ স্থির করিতে পারিবে ; এই তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের সকল স্থানে একই হইবে।]

[প্রেসিডেণ্টের পদে নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম হওয়া চাই, অথবা এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার সময় তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। উপরন্তু তাহার বয়স অন্তত ৩৫ বৎসর হওয়া চাই এবং ১৪ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়া চাই।]

[প্রেসিডেণ্টের অপসারণে, মৃত্যুতে, পদত্যাগে অথবা সুশৃঙ্খলভাবে কার্য চালনার অক্ষমতার জন্য এই পদের ভার পড়িবে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের উপর। প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টের উভয়ের অপসারণে, মৃত্যুতে, পদত্যাগে অথবা অক্ষমতায় কংগ্রেস আইন দ্বারা স্থির করিবে কোন্ ব্যক্তি তখন প্রেসিডেণ্ট হইবার যোগ্যতা বহন করিবেন। এই ব্যক্তি অক্ষমতার দরুণ অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সেই পদে আসীন থাকিবেন।]

[প্রেসিডেণ্ট স্থিরীকৃত সময়ে তাঁহার কর্মের পারিশ্রমিক পাইবেন যাহা তাঁহার নির্বাচনকালীন সময়ে বাড়ানো অথবা কমানো যাইবে না। এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট অথবা অন্য প্রদেশ হইতে আর কোনরূপ বেতন লইতে পারিবেন না।]

উপধারা—২

[প্রেসিডেণ্ট সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং স্বদেশরক্ষী-সেনার (তাহাদের কার্যকালীন সময়ে) সর্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া গণ্য হইবেন। তিনি বিভিন্ন

বিভাগের কর্তব্য ও কর্মসম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে সেই বিভাগের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রধান কর্মচারীর নিকট হইতে লিখিত মতামত দাবি করিতে পারেন। এবং অভিশংসন ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা অভিযুক্ত যে কোন অপরাধের দণ্ড স্থগিত এবং মার্জনা করিবার ক্ষমতা বহন করিবেন।]

[তিনি সিনেটের উপদেশ ও মতানুযায়ী সন্ধির চুক্তি করিবার ক্ষমতা বহন করিবেন। যদি সদস্যদিগের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যার মতৈক্য হয়, তিনি সিনেটের উপদেশ ও মতানুযায়ী রাজদূত, অন্যান্য মন্ত্রী ও বাণিজ্যদূত, প্রধান বিচারালয়ের বিচারক এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল কর্মচারির নাম প্রস্তাব এবং নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু কংগ্রেস তাহার বিবেচনা অনুযায়ী আইনদ্বারা নিম্নপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ভার কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের হাতে দিতে পারে অথবা আইনসভার (কোর্ট অব-ল) ও বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদিগের হাতে দিতে পারে।]

[প্রেসিডেন্ট সিনেটের অবকাশকালে সকল শূন্যপদ পূরণ করিতে পারিবেন যাহা সিনেটের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে।]

উপধারা—৩

[সময়ে সময়ে তিনি ইউনিয়নের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেসকে ওয়াকিবহাল করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার বিবেচনায় আবশ্যকীয় ও হিতকর উপায় সংক্রান্ত বিষয়সকল কংগ্রেসে বিতর্কের জন্য পেশ করিতে পারিবেন। বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে তিনি যে কোন এক বা উভয় সভা আহ্বান করিতে পারিবেন, এবং সভা স্থগিত রাখিবার সময় নির্দেশের মতভেদ এক বা উভয় সভার কায তাঁহার বিচার অনুযায়ী স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনি বিদেশীয় রাজদূত বা অন্যান্য মন্ত্রিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন, তিনি দেখিবেন যেন সমস্ত আইনকানুন বিশ্বস্তভাবে সম্পাদিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারী তিনি নিয়োগ করিতে পারেন।]

উপধারা—৪

[স্বদেশদ্রোহ, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান এবং অন্যান্য গুরু অপরাধে অভিযুক্ত এবং বিচারালয়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল অসামরিক কর্মচারীর পদচ্যুতি হইবে।

দ্বাদশতম সংশোধনী

[নির্বাচকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে মিলিত হইবেন এবং ব্যালট্ দ্বারা প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ভোট দিবেন, তাঁদের দুইজনেই একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলে চলিবে না। ব্যালটে প্রেসিডেন্ট মনোনীত ব্যক্তির নাম এবং পৃথক ব্যালটে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত ব্যক্তির নাম ও প্রত্যেকের ভোটসংখ্যা উল্লেখ করিবেন। এই তালিকা তাঁহারা স্বাক্ষরিত নিদর্শন-পত্রের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে সিনেটের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহার পর সিনেট ও প্রতিনিধি সভার উপস্থিতিতে সিনেটে প্রেসিডেন্ট সকল পত্র খুলিবেন এবং ভোট গণনা করা হইবে। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট-প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত হইবেন—যদি এই সংখ্যা নির্বাচকদিগের সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হয়। যদি কাহারও অর্ধেকের বেশি ভোট না থাকে তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট হিসাবে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট প্রাপ্ত দুই অথবা তিনজনের একজনকে প্রতিনিধিসভা অবিলম্বে ব্যালট্ দ্বারা প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাষ্ট্রসংখ্যা দ্বারা ভোট সংখ্যা নির্ণীত হইবে; বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রতিনিধির একটি করিয়া ভোট থাকিবে; এই উদ্দেশ্যে কোরাম গঠিত হইবে মোট রাষ্ট্র সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের এক বা একের অধিক সদস্য লইয়া এবং মনোনয়নের জন্য রাষ্ট্র সংখ্যার অর্ধেকের বেশি সংখ্যা আবশ্যক হইবে। মনোনয়নের ভার প্রতিনিধিসভার উপর পড়া সত্ত্বেও যদি তাঁহারা পরবর্তী ৪ঠা মার্চের পূর্বে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন না করেন তাহা হইলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্য চালাইবেন; যেমন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে অথবা অক্ষমতায় হয়। ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইবেন যদি ভোটসংখ্যা নির্বাচকদিগের সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হয়। যদি কাহারও অর্ধেকের বেশি ভোট না থাকে; তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রথম দুইজনের মধ্যে সিনেট ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করিবেন; এই উদ্দেশ্যে কোরাম গঠিত হইবে সমস্ত সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা এবং মনোনয়নের জন্য অর্ধেকের বেশি সংখ্যা আবশ্যক হইবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রেসিডেন্টের পদে অনুপযোগী বিবেচিত হইলে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদে তাহাকে নির্বাচন করা যাইবে না।]

বিংশতম সংশোধনী

[নির্দিষ্ট বৎসরের ২০শে জানুয়ারী মধ্যাহ্নে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের কার্যকাল এবং ৩রা জানুয়ারী মধ্যাহ্নে কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের কার্যকাল শেষ হইবে এবং তাহাদের উত্তরাধিকারিদের কার্যকাল তখন আরম্ভ হইবে।]

[কংগ্রেস অত্যন্তপক্ষে বৎসরে একবার সমবেত হইবে এবং এই অধিবেশন ৩রা জানুয়ারির মধ্যাহ্নে বসিবে ; যদি না ইতিমধ্যে অন্য কোনো তারিখ আইনসঙ্গতভাবে নির্দিষ্ট হয়।]

[যদি কার্যারম্ভ তারিখের পূর্বে প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট—প্রেসিডেন্ট হইবেন। তাঁহার কার্যারম্ভ তারিখের পূর্বে যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হন অথবা অক্ষম হন তাহা হইলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের কার্য চালনা করিবেন যতোদিন পর্যন্ত না নূতন প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন অথবা পুনরায় কার্যক্ষম হন। মনোনীত প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস প্রেসিডেন্টের অক্ষমতায় কংগ্রেস আইনদ্বারা স্থির করিবে কোন্-ব্যক্তি প্রেসিডেন্টের কার্য চালাইবেন এবং কিরূপভাবে তাঁহার মনোনয়ন হইবে। এই ব্যক্তি কার্য চালনা করিবেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস-প্রেসিডেন্ট কার্যক্ষম হন।

প্রতিনিধিসভার দ্বারা প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন ক্ষেত্রে যদি প্রেসিডেন্ট তালিকা-ভুক্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় কংগ্রেস আইনদ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিবে। একই রূপে সিনেটের দ্বারা ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন ক্ষেত্রে ভাইস-প্রেসিডেন্ট তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে কংগ্রেস আইনদ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিবে।]

দ্বাবিংশতম সংশোধনী

প্রেসিডেন্টের পদাধিকারে কোন ব্যক্তি দুইবারের বেশী নির্বাচিত হইবেন না, এবং যে ব্যক্তি অন্য কোন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কোন কার্যকালের দুই বৎসরের বেশী প্রেসিডেন্ট থাকিবেন বা প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্য করিবেন তিনি একবারের বেশী প্রেসিডেন্টের পদাধিকারে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু কংগ্রেসে যখন এই ধারা প্রস্তাবাকারে আলোচিত হইতেছিল তখন যিনি প্রেসিডেন্ট পদে সমাসীন ছিলেন তাঁহার উপর ইহা প্রযোজ্য হইবে না এবং এই ধারা কার্যকরী হইবার সময়ে যিনি প্রেসিডেন্ট পদে সমারূঢ় থাকিবেন বা প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্য করিবেন তাঁহার মেয়াদের বাকী সময়ে প্রেসিডেন্ট পদে সমাসীন থাকিবার ব্যাপারে বা প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্য করিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ইহা কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে না।